ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

নভেম্বর ২০১৪ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ১০

প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি

ভারতে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের বিকাশ
সুনীল মানি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদনশিল্পে প্রযুক্তি উদ্ভাবন
এম এইচ বালা সুব্রমানিয়া

উদ্ভাবন ও বিশ্বায়ন
ড. ভি.ভি. কৃষ্ণা

বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীবাণু
ড. এম.এইচ. ফুলেকার ও ড. ভাবনা পাঠক

মঙ্গলযাত্রায় মঙ্গলযান
ড. দীপঙ্কর ঘোষ

মানুষকে দিয়ে মলবহন
ড. অমৃত প্যাটেল

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

SOME IMPORTANT TITLES OF PUBLICATIONS DIVISION

1. The Economic History of India—Vol-One	175.00
2. The Economic History of India—Vol-Two	260.00
3. Babu Jagjivan Ram	132.00
4. Conscience of the Race—India's Off-beat Cinema	240.00
5. Indian Navy—a Perspective	300.00
6. Growing Fruits and Vegetables	240.00
7. Children in India—A Legal Perspective	75.00
8. Indian Railways—Glorious 150 years	250.00
9. Media Ethics	100.00
10. The Story of India's Struggle for Freedom	75.00
11. India In the Space Age	235.00
12. Folk Arts and Social Communication	125.00
13. Aspects of Indian Music	60.00
14. A Brief History of Water Resources in India	70.00
15. The Charkha and the Rose	75.00
16. Ramananda Chattopadhyay	75.00
17. R. N. Tagore	95.00
18. Some Eminent Indian Scientist	125.00
19. Subhas Chandra Bose	100.00
20. Khudiram Bose (Beng.)	75.00
21. Indian Civilisation and the Science of Fingerprinting	160.00
22. Story of INA	35.00

Available at :

SALES EMPORIUM :
8, Esplanade East ; Kolkata-700 069
Ph. : 2248-6696, 2248-8030

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

November, 2014
REGISTERED No. KOL-RMS/109/2014
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐☐☐☐☐☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

নভেম্বর, ২০১৪

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেশ কুমার ঝা**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদনশিল্পে প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির কার্যকর উপায় — এম এইচ বালা সুব্রমানিয়া — ৫
- ভারতে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের বিকাশ — সুনীল মানি — ১০
- আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও উদ্ভাবন ভিনদেশি অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের শিক্ষা — ড. মনোজ জোশী, অপূর্ব শ্রীবাস্তব ও ড. (শ্রীমতী) বলবিন্দর শুক্ল — ১৪
- উদ্ভাবন ও বিশ্বায়ন — ড. ভি.ভি. কৃষ্ণ — ১৬
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উদ্ভাবনী অভিমুখ — ড. নমিতা শর্মা — ২০
- ভারতের চিরায়ত জ্ঞানের সুরক্ষা — অনিন্দ্য ভুক্ত — ২৬
- ভারতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতি বিকাশ, সম্ভাবনা ও সমস্যা — ভব রায় — ২৮
- উদ্ভাবন বিপ্লব ভারতের বৈচিত্রের সদ্ব্যবহার — বিজয়কুমার কল — ৩২

নব পরিকল্পনা

- সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা—একটি রূপরেখা — ৩৭
- 'ভারতেই তৈরি করুন'—একটি নীতিগত উদ্যোগ — ৩৯

ফোকাস

- মানুষকে দিয়ে মলবহন : রাজনৈতিক সদিচ্ছা দু' বছরে এই প্রথার বিলোপ ঘটাতে পারে — ড. অমৃত প্যাটেল — ৪২

বিশেষ নিবন্ধ

- বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীবাণু — ড. এম.এইচ. ফুলেকার ও ড. ভাবনা পাঠক — ৪৫
- মঙ্গলযাত্রায় মঙ্গলযান — ড. দীপঙ্কর ঘোষ — ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত — ৫৯
- পরীক্ষা প্রস্তুতি (তথ্য-প্রযুক্তি) — মহুয়া গিরি — ৬৬
- জানেন কি? (উইল) — মলয় ঘোষ — ৬৮
- যোজনা ক্যুইজ — জয়ন্ত সাহা — ৭০

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

উদ্ভাবনের গণতন্ত্রীকরণ

মানব সভ্যতার বিবর্তনে আগুনের আবিষ্কার এক অত্যন্ত যুগান্তকারী ঘটনা। অবশ্য তর্কের খাতিরে বলা যেতেই পারে যে আগুন প্রকৃতির দান, মানুষ শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ছুঁচের ক্ষেত্রেও কি এই একই যুক্তি প্রযোজ্য? সেলাইয়ের ছুঁচ যে মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি তা আমরা অনেক সময়ে ভেবেই দেখি না। অথচ, এই ছুঁচ দিয়েই চামড়া সেলাই করে, কাঠের সঙ্গে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ প্রথম নৌকা নির্মাণ করে এবং কালক্রমে সমুদ্র পেরিয়ে নতুন নতুন দেশ-মহাদেশে পৌঁছে যায়। আর ভিন দেশে প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচতে টেঁকসই গরম 'পোশাক' বানানোর সময় চামড়া সেলাই করার জন্যও এই ছুঁচেরই প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং এ কথা বলা যেতেই পারে যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন হয়। এই উদাহরণ মানব সভ্যতার বিবর্তনে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আভাস দেয়। জ্ঞান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সামাজিক ভূমিকা আগুন, পাথরের উপকরণ, চাকা, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, ছাপাখানা, মাইক্রোচিপের মতো বহু উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন সময় নতুন মোড় এনে দিয়েছে জ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের অভিনব উদ্ভাবনগুলো।

সদ্য প্রকাশিত 'ক্রিয়েটিং এ লার্নিং সোসায়েটি' গ্রন্থে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিট্জ ও তাঁর সহরচয়িতা ব্রুস সি. গ্রিন ওয়াল্ড এই চিন্তাধারাই প্রসারিত করেছেন। এই বইয়ে তাঁরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অগ্রগতির তারতম্যের প্রধান কারণ শুধুমাত্র মূলধন নয়, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ভূমিকাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য দেশগুলির আর্থিক বিকাশের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় প্রাজ্ঞজনদের সমিতি বা লার্নিং সোসাইটির ভাবধারা মানুষের কল্যাণসাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে এই প্রাজ্ঞ সমিতি ও তার নীতি সমূহ। তবে, এর চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল জ্ঞান সৃষ্টির জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবন করা, উদ্ভাবনের অনুঘটকগুলিকে চিহ্নিত করা এবং অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত বিকাশে উৎসাহ জোগানো।

যোজনা

কেনেথ জে. অ্যারো তাঁর "লার্নিং বাই ডুইং" গ্রন্থে বলেছেন জ্ঞান উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তিগত বিকাশের ভিত তৈরি করে। জ্ঞান মানুষের কল্যাণকামী এবং সে কারণেই অন্যান্য যে কোনও পণ্য বা প্রক্রিয়া থেকে আলাদা। তাই তাঁর যুক্তি যে জ্ঞানের সৃষ্টি ও বণ্টনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বাজার অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত হতে দেওয়া মোটেই বিচক্ষণতার লক্ষণ নয়। বাজারগুলিও দক্ষভাবে উদ্ভাবনের প্রসার ঘটাতে পারে না। এই চিন্তাধারার প্রসারের ফলস্বরূপ, আগামী দিনের কথা মাথায় রেখে ভারত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অব টেকনোলজি (IITs), কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাসট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR), ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (IIS), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অব ম্যানেজমেন্ট (IIMs), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR), বহু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতির মতো শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে একটি পোক্ত বহুমাত্রিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণা, তথ্য-প্রযুক্তি পরিষেবা এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তাই ভারত এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছে। খুব সস্তায় হেপাটাইটিস-বি টীকা ও বহু জেনেরিক ওষুধ, 'জয়পুর ফুট' (কৃত্রিম পা), অত্যন্ত কম খরচে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার বা মঙ্গল অভিযান, এ সবই এই পরিকাঠামোর সাফল্যের নজির। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল এই দুনিয়ায় 'জ্ঞান ও উদ্ভাবন কেন্দ্রগুলি' যখন বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠছে, তখন ভারতকেও আত্মতুষ্টিতে না ভুগে এদের টেক্কা দিতে হবে।

বিশ্বায়িত ও সংযুক্ত এই দুনিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনাকালে ভারতকে এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই সৃজনশীলতার উৎস। সম্ভবত ঘরে ঘরেই গড়ে উঠতে পারে 'চাঞ্চল্যকর উদ্ভাবন কেন্দ্র' ('ডিসরাপটিভ্ ইনোভেশন' অর্থাৎ যা বাজারের নিচুতলায় অনাড়ম্বরহীনভাবে শুরু হওয়ার পর ক্রমশ এগিয়ে বাজারের উচ্চ-স্তরে পৌঁছে প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে)। বলা বাহুল্য অপ্রথাগত উদ্ভাবন ও দেশজ সনাতন প্রযুক্তি এই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত অঙ্গ হওয়া দরকার। এটা শুধুমাত্র উদ্ভাবনের গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব।❑

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদনশিল্পে প্রযুক্তি উদ্ভাবন

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির কার্যকর উপায়

কোনও পণ্য বা পরিষেবায় 'নতুনত্ব'-এর চমক না থাকলে, বাজার ধরা সম্ভব নয়। আবার যে সব বাণিজ্যিক সংস্থা বাজারের শীর্ষে, তাদেরও আধিপত্য বজায় রাখতে লড়াই করতে হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলি উদ্ভাবনী প্রযুক্তির 'নতুনত্ব'-এর ছোঁয়ায় কীভাবে লাভান্বিত হতে পারে জানাচ্ছেন অধ্যাপক **এম এইচ বালা সুব্রমানিয়া।**

সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে প্রযুক্তি উদ্ভাবন। কারণ একটাই— নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন একদিকে তৃণমূল স্তরে যেমন আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন সংস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে তেমনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশের নতুন দিশাও দেখাতে পারে। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফারাকের জন্যই বিভিন্ন সংস্থা, অঞ্চল ও দেশের বিকাশের মধ্যে তারতম্য রয়ে যায়। তাই প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি বলা যেতেই পারে। উৎপাদনশীলতা এবং বিকাশের চূড়ান্ত নির্ণায়ক হল প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এটাই অর্থনীতিগুলির ধারাবাহিক উন্নতির একমাত্র প্রমাণিত পন্থা (মোলো, ১৯৮৭)।

একটি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে গত প্রায় তিন শতক ধরে উৎপাদন শিল্পই অর্থনৈতিক বিকাশের চাকাকে সচল রাখতে সাহায্য করেছে তথা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উৎপাদন শিল্প এখনও এই দায়িত্ব পালন করে চলেছে। (ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ২০১২)। আসলে, অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং বিভিন্ন উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষেত্র সব সময় পুরোভাগে থেকেছে। এইভাবেই উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতার বিকাশ ঘটিত প্রতিযোগিতার তাগিদ উৎপাদন ক্ষেত্র থেকেই এসেছে।

উৎপাদন শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন আকারের সংস্থা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। এগুলির মধ্যে সদ্য শুরু হওয়া উদ্যোগও রয়েছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে উদ্ভাবনের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে যার এখনও সদ্ব্যবহার হয়নি (শ্যামিনেড এবং ভ্যান লরিসডেন, ২০০৬)। এর প্রধান প্রধান কারণ—ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি প্রকৃতিগতভাবে অনেক নমনীয়, সহজেই বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এবং অনেক কিছুই সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এগুলি কিন্তু বিভিন্ন উদ্ভাবন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি 'অত্যাবশ্যক গুণ' (হ্যারিসন এবং ওয়াটসন, ১৯৯৮)। যে বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ সেটি হল গবেষণালব্ধ প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের নানান ক্ষেত্রের বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিযুক্ত রয়েছে, তা তাদের আর্থিক ফলাফলের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে (হফম্যান ও অন্যান্য, ১৯৯৮)। ছোট সংস্থাগুলিকে উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বেশি দক্ষ মনে করা হয় এবং বাস্তবে এই সংস্থাগুলিই উদ্ভাবনের প্রধান উৎস। (ব্রিৎজম্যান এবং হিক্স, আন্তর্জাতিক অর্থনিগম, ২০১০)। এই কারণেই ছোট সংস্থাগুলিকে প্রায়শই নতুন নতুন উদ্যোগের ভিত্তিভূমি বলে আখ্যা করা হয় যা পরবর্তীকালে সফল বাণিজ্য ও শিল্প হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে (বিস্‌লে এবং হ্যামিলটন, ১৯৮৪)।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি একটু বুঝে নেওয়া দরকার :

- প্রযুক্তি উদ্ভাবন বলতে কী বোঝায়?
- কোন বিষয়গুলি প্রযুক্তির উদ্ভাবন নির্ধারণ করে?
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির জন্য উদ্ভাবনে প্রাক্‌শর্তগুলি কী? উদ্ভাবনের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি কীভাবে উপকৃত হয়?
- ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে কীভাবে উদ্ভাবনে উৎসাহ দেওয়া যায়?

এই নিবন্ধের নিম্নোক্ত চারটি অংশে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হল।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন : অর্থ এবং গুরুত্ব

প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি বেশ জটিল, বহুমুখী ধারণা, যাকে সরাসরি ব্যাখ্যা করা যায় না (হ্যানসেন, ২০০১)। এই কারণেই বিভিন্নভাবে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে OECD (১৯৯৭)-র সংজ্ঞাকে মোটামুটি সকলে মেনে নিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে—একটি প্রযুক্তিগত দ্রব্য উদ্ভাবনের অর্থ হল উন্নত কার্যক্ষমতার গুণসম্পন্ন একটি সামগ্রীর বাস্তবায়ন/বাণিজ্যিকীকরণ যাতে সেটি উপভোক্তাদের কাছে বাস্তবিকভাবেই নতুন বা উন্নত পরিষেবা দিতে পারে। প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের অর্থ হল নতুন অথবা তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নত উৎপাদন অথবা বিতরণ পদ্ধতির রূপায়ণ/পরিগ্রহণ। সাজ-সারঞ্জাম, মানব

সম্পদ বা কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন অথবা একাধিক বিষয়ের পরিবর্তনের সংমিশ্রণে এই কার্য সম্পাদিত হতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবশ্য এই ধারণার আরও ব্যাপক অর্থ আছে। কুপার (১৯৮০)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনও বিশেষ উন্নয়ন দেশের অর্থনীতিতে নতুন কোনও প্রক্রিয়া বা সামগ্রীর প্রবর্তনকেই উদ্ভাবন বলে; সেই প্রক্রিয়া বা সামগ্রী অন্য কোথাও আগে ব্যবহৃত কি না সে প্রশ্ন এখানে গৌণ। এখানে প্রক্রিয়া বা সামগ্রীর যাবতীয় ছোটখাট পরিবর্তন বা অন্য কোনও প্রযুক্তিকে উপযোগী করে নেওয়াকেও (অ্যাডাপটেশন) উদ্ভাবন বলেই ধরা হবে—তা যদি অর্থনীতিতে নতুন হয়। মাইটেলকা (২০০৮)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সংস্থাগুলি তাদের কাছে নতুন বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার নকশা ও উৎপাদন বাস্তবায়নে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সেই নকশা বা উৎপাদন প্রক্রিয়া তাদের প্রতিযোগী সংস্থা, তাদের ক্রেতা বা বিশ্বে নতুন কি না তা নিয়ে ভাবার দরকার নেই।

UNU-INTECH (২০০৮)-এর মতে, উদ্ভাবনের মধ্যে নতুন যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় এবং সেগুলির লাইসেন্স আদায়ের মতো বিষয়ও পড়বে। ভারতের জাতীয় জ্ঞান কমিশনের মত অনুযায়ী—উদ্ভাবন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনও একটি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন মাত্রার মূল্য বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয় এবং সেটি সম্পাদন করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি কোনও আকস্মিক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হতে পারে বা হতে পারে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন; কোনও সংস্থায় এই প্রক্রিয়া নিয়মমাফিক বা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে এবং নিম্নোক্ত উপায়ে এই বিষয়টি অর্জন করা যেতে পারে।

১) উন্নত পণ্য পরিবেষার প্রবর্তন এবং/অথবা

২) চালনার নতুন অথবা উন্নত প্রক্রিয়ার রূপায়ণ এবং /অথবা

৩) নতুন অথবা উন্নত সাংগঠনিক/পরিচালন প্রক্রিয়ার রূপায়ণ (জাতীয় জ্ঞান কমিশন, ২০০৭)।

তাই এটা বোঝা দরকার যে 'প্রযুক্তি উদ্ভাবনের' কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/গবেষক তাদের গবেষণার প্রসঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে প্রযুক্তিগত পণ্য ও পরিষেবা (টিপিপি) উদ্ভাবনকে মোটামুটিভাবে এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে 'সংস্থাগুলির দ্বারা নতুন সামগ্রী ও প্রক্রিয়ায় বিকাশ এবং প্রক্রিয়ার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতিসাধন যেগুলি সামগ্রিকভাবে শিল্পমহল বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির কাছে নতুন' (বালা সুব্রমানিয়া ও অন্যান্য, ২০১০)।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্রে ধরে বলা যায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হতে পারে বিভিন্ন ধরনের। তবে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ১) মৌলিক উদ্ভাবন (একটি সংস্থায় প্রবর্তিত নতুন সামগ্রী বা প্রক্রিয়া যা বিশ্বে সম্পূর্ণ নতুন) এবং উন্নয়নমূলক উদ্ভাবন (চালু সামগ্রী বা সরঞ্জাম/প্রক্রিয়ায় উন্নতিসাধনের মাধ্যমে যে উদ্ভাবন করা হয়) ২) সামগ্রী বা সরঞ্জাম উদ্ভাবন এবং প্রক্রিয়া উদ্ভাবন। এছাড়া প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন আদতে উদ্ভাবনের একটা দিক মাত্র। পরিচালনার অন্যান্য কার্যকর ক্ষেত্রেও উদ্ভাবন হতে পারে যেমন বিপণন উদ্ভাবন, আর্থিক উদ্ভাবন এবং সাংগঠনিক উদ্ভাবন ইত্যাদি।

তবে অধিকাংশই শুধুমাত্র প্রযুক্তির বিচারেই উদ্ভাবনকে দেখে থাকেন। তাদের কাছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন মানেই অ্যাপল-এর আইপ্যাড বা বোয়িং-এর ৭৮৭ ড্রিমলাইনার (অ্যাটকিনসন, ২০১৩)। আদতে সংস্থাগুলির কাছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চাবিকাঠি হল এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া এবং/অথবা নতুন নতুন বাজার দখল করার ক্ষেত্রেও সংস্থাগুলির কাছে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য (বেকএইখ ও অন্যান্য, ২০০৬)। প্রযুক্তি উদ্ভাবন আসলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের এক অন্যতম পন্থা (জেম্পলিনেরোভা এবং হ্রোমাডকোভা, ২০১২)। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিকাশে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। (কাউন্সিল অন কম্পিটিটিভনেস, ১৯৯৯)। প্রতিযোগিতায় ক্ষেত্র তৈরিতে ভূমিকা থাকার দরুন প্রতিযোগিতা এবং অর্থনৈতিক বিকাশে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। জাতীয় স্তরে উদ্ভাবনী ক্ষমতার উন্নতি হলে কখনও তা বিফলে যায় না। একসঙ্গে অনেক দেশ যদি তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে উন্নত করতে পারে, তাহলে তারা আরও দ্রুত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সুফল ভোগ করবে। (কাউন্সিল অন কম্পিটিটিভনেস, ১৯৯৯)।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের নির্ধারক : মূল তত্ত্বগত প্রমাণ

সবার আগে বোঝা দরকার সংস্থাগুলি কেন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহী হয়। সংস্থাগুলির প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের নির্ধারক সংক্রান্ত যেসব তথ্য ও গবেষণাপত্র রয়েছে সেগুলি বিচিত্রমুখী এবং জটিল (বালা সুব্রমানিয়া, ২০০১)। তবে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের বিষয়টিকে দুটি প্রধান তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যথা 'ডিমান্ড পুল' (চাহিদাভিত্তিক) এবং 'টেকনোলজি পুশ' (প্রযুক্তিভিত্তিক)।

একদিকে সংস্থাগুলির প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে হাত দেওয়ার কারণ হিসাবে অর্থনীতিবিদরা প্রায়শই চাহিদাকেই চিহ্নিত করে থাকেন। তাঁরা সেই পুরোনো প্রবাদের কথাই বলেন 'প্রয়োজনীয়তাই আবিষ্কারের জননী'। বাজারের চাহিদা ছাড়া উদ্ভাবন সম্ভব নয়, আর সেটা সম্ভব হলেও তার সাফল্যের সম্ভাবনা কম। তাই বাজারের চাহিদাই উদ্ভাবনের প্রধান চালিকাশক্তি। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সম্ভবপর করে তোলার জন্য মৌলিক গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) ভূমিকার ওপর বরাবর জোর দিয়ে থাকেন। কোনও সংস্থা তাদের কোনও পণ্যের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বাজার চিহ্নিত করে থাকলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষতা ও সামর্থ্য ছাড়া সংস্থাটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কাজ

হাতে নিতে পারবে না। এইভাবেই বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাজারের ভূমিকাকে কিছুটা অবহেলা করেছেন বা খাটো করে দেখিয়েছেন। (ফ্রিম্যান এবং সোয়েটে, ১৯৯৭)।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা দরকার যে উদ্ভাবন একটি দ্বিমুখী বা দ্বৈত কর্মকাণ্ড। উদ্ভাবনের নির্ধারকগুলির উপরোক্ত দুটি দিককে একটি কাঁচির দুটি ব্লেডের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে (শুকলার, ১৯৯৬) (দ্রষ্টব্য চিত্র-১)। একটি সকল উদ্ভাবন (সামগ্রী অথবা প্রক্রিয়া) সম্ভবপর করে তোলার জন্য বাজারের চাহিদা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সামর্থ্য। একদিকে এর মধ্যে বাজারের চাহিদার স্বীকৃতি রয়েছে, বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে নতুন সরঞ্জাম বা প্রক্রিয়ার জন্য একটি নতুন সম্ভাব্য বাজারের কথা রয়েছে; অন্যদিকে মৌলিক গবেষণা ও উন্নয়নের ফল হিসাবে নতুন নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জনকেও অপরিহার্য করে তোলা হয়েছে। পরীক্ষামূলক নকশা এবং সরঞ্জামের উন্নতিসাধন, পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন ও বিপণনের সময় বাজারে সেই মতো কারিগরি সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা দেখা সমানভাবে জরুরি। তাই ফ্রিম্যান এবং সোয়েটে (১৯৯৭)-এর যুক্তি অনুযায়ী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের যেকোনও তত্ত্বকেই বাজারের চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত সামর্থ্য এই দুটি বিষয়কেই বিবেচনা করতে হবে।

এবার উদ্ভাবনমূলক সামগ্রী/প্রক্রিয়ার ধারণাকে সম্ভাব্য বাজারের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে তার বাণিজ্যিক প্রয়োগ বা উৎপাদন সম্ভবপর হয়। তাই প্রযুক্তি উদ্ভাবন আসলে একটি সংযোগসাধন প্রক্রিয়া। দূরদর্শী শিল্পোদ্যোগীরাই সবসময় এই সংযোগসাধন প্রক্রিয়ার কথা মাথায় রাখেন। এই সংযোগসাধন কোনও বিচ্ছিন্ন বা একক ঘটনা নয়। বরং এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া—পরীক্ষামূলক উন্নয়ন পর্ব থেকে শুরু করে নতুন সামগ্রী বা প্রক্রিয়া বাজারে আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে (ফ্রিম্যান এবং সোয়েটে, ১৯৯৭)। প্রযুক্তির সাফল্যের সম্ভাবনা এবং বাজারের চাহিদা

চিত্র-১ : প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের নির্ধারকসমূহ

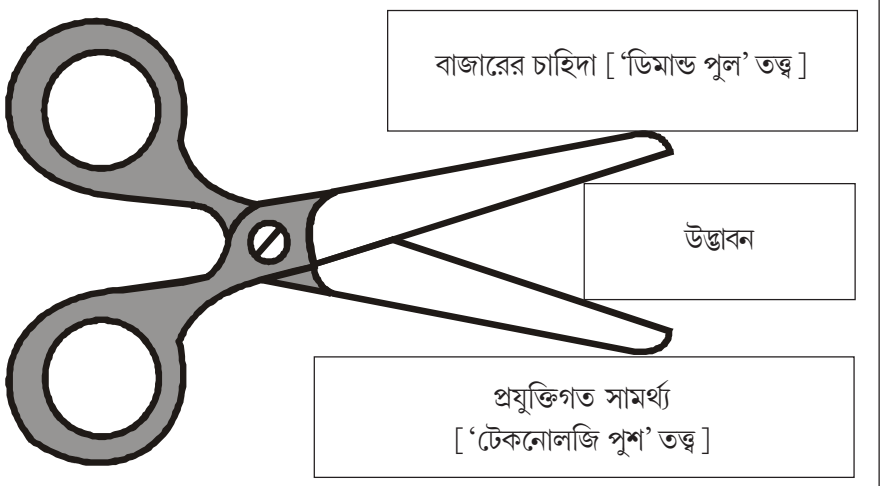

বুঝে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা শিল্পোদ্যোগীদের একেবারে নিজস্ব গুণ (রথওয়েল এবং জেগভেল্ড;১৯৮২; ড্যানিলস এবং ক্লেইনশ্মিট, ২০০১)। তাই প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ একটি সংস্থা যখন উপভোক্তাদের চাহিদা বুঝে সামগ্রী/প্রক্রিয়া তৈরি বা উন্নয়নের মাধ্যমে সেই চাহিদা পূরণ করতে পারে তখনই উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন : বাইরের সূত্রগুলির সহায়তা এবং সাফল্য

সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির একটা ক্ষুদ্র অংশই উদ্ভাবনের কাজে হাত দেয়। এমনকী উন্নত দেশগুলিতেও একই ছবি। কারণ, বেশিরভাগ উদ্যোগই উদ্ভাবনের উপকারিতাগুলি সম্বন্ধে সচেতন নয়। আর, সচেতন হলেও তাদের সামনে—কারিগরি, পরিচালনগত, আর্থিক সহায় সম্পদ, কর্মীদের দক্ষতা ও জ্ঞান সংক্রান্ত নানান অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকে। ফলে বেশিরভাগ উদ্যোগই উদ্ভাবনের কাজে উৎসাহ পায় না এবং তাদের কাছে উদ্ভাবনের কাজে হাত দেওয়ার মতো যথেষ্ট দক্ষতাও থাকে না। অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে বাইরের সূত্র থেকে সহায়তা নিয়ে দক্ষতার এই খামতি অতিক্রম করা যেতে পারে। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির একটা বড় অংশই বাইরের উপযুক্ত সূত্রের পরামর্শ ও সহায়তার সন্ধান, চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং কাজে লাগানোর মতো অবস্থায় থাকে না। তার ওপর, সংস্থার অভ্যন্তরীণ দক্ষতায় ঘাটতি থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই সংস্থা উপভোক্তাদের সঙ্গে সংযোগসাধন যেমন করতে পারে না তেমনি বাজারের চাহিদাও ঠিকমতো বুঝতে পারে না। এইভাবেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির একটা বড় অংশের কারিগরি দক্ষতার যেমন অভাব রয়ে গেছে, তেমনই সেগুলি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের চালনা করতে পারেনি—অথচ এই দুটো বৈশিষ্ট্য না থাকলে উদ্ভাবনের কাজে হাত দেওয়া যায় না।

যেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির কিছুটা 'ন্যূনতম মাত্রার অভ্যন্তরীণ দক্ষতা' থাকে সেখানে তারা এই অভ্যন্তরীণ সহায়সম্পদের পরিপূরক হিসাবে বাইরের বিভিন্ন সূত্র থেকে সহায়তার সন্ধান পরিগ্রহণ ও তার সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিতে উদ্ভাবনের জন্য বাইরের সূত্র থেকে সহায়তা আসতে পারে উল্লম্ব সংযোগসাধন (ভার্টিকাল লিংকেজ) বা সমান্তরাল সংযোগসাধন (হরাইজন্টাল লিংকেজ) অথবা উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে। উল্লম্ব সংযোগ বলতে সরবরাহকারী এবং উপভোক্তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বোঝায়। এই বিষয়টি বিশেষ করে সেই সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলিতে বিভিন্ন সংস্থার

মধ্যে তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির সঙ্গে বৃহৎ সংস্থাগুলির সংযোগসাধনের সম্ভাবনা রয়েছে। এই রকম ক্ষেত্রে বৃহৎ সংস্থাগুলিও (বহুজাতিক সংস্থাসহ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির (যেগুলি আবার পূর্বতন বৃহৎ সংস্থাগুলির উপ-ঠিকাদার) ক্রেতা। এক্ষেত্রে বৃহৎ সংস্থাগুলি শুধু যে উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে সহায়তা করে তাই নয়, সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, সরবরাহ শৃঙ্খল পরিচালনে সহায়তা, অর্থসংগ্রহ, মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ, উৎপাদন, কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত বিষয়েও সহায়তা দিয়ে থাকে। (UNCTAD, ২০০৬)। এর ফলে উপভোক্তারা প্রায়শই উপকরণ সরবরাহকারী হয়ে ওঠেন। তাই নির্দিষ্ট সংখ্যক নিজস্ব ক্রেতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাটা এক্ষেত্রে লাভজনক হয়ে ওঠে। বাজার সমীক্ষার জন্য সহায় সম্পদের অভাব এইভাবে ক্রেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমেই পূরণ করে নেওয়া যায়। এই ধরনের সম্পর্ককে 'লেনদেন মূলক' বলার চেয়ে 'সম্পর্কমূলক' বলে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

অন্যদিকে সমান্তরাল সংযোগসাধন নীতি চালিত হতে পারে, আবার তা হতে পারে প্রতিযোগিতা চালিত। বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, বিশেষত যে সমস্ত শিল্পে বৃহৎ সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগসাধনের তেমন সুযোগ নেই সেই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত উদ্যোগগুলি নীতিগত উৎসাহদান কর্মসূচির সুবিধা নিতে সরকারি সহায়তা পুষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা প্রাতিষ্ঠানগুলির সহায়তা চায়। কিন্তু এই ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু কারিগরি পরামর্শ বা উন্নততর প্রযুক্তির উৎস সম্পর্কিত কিছু তথ্য ছাড়া বিশেষ কোনও সহায়তা দিতে পারে না। কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের গবেষণাগারগুলিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির সঙ্গে যৌথভাবে অথবা উদ্যোগগুলির হয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনার কাজ হাতে নিতে পারে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য একই ক্লাস্টার বা শহরের একই শিল্পের সমগোত্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির সহযোগিতা চাইতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির মধ্যে সমান্তরাল সহযোগিতার ফলে যৌথ দক্ষতা সৃষ্টি হয় তার ফলে স্থানীয় ও বৈদেশিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতাতেও অনেক সুবিধা পাওয়া যায় এবং যৌথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় (বেরি, ১৯৯৭)। একই ক্লাস্টারের একই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির যোগাযোগ গড়ে উঠলে কর্মচারীদের মধ্যেও যোগাযোগ গড়ে উঠবে এবং তাতে তাদের নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি বা কাজ অদল-বদল করে নেওয়ার পথও প্রশস্ত হবে (সুসম্যান ও অন্যান্য ২০০৬)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র বা মাঝারি উদ্যোগ একইসঙ্গে উল্লম্ব ও সমান্তরাল সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে।

একটি সংস্থায় উদ্ভাবনমূলক কাজকর্ম জোরদার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উচ্চশিক্ষিত (বিশেষত প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন) ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা প্রতিষ্ঠাতা/শিল্পোদ্যোগী, একেবারে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নকশা/গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, কর্মীদের মধ্যে উচ্চহারে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উপস্থিতি (হফম্যান ও অন্যান্য ১৯৯৮)।

উদ্ভাবনে উৎসাহী যে সমস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ তাদের উদ্ভাবনের জন্য বাইরের বিভিন্ন সূত্র থেকে সহায়তা পায় সেগুলি হয় ব্যয় কাটছাঁট বা গুণমান বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের কাজে হাত দেয়, নয়তো ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের নকশা/মাত্রায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে চালু পণ্যের উন্নততর সংস্করণ বা পণ্য উদ্ভাবনে মনোযোগ দেয় (যে সমস্ত সংস্থা একদম নিজস্ব চেষ্টায় উদ্ভাবন করে থাকে তাদের চাইতেও এদের কাজ বেশি)। এই ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির মোট বিক্রি করা সমাগ্রীতে উদ্ভাবিত পণ্য সামগ্রীর অংশ অনেক বেশি থাকে। এছাড়াও একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির মোট বিক্রয়মূল্যের বৃদ্ধির হারও অনেক বেশি। এতে এই সত্যটিই প্রতিপন্ন হয় যে নতুন নতুন পণ্য তৈরি এবং চালু পণ্যের মানোন্নয়ন ছোট সংস্থাগুলির অভ্যন্তরীণ বিকাশের পণ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল (ব্যারিংটন এবং আয়ারল্যান্ড, ২০০৮)। এই প্রসঙ্গে সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি হল এর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগই এই প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে সক্ষম (বালা সুব্রমানিয়া ও অন্যান্য ২০১০)। এইভাবেই উদ্ভাবনমূলক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির কাছে উদ্ভাবনের সুবিধা অনেক; যেমন ব্যয় হ্রাস, গুণমানবৃদ্ধি, পণ্যের উন্নতিসাধন, নতুন পণ্য তৈরি, অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সর্বোপরি বিক্রয় বৃদ্ধি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির একটা সীমিত অংশই উদ্ভাবনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকলেও ইস্যুকৃত পেটেন্টের সংখ্যার কারণে এই উদ্যোগগুলির প্রচেষ্টা যথেষ্ট লাভজনক হচ্ছে। কিন্তু পেটেন্টের সংখ্যা এই উদ্যোগ-গুলির উৎপাদনের যথার্থ মূল্যায়ন করেনি। তার কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির মধ্যে 'পেটেন্ট সংস্কৃতি' নেই, এমনকী উন্নত দেশগুলিতেও (ফ্রিম্যান এবং সোয়েটে, ১৯৯৭; বালাসুব্রমানিয়া, ২০০১)। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের কাছে আবার পেটেন্টের জন্য আবেদন করার মতো আইনি নথিপত্র থাকে না। বরং তারা বাণিজ্যিক গোপনীয়তার ওপরই বেশি নির্ভর করে। উদ্ভাবনের ন্যূনতম সাংকেতিক সূত্রই তাদের হাতে থাকে। এই উদ্যোগগুলি প্রতিযোগী সংস্থাগুলির তুলনায় এগিয়ে থাকে।

ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলিতে এই ধরনের উদ্যোগগুলির উদ্ভাবনের সাফল্যের স্বীকৃতি শুধুমাত্র প্রায়শই ক্রেতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির সংঘগুলির কাছ থেকে পাওয়া মানপত্র ও পুরস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির ওপর নীতিগত প্রভাব

ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি একটি কৌশলগত স্থান অধিকার করে রয়েছে। ২০১২-১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং এই উদ্যোগগুলি থেকে ১২৮০০ কোটি টাকার রপ্তানি রয়েছে। ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি

উদ্যোগ ক্ষেত্রের বৈচিত্র চোখে পড়ার মতো। এখানে প্রথাগত সরঞ্জাম থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক শিল্প সামগ্রী ধরে ৬ হাজার রকমেরও বেশি পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় (অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি, উদ্যোগ মন্ত্রক ২০১৪)। বর্তমানে বিশ্বের অর্থনীতিতে ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ভিত্তিই হয়তো দ্বিতীয় বৃহত্তম ও বৈচিত্রময় (চীনের পরেই)। এর ফলে এই ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও সর্বোপরি আর্থিক বিকাশের এক বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে এদেশের সমস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উদ্ভাবনমূলক কিনা এবং তাহলে সেই উদ্ভাবনে প্রকৃতিই বা কী সেটা নিয়ে জাতীয় স্তরে নথি প্রস্তুত করার এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ক্ষেত্রে যে সমস্ত উদ্ভাবনের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে তার প্রকৃতি, ধারা, গভীরতা নিরূপণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমীক্ষা চালানো জরুরি। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে উদ্ভাবনে উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষুদ্র মন্ত্রক রাজ্যস্তরের শিল্প মহানির্দেশালয় ও জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির মধ্যে 'উদ্ভাবনের উপযোগিতা'র মন্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার করতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে থেকে 'বিজয়ী উদ্ভাবকদের' বেছে নেওয়া যেতে পারে এবং তাঁরা যাতে তাঁদের উদ্ভাবনের সাফল্যের কথা নিয়মিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অন্যান্য শিল্পোদ্যোগীদের জানাতে পারেন তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বৃহৎ সংস্থাগুলির (বহুজাতিক সংস্থাসহ) মধ্যে আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার নামে সমান্তরাল এবং উল্লম্ব সংযোগসাধনে উৎসাহ দিতে হবে। আর সেজন্য রাজ্যস্তরে নিয়মিত ক্রেতা বিক্রেতার মুখোমুখি বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে বৃহৎ সংস্থাগুলি যাতে তথ্যের অসংগতি দূর করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি, মধ্যবর্তী ব্যবহারের পণ্য (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির উৎপাদিত পণ্য) উৎপাদকদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য দিয়ে একটি 'আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা পোর্টাল' গঠন করা যেতে পারে যেখানে ক্রেতা (বৃহৎ সংস্থা) এবং বিক্রেতা (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ) উভয়েই বিনামূল্যে নিজেদের নথিভুক্ত করতে পারবে। এই পোর্টালে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি থাকবে :

ক) আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ,

খ) এই ধরনের সহযোগিতার সম্ভাব্য উপযোগিতা,

গ) ভারত তথা বিদেশের আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাফল্যের কাহিনি।

এই পোর্টালের বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির সুবিধার্থে শিল্প এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনার পথ প্রশস্ত করে সমান্তরাল সহযোগিতায় উৎসাহ দিতে হবে। সহযোগিতামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে উদ্ভাবনের কাজে সাহায্য করার জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দিতে হবে। এতে পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে গুণমান বৃদ্ধি হবে। বিশেষ করে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের কোনও কারিগরি সমস্যা ও তার সমাধানকে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র বা ছাত্রীর পাঠ্যসূচির প্রজেক্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। এতে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্ভাবনমূলক শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ঘটবে।

পরিশেষে বলা যায়, এদেশের বিপুল সংখ্যক এবং ক্রমবিকাশশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ক্ষেত্রের উদ্ভাবনের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য নিয়মমাফিক এবং ধারাবাহিক নীতিগত সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি প্রতিযোগিতার বাজারে যেমন অনেক সুবিধা পাবে তেমনি আগামী দিনে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতিতে আরও বেশি করে অবদান দিতে পারবে।❑

[লেখক বেঙ্গালুরুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স'-এর ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন বিভাগের প্রধান।
email: bala@mgmt.iisc.ernet.in]

ভারতে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের বিকাশ

ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা, এরোস্পেসের মতো শিল্পে ভারতের দক্ষতা আজ সর্বজনবিদিত। দেশে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের ক্রমবিকাশ, এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা, পারস্পরিক সম্পর্ক, এ সম্পর্কিত পেটেন্ট প্রাপ্তির খতিয়ান, রপ্তানির নিরিখে এই ক্ষেত্রের অবস্থান, সরকারি নীতি—সব কিছুর এক সামগ্রিক চালচিত্র উঠে এসেছে **সুনীল মানি**-*র এই নিবন্ধে।*

সূচনা

উন্নত এবং উন্নয়নশীল—দুই পৃথিবীর দেশগুলিতেই এখন উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এর নেপথ্যে প্রধানত তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পগুলিতে প্রতি একক শ্রম ও মূলধনে উচ্চতর মূল্য সংযোজিত হয়। ফলে সার্বিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-তে এদের ভাগ বেশি দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে এদের যোগ এতটাই ব্যাপক যে, নিম্ন প্রযুক্তির পণ্য ও পরিষেবার তুলনায় এগুলির বিকাশ হলে তার গুণোত্তর প্রভাব অবশিষ্ট অর্থনীতির ওপর পড়ে। তৃতীয়ত, উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য ও পরিষেবা দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায়। মোবাইল ফোন এবং বিভিন্ন জৈবপ্রযুক্তি পণ্যের সমাহার এভাবেই সাধারণ মানুষ, এমনকী গ্রামীণ এলাকায় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রাও পালটে দিয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যালস, এরোস্পেস, দূরসঞ্চার যন্ত্রাংশ, ন্যানো প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তির মতো উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রগুলির বিকাশে ভারতও সচেষ্ট। সেই কাজ কতদূর এগিয়েছে, এই নিবন্ধে আমরা তারই একটা ছোট্ট সমীক্ষা করব। শুরুতে উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের সার্বিক প্রবণতা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাক। পরে আমরা উচ্চ প্রযুক্তির প্রতিটি শিল্প নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব। উচ্চ প্রযুক্তি শিল্প নিয়ে সরকারের পৃথক কোনও উদ্ভাবনী নীতি না থাকলেও বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট নীতিকে এর বিকাশের কাজে লাগানো হয়। ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের উন্নয়নে পেটেন্ট নীতি, এরোস্পেসের বিকাশে অফসেট নীতি, দূরসঞ্চার যন্ত্রাংশ শিল্পের অগ্রগতিতে জনপ্রযুক্তি সংগ্রহ নীতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

TRIPS-এর অনুসরণে কঠোর পেটেন্ট নীতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ভারত বিশ্বের নিরিখে জেনেরিক ওষুধের এক গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিকারক। এই সাফল্যের পিছনে দেশীয় সংস্থাগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবায় ২০০৫ সাল থেকে ভারত বিশ্বে নেতৃত্ব দানকারী দেশের আসনে অধিষ্ঠিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের পারদর্শিতাকে এখন দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেবার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সুশাসন ও পরিষেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের ক্ষমতায়নের প্রযুক্তিগত প্রয়াস হল এটি। উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য রপ্তানি ক্রমশই বাড়ছে। বর্তমানে ভারত এক্ষেত্রে বিশ্বে সপ্তম (বিশ্ব ব্যাংক ২০১৪)। এই রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশই হল ফার্মাসিউটিক্যালস এবং বিমানের যন্ত্রাংশ—এই দুটি ক্ষেত্রে। (চিত্র-১)। ফার্মাসিউটিক্যালস ক্ষেত্রে ভারতের প্রযুক্তিগত পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত, কিন্তু বিমানের যন্ত্রাংশ নির্মাণে ভারতের নব অর্জিত দক্ষতা রীতিমতো তাক লাগানো। প্রতিরক্ষা ক্রয় ও অফসেট সংক্রান্ত সাম্প্রতিক নীতি দেশীয় উৎপাদনকে আরও উৎসাহ জুগিয়েছে। জাতীয় অসামরিক বিমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভারত এখন আঞ্চলিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। উপগ্রহ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের

চিত্র-১ ভারত থেকে উচ্চ প্রযুক্তিতে নির্মিত পণ্যের রপ্তানি

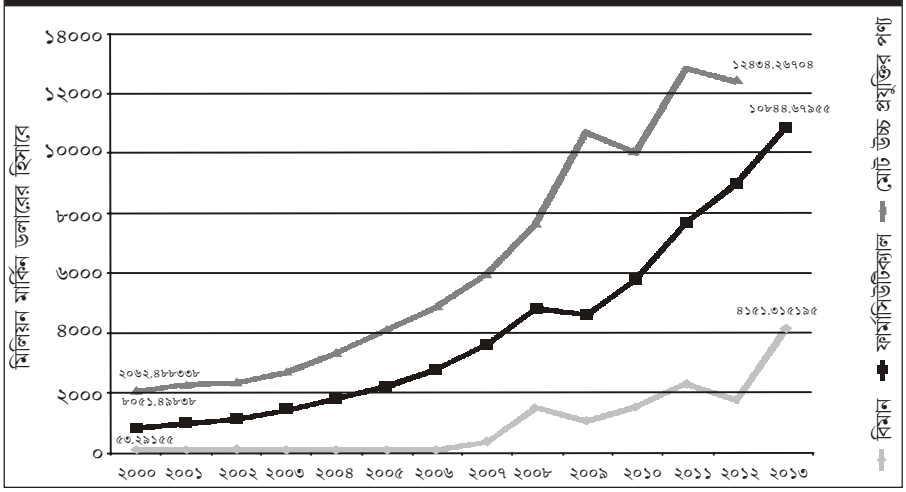

সূত্র : রাষ্ট্রসংঘের "কম-ট্রেড" ও বিশ্বব্যাংক (২০১৪)।

পাশাপাশি চাঁদে মানুষ পাঠানো এবং মঙ্গল নিয়ে গবেষণার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাও তার রয়েছে।

i) ভারতীয় আবিষ্কারকদের পেটেন্ট গ্রহণ সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর মধ্যে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন পণ্যের পেটেন্টের হারও চোখে পড়ার মতো। (চিত্র-২)।

ii) প্রযুক্তিগত বিশেষায়নের দিক থেকে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল, ফার্মার গুরুত্ব ক্রমশ কমছে এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে পেটেন্টের সংখ্যা বাড়ছে। (চিত্র-৩)

এখন দেখার বিষয় হল, এই পেটেন্টগুলির মালিকানা কাদের হাতে। দেশীয় না বিদেশি সংস্থা, ফার্মা ক্ষেত্রে ভারতীয় আবিষ্কাকদের পাওয়া প্রায় সব মার্কিন পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক দপ্তর (USPTO) অনুমোদিত পেটেন্টের মালিকানাই দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলির দখলে। USR 2010 অনুযায়ী, TRIPS কার্যকর হওয়ার পরেও দেশীয় সংস্থাগুলির পেটেন্টের সংখ্যা বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে রপ্তানি, নিট বাণিজ্য জের, গবেষণা ব্যয়, ভারতে এবং ভারতের বাইরে দেওয়া পেটেন্টের সংখ্যা, মার্কিন 'ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' অনুমোদিত Abbreviated New Drug Applications—(ANDA)-র সংখ্যা—উদ্ভাবনী কার্যকলাপের যেকোনও মাপকাঠিতেই ভারতীয় ফার্মা সংস্থাগুলি অসামান্য ভালো ফল করেছে। ম্যানি ও নেলসন, ২০১৩। তবে সফ্‌টওয়্যার বা তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পেটেন্টের ক্ষেত্রে ছবিটা অন্যরকম। সারণি-১ থেকে স্পষ্ট যে, এ সংক্রান্ত প্রায় সব পেটেন্টই বহুজাতিক সংস্থাগুলির দখলে। সস্তা ও দক্ষ মানবসম্পদের সুবিধা নিতে এরা ভারতে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। মোট পেটেন্টের মধ্যে সফ্‌টওয়্যার সংক্রান্ত পেটেন্টের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় পেটেন্টগুলির বিদেশি মালিকানার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এ হল উদ্ভাবনের বিশ্বায়নের এক অঙ্গ, যেখানে ভারত ও চীন রয়েছে একেবারে প্রথম সারিতে।

ন্যানোপ্রযুক্তি

উচ্চ প্রযুক্তির আরও যে দুটি ক্ষেত্রকে নিয়ে দেশে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেগুলি

চিত্র-২ মার্কিন পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক দপ্তরে ভারতীয় আবিষ্কারকদের মোট ও উচ্চ-প্রযুক্তির পেটেন্ট-এর ধারা

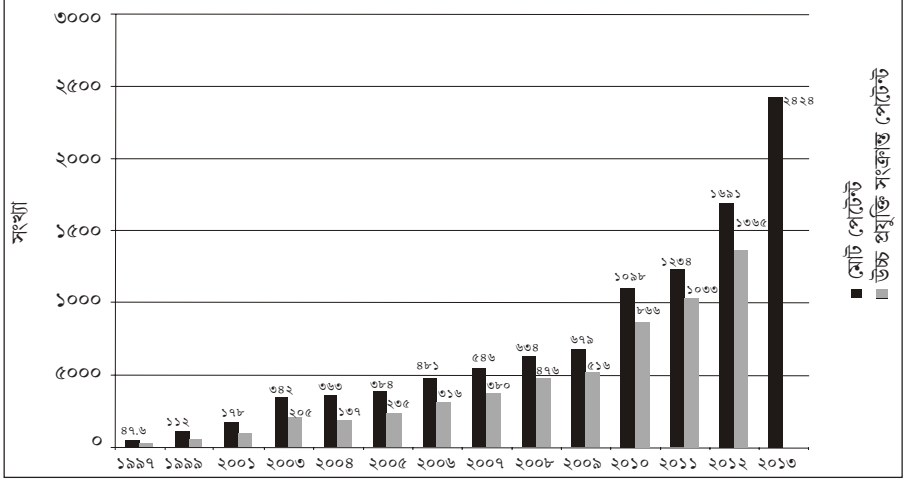

সূত্র : মার্কিন পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক দপ্তর (USPTO) এবং মার্কিন ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ড (২০১৪)।

চিত্র-৩ ফার্মা বনাম তথ্য-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির পরিবর্তনশীল গুরুত্ব (USPTO অনুমোদিত ভারতীয় আবিষ্কারকদের মোট পেটেন্টের শতকরা ভাগ)

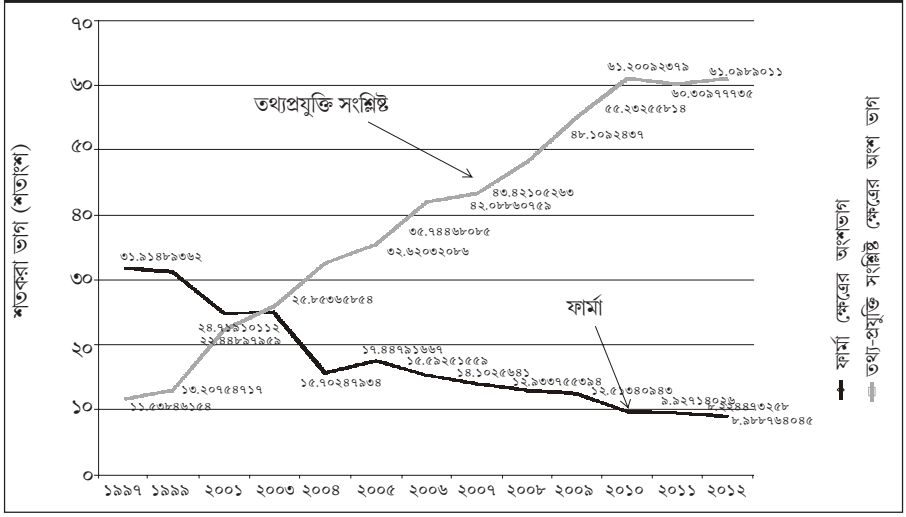

সূত্র : মার্কিন ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ড (২০১৪)।

সারণি-১
USPTO-র তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পেটেন্টগুলির মালিকানা অনুসারে বণ্টন

	তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পেটেন্ট (সংখ্যা)			শতাংশের হিসাবে	
	দেশীয়	বহুজাতিক	মোট	দেশীয়	বহুজাতিক
২০০৮	১৭	৯৭	১১৪	১৪.৯১	৮৫.০৯
২০০৯	২১	১২৯	১৫০	১৪.০০	৮৬.০০
২০১০	৫১	২৪৫	২৯৬	১৭.২৩	৮২.৭৭
২০১১	৩৮	৩৫২	৩৯০	৯.৭৪	৯০.২৬
২০১২	৫৪	৪৬১	৫১৫	১০.৪৯	৮৯.৫১
২০১৩	১০০	১২৬৮	১৩৬৮	৭.৩০	৯২.৭১

সূত্র : USPTO।

হল ন্যানোপ্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৭-২০১২) ভারতে ন্যানো মিশন প্রকল্পের সূচনা হয়। (http ://nanomission.gov.in/)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর-এর কার্যবাহক সংস্থা নিযুক্ত হয়েছিল। ন্যানোপ্রযুক্তির গবেষণা ও পরিকাঠামো নির্মাণে প্রথম পাঁচ বছরে বরাদ্দ করা হয় ১০ হাজার কোটি টাকা। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতকে ন্যানো প্রযুক্তির বিশ্বজনীন 'নলেজ হাব' হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়। এ জন্য ন্যানোপ্রযুক্তি চর্চার একটি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দেশ জুড়ে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর স্তরে ন্যানোপ্রযুক্তির পাঠক্রম চালুরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ন্যানোপ্রযুক্তি নিয়ে বেশ কিছু মৌলিক গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থ এই মিশন থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ সালে তিন বছর মেয়াদি এমন ২৩টি গবেষণা প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মিশনের অর্থসাহায্য করা মোট প্রকল্পের সংখ্যা ২৪০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর জানাচ্ছে, ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত ন্যানো মিশনের মাধ্যমে ৪৪৭৬টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ৮০০ জন এই বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন। মাস্টার অফ টেকনোলজি (এম.টেক.) ডিগ্রি পেয়েছেন ৫৪৬ জন, মাস্টার অফ সায়েন্স (এম.এসসি.) ৯২ জন।

চিত্র-৪ মার্কিন পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক দপ্তর (USPTO) অনুমোদিত বায়ো-টেকনোলজি ক্ষেত্রে ভারতীয় আবিষ্কারকদের পেটেন্টের সংখ্যা

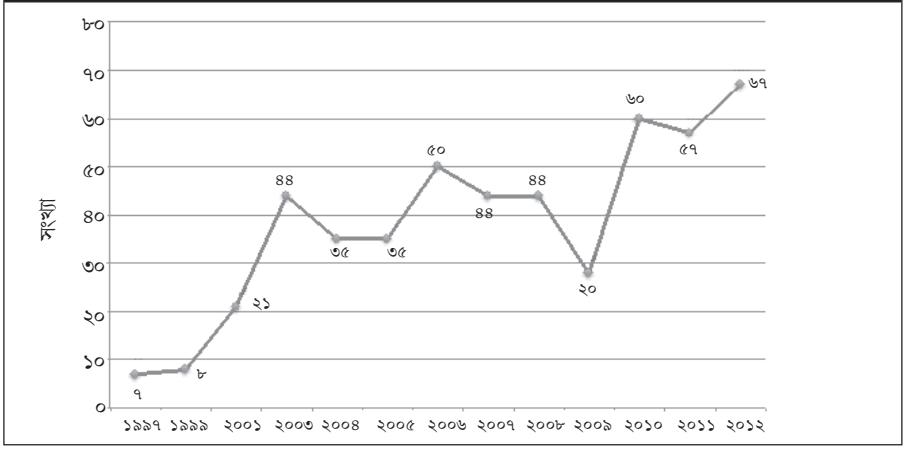

সূত্র : মার্কিন ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ড (২০১৪)।

Consumer Products Inventory (Project on Emerging Nano Technologies, 2014) একটি নথি রেখেছে, যেখানে ন্যানোপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত যে সব পণ্য বাজারে বিক্রি হয়, তাদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের দুটি পণ্যের নাম আছে। তবে এগুলি ভারতে উৎপাদিত হলেও একটি বহুজাতিক সংস্থা এর উৎপাদক। এই তথ্যতালিকাতেই বিশ্বের মোট ১৬২৮টি এবং চীনের তৈরি ৫৯টি পণ্যের নাম বর্তমান। কেন্দ্রীয় উৎপাদন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের অধীনে সরকার সম্প্রতি একটি ন্যানো উৎপাদন প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ২০১৪-১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে এই কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, দেশে ন্যানোপ্রযুক্তির উন্নয়ন মূলত মানবসম্পদ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই এর বাণিজ্যিকীকরণের শৈশবাবস্থা এখনও কাটেনি।

চিত্র-৫ ভারতীয় বায়ো-টেকনোলজি শিল্পের বিকাশ (বর্তমান দরে বিক্রয় আয়ের ভিত্তিতে)

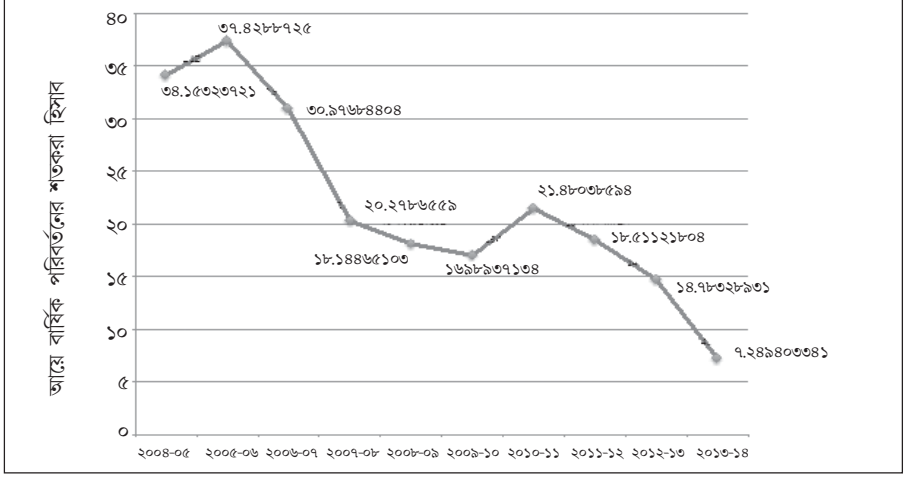

সূত্র : অ্যাসোসিয়েশন অব বায়োটেক লেড এন্টারপ্রাইজেস্ (ABLE)—বায়োসেকট্রাম সার্ভে।

জৈবপ্রযুক্তি

আর একটি উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষেত্র হল জৈবপ্রযুক্তি (বায়ো-টেকনোলজি), যেখানে নীতিগত সহায়তায় জোরকদমে চলছে গবেষণা ও উৎপাদনের কাজ। এই শিল্পে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস দু দশকেরও বেশি পুরোনো। মূলত তিনটি লক্ষ্য নিয়ে সরকার এই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছিল। সেগুলি হল—জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের সংখ্যা ও গুণগত মান বাড়ানো, বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের জন্য পরীক্ষাগার ও গবেষণাকেন্দ্রগুলির একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং জৈবপ্রযুক্তি পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের জন্য সংস্থা ও ক্লাস্টার গড়ে তোলা। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া বেশ কিছু রাজ্য সরকারও এই ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ নীতি ঘোষণা করেছে। এই সবের ফলস্বরূপ ভারত থেকে জৈবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশ ও পেটেন্ট গ্রহণের সংখ্যা ক্রমশই বেড়েছে। (কোয়াক ও অন্যান্য, ২০০৬)। (চিত্র-৪)। এই শিল্পের যে পাঁচটি উপক্ষেত্র

চিত্র-৬ গ্রামীণ বনাম শহুরে এলাকায় টেলি-ঘনত্বের অনুপাত

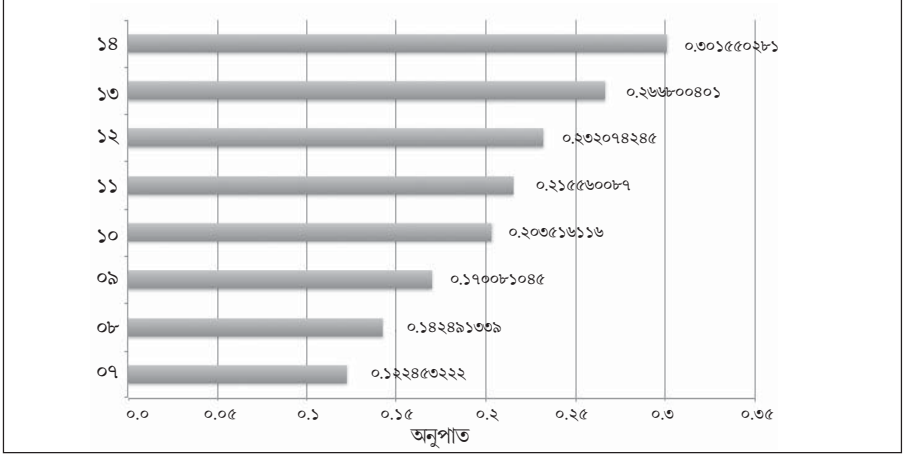

সূত্র : দূরসঞ্চার দপ্তর (২০১৩) ও ভারতীয় দূরসঞ্চার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ (TRAI) (২০১৪)।

রয়েছে সেগুলি হল— জৈব ফার্মাসিউটিক্যাল (মোট উপার্জনের ৬৩ শতাংশ), জৈব পরিষেবা (১৯ শতাংশ), কৃষি সংক্রান্ত জৈবপ্রযুক্তি (১৩ শতাংশ), শিল্প বিষয়ক জৈবপ্রযুক্তি (৩ শতাংশ) এবং জৈব তথ্য বিষয়ক বিজ্ঞান (১.২৪ শতাংশ)। ২০০৩-০৪ থেকে ২০১৩-১৪ সাল, এই এক দশকে জৈবপ্রযুক্তি শিল্পের বার্ষিক গড় বিকাশ হয়েছে ২২ শতাংশ হারে। তবে বছর ধরে হিসাব করলে এর বিকাশের হারে নিম্নমুখী প্রবণতাও চোখে পড়বে (চিত্র-৫)। এই শিল্পের উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকই রপ্তানি করা হয়।

যোগাযোগ প্রযুক্তি

মহাকাশ এবং বিমানপথ—দুটি ক্ষেত্রেই ভারতের যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। যোগাযোগ প্রযুক্তি ও দূর সংবেদী (রিমোট সেনসিং) ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে দূরশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় টেলি যোগাযোগ স্থাপনে এই প্রযুক্তি অসামান্য কাজ করছে। গ্রামীণ এলাকায় টেলিকম পরিষেবা দানকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিয়ে কীভাবে কম মাশুলে অধিকসংখ্যক উপভোক্তার নাগালে পরিষেবাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, ভারত তা সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে। এর ফলে এমনকী গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও টেলি-ঘনত্ব নাটকীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। শহরের তুলনায় গ্রামের টেলি-ঘনত্বের অনুপাতের হিসাব দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে (চিত্র-৬)।

উপসংহার

উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ভারত সচেষ্ট। তবে এখনও দেশের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির নিরিখে এই ক্ষেত্রের ভাগ খুবই সামান্য। ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা এবং এরোস্পেস শিল্পে ভারতের পারদর্শিতা আজ আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত। এই শিল্পগুলির উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে দেশীয় সংস্থাগুলি অগ্রণী হলেও বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসছে। ২০১১ সালে প্রকাশিত উৎপাদন কৌশলনীতি এবং নতুন সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' (ভারতেই তৈরি করুন) নীতিতেও উচ্চ ও মধ্য প্রযুক্তির শিল্পক্ষেত্রকে উৎসাহদানের কথা বলা হয়েছে। এর যথাযথ রূপায়ণ হলে দেশের অর্থনীতির বিকাশহার আরও বাড়বে, সুনিশ্চিত হবে প্রগতির পথ।❑

[লেখক কেরালার 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ'-এ অধ্যাপক। email : mani@cds.edu]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও উদ্ভাবন

ভিনদেশি অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের শিক্ষা

উন্নয়নশীল দেশ, এ তকমা আমরা ঝেড়ে ফেলতে চাই। আমাদের স্বপ্ন উন্নত বিশ্বের আঙিনায় পা ফেলার। দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের মতো দেশ এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগকে সহায় করে। এই দু'দেশ থেকে ভারতের শেখার আছে। নিবন্ধকার **ড. মনোজ জোশী, অপূর্ব শ্রীবাস্তব** ও **ড. (শ্রীমতী) বলবিন্দর শুক্লের** *মতে উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনে আমরাও যথেষ্ট দড়। শুধু চাই উদ্যোগ ও উদ্ভাবনা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ। উদ্যোগ ও উদ্ভাবনার ক্ষুদ্র-মাঝারি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও এই লেখায় ঠাঁই পেয়েছে।*

উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনী চর্চা

উদ্ভাবন নিয়ে লেখালেখি বা বইপত্তরের সংখ্যা গোনাগুনতি। রজার্স (১৯৮৩)-এর সংজ্ঞা অনুসারে উদ্ভাবন হচ্ছে কোনও ধারণা, চর্চা বা বস্তু যা কিনা এগুলির অবলম্বনকারীর কাছে নতুন বলে বিবেচিত। আবার, ড্যামানপৌর (১৯৯১)-এর মতে কোনও সংস্থায় নিজেদের সৃষ্ট বা ক্রীত নয়া পদ্ধতি, ব্যবস্থা, নীতি, কর্মসূচি, প্রক্রিয়া পণ্য বা পরিষেবা গ্রহণ হল উদ্ভাবন। কেউ কেউ উদ্ভাবন-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "এটা হচ্ছে নতুন বা উন্নত এবং যার দাম আছে।" টমসন (১৯৬৯)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী উদ্ভাবন হল "অন্যান্য প্রতিযোগীর থেকে পৃথক ধরনের পণ্য এবং পরিষেবা জোগান দেবার ক্ষমতা ও ক্রেতাদের কাছে যা ব্যবহার করা লাভজনক।" ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি সচরাচর ছোটখাট, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারিক মালিকানাধীন (ব্রকহাউস ১৯৮০), দ্রুত বৃদ্ধিশীল (ড্রুকার ১৯৮৫), উদ্ভাবনামূলক।

আধুনিক উন্নত দেশগুলিতে উদ্ভাবনের ঝোঁক বেশি লাভদায়ক পণ্য উৎপাদনের দিকে। এজন্য চাই উঁচুমানের শিক্ষা ও দক্ষতা। দরকার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। উৎপাদন হবে বৃহদায়তনে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা পৌঁছবে উচ্চস্তরে। কোনও অদলবদল ছাড়া, নিজেদের প্রয়োজন বা অবস্থার সঙ্গে মানানসই না করে কম উন্নত দেশ এহেন উদ্ভাবন বিদেশ থেকে গ্রহণ করলে ফল কী দাঁড়াবে? সহায়সম্পদ, সঞ্চয় ও পরিকাঠামো পুঞ্জীভূত হবে অর্থনীতির একটি ক্ষুদ্র অংশে। কম আয়ের দেশে শ্রম ও কাঁচামাল সহ অন্যান্য সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে না।

উন্নত দেশের উদ্ভাবন গ্রহণ করলে দ্বৈত অর্থনীতির (কিছু ক্ষেত্র প্রযুক্তিতে সড়গড় ও বাদবাকিরা সাবেকি) উদ্ভব ঘটবে। উৎপাদন কৃৎকৌশলে মূলধনের আধিক্য, ম্যানেজার বা উঁচু ব্যবস্থাপক পদে বেশিরভাগ বিদেশিদের নিয়োগ, দক্ষতায় ঘাটতি, বেকারি ও আধা-বেকারি এবং আধুনিক ক্ষেত্র ছাড়া বাদবাকি অর্থনীতির ছন্নছাড়া দশা—এই দ্বৈত অর্থনীতির রকমসকম। এ থেকে রেহাই পেতে হলে নির্বিচারে বিদেশি উদ্ভাবন গ্রহণের মনোভাব ছাড়া জরুরি। নিজেদের অর্থনীতির প্রয়োজন বা অবস্থার সঙ্গে লাগসই করে বিদেশি উদ্ভাবন কাজে লাগাতে হবে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকদের আধুনিক কলকারখানায় কাজ দেওয়া যাবে। এ ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতও হাঁটছে এপথে।

কী ধরনের উদ্ভাবন বেশি উপযুক্ত? কম আয়ের ক্রেতাদের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম প্রযুক্তি এ ভূমিকা নিতে পারে। গোটা দুনিয়ায় ধনসম্পত্তি গড়তে উদ্ভাবকরাই সবচেয়ে দড়। আর এর সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব ম্যানেজার ও অন্যান্যদের। বিকাশে সবচেয়ে বড় অবদান সংগঠক বা উদ্যোক্তার। বিকাশের দরুন কর্মসংস্থান হয়। সংগঠকরাই ধনসম্পত্তির নতুন উৎস গড়ে তোলে (জোশী ২০১০)। আরও বেশি উপযুক্ত উদ্ভাবন সামাজিকভাবে খুব উপযোগী নাও হতে পারে। শিখতে হবে ক্ষতিটাকে ছাপিয়ে প্রাপ্তির অঙ্ক যাতে ভারী করা যায়।

গবেষণা করা দরকার অন্যদের তুলনায় কিছু কোম্পানি কেন বেশি আয় করে। কী করে বাদবাকিদের চেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্র বেশি সম্পত্তি গড়ে তোলে। কয়েকটি দেশ কেন বেশি এগিয়ে। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্ভাবন কি এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান? (জোশী ২০১০)।

প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে উন্নত বিশ্বের এত রমরমা। কম উন্নত দেশগুলিও তা উদ্ভাবনের হিম্মত রাখে। এই প্রযুক্তির স্তর সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। এর ফলে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা জানতে পারব। এক, ওই প্রযুক্তির সঠিক চরিত্র। দুই, কম উন্নত দেশে এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনগত সামর্থ্য কতখানি মিলছে। তিন, আধুনিক বিকাশের পথচলাকালীন সেই প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনগত সামর্থ্যের পরিবর্তনশীল চরিত্র।

বস্তুত, ব্যবস্থাপক পদে বিদেশি নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যুক্তি শিল্প-ব্যবসা পরিচালনা ক্ষমতার ঘাটতি মেটানো।

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক বিকাশের ধাঁচ থেকে মানব সম্পদ ভিত্তিক ব্যবস্থার দিকে অর্থনীতির উত্তরণের সময় ক্রমাগত পরিবর্তনশীল উপাদানের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতরতা বেড়ে যায়। প্রথমে অভ্যন্তরীণ অদক্ষ শ্রমিকদের সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর দিকটি গুরুত্ব পায়। পরবর্তীকালে অভ্যন্তরীণ দক্ষতা ও উদ্ভাবনপটুতা।

কোরিয়া-তাইওয়ান থেকে উদ্ভাবন সংক্রান্ত শিক্ষা

গত শতকে সাতের দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ ইস্তক কোরিয়া ও তাইওয়ানে কোনও স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি নীতি চালু ছিল না। দু'একটি ক্ষেত্র অবশ্য এর ব্যতিক্রম। কোরিয়া প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। লাইসেন্স সংক্রান্ত চুক্তিও পর্যালোচনা করে দেখা হত। তবে নিতান্ত দায়সারাভাবে। জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিতে ঘোষিত 'ইনসেনটিভে' সাড়া দিয়ে এই দু'দেশ গোড়ার দিকে উৎপাদনশীলতায় ফারাক ঘোচাতে সক্ষম হয়।

এসব নীতির অন্যতম:

ক) দেশের ভিতর ও বিদেশে বিক্রি থেকে লাভের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা। আর অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে সংরক্ষণে ফারাকও ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

খ) অভ্যন্তরীণ বাজারে নতুন শিল্পকে সংরক্ষণের পাশাপাশি রপ্তানি বাড়ানোয় উৎসাহ।

গ) শ্রম বাজারে তেমন একটা হস্তক্ষেপ করা হয়নি। এর পাশাপাশি সুদের বাজার হারের কিছু ব্যবস্থার দরুন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় মজুরির অনুপাত দুর্লভতা মূল্যের (স্কেয়ারসিটি ভ্যালু) কাছাকাছি ছিল। এসব ইনসেনটিভের দরুন প্রযুক্তিক্ষেত্রে বেশ অনুকূল

পরিস্থিত গড়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার বেশি না থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তি ও জ্ঞান কাজে লাগানো অনেকটা অনায়াসসাধ্য ছিল। মজুরির অনুপাত কম থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল শ্রম-নিবিড় বা বেশি শ্রমিক-নির্ভর।

উৎপাদন প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন না হওয়ায় ও উৎপাদনের জন্য সাধারণ সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করায় উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য খুচখাচ উদ্ভাবনের বেশ মওকা ছিল। আর এহেন উদ্ভাবন সাধারণ মজুরদের মাথা থেকেই বেরোত।

কোরিয়া ঋণ নীতির মাধ্যমে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশে উৎসাহ দিয়েছিল। সেদেশে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি এবং অপেক্ষাকৃত নতুন ও কম মজুরি দেওয়া সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে ঢুকে পড়ায় বৃহৎ সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তি অর্জন করে আরও মূলধন-প্রধান শিল্প গড়তে উৎসাহিত করা হয়।

ভোগপণ্য শিল্পে তাইওয়ানেও দেখা যায় কোরিয়ার অনুরূপ পরিস্থিতি। নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশের সময় তাইওয়ান অবশ্য গবেষণা উন্নয়নের জন্য বৃহৎ সংস্থার বিকাশে উৎসাহ জোগানে ক্ষান্ত ছিল। তার পরিবর্তে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এবং 'চায়না প্রোডাকটিভিটি সেন্টার'-এর মতো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো হয়। নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন, নয়া পণ্য ও প্রক্রিয়া বানানো এবং এসব পণ্য-প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক বাজার খোঁজার ভার পড়ে এদের হাতে।

উদ্ভাবকদের কী করা দরকার

১) শিল্পোদ্যোগী হওয়াটা সেরা পছন্দ— এটাই মনে করতে হবে। এজন্য বিকল্প ব্যয়-ফায়দা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও পুরস্কারের খুঁটিনাটি মূল্যায়ন করা দরকার। লাভের কড়ি ব্যয়ের অঙ্ককে ছাপিয়ে গেলে সুযোগ হাসিল করতে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

২) আগের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে পছন্দ ও অপছন্দের একটি তালিকা তৈরি।

৩) বাজারের ফাঁকফোকর, প্রতিযোগীদের দক্ষতা ও জনসংযোগ নিয়ে তত্ত্বতালাশ চালানো দরকার। বাজারে সুযোগ কাজে লাগাতে এটা অনেক সময় অপরিহার্য। চলতি পণ্য বা পরিষেবায় ক্রেতারা সন্তুষ্ট না থাকলে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার।

৪) সম্ভাব্য গ্রাহকদের বিষয়ে বিশদ ধারণা থাকা চাই। খতিয়ে দেখতে হবে তারা তাদের পছন্দসই পণ্য বা পরিষেবার জন্য কতটা উৎসুক। বাজারে কতটা পণ্য বিকোতে পারে তার হিসেব করা।

উদ্ভাবন ও উদ্ভাবকের সামনে বাধাবিঘ্ন

উদ্ভাবিত পণ্য বা পরিষেবা থেকে লাভের অঙ্কে কারও পোষাতে নাও পারে। বাজারের এই প্রতিবন্ধকতার সামনে উদ্ভাবক বেশ কিছুটা অসহায়। অন্যান্য ঝুঁকি, অপর্যাপ্ত গবেষণা ইত্যাদিও আছে। এছাড়া, আর এক বাধা হচ্ছে দীর্ঘকালীন লাভালাভের কথা না ভেবে চটজলদি ফায়দা তোলার দিকে মাত্রাতিরিক্ত নজর। আর্থিক সমস্যাও এক বড় ফ্যাঁকড়া। এসবের দরুন অর্থলগ্নিতে ঋণদাতারা অরাজি হতে পারে। বাধা আসতে পারে সরকারের তরফেও। স্থানীয় নিয়মকানুনের বেড়াজালে অনেক সময় উদ্ভাবককে ভুগতে হয়।

উদ্ভাবন প্রবক্তাকে সাধারণ বাধাবিপত্তির সামনে মাথা নোয়ালে চলবে না। তাহলে সংস্থায় উদ্ভাবন থমকে যাবে। এই বাধাবিঘ্নের যোগাযোগের ঘাটতি, মধ্যে আছে অপর্যাপ্ত ইনসেনটিভ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন দপ্তরের ওজর -আপত্তি। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা পুরোনো সংস্থায় উদ্ভাবনের পক্ষে এক গেরো। কিন্তু নতুন সংস্থায় তা আবার উদ্ভাবনের জন্য শ্রেয়।

ভারতের শিক্ষণীয়

আমাদের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের ঢের গুরুত্ব। গবেষণায় দেখা গেছে এই শিল্পের সংস্থাগুলিতে উদ্ভাবন বাড়ছে। কিছু উদ্ভাবন তো রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে। এদেশে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে বিকাশের সম্ভাবনা চীনের মতো।

নতুন সংস্থাকে উৎসাহ জোগানো এবং ক্ষুদ্র শিল্পের বাড়বাড়ন্তে সাহায্য করাটা গুরুত্ব পাচ্ছে তামাম বিশ্বে। বহু দেশ উদ্যোগীদের অনুপ্রাণিত করতে যৎপরোনাস্তি তৎপর। অধিকাংশ উন্নত দেশ মনে করে নতুন ও ছোটখাট সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের উৎস। উদ্যোগ ও উদ্ভাবনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ভারতে নীতি তালিকায় তা খুব গুরুত্ব পেয়েছে। উন্নয়নে কোনও খামতি মেটাতে দক্ষিণ কোরিয়ার 'ডেডিকেটেড কমিউনিটি অব অনট্রপ্রনাল ভেন্ডারস' খুব কাজের।

ক্ষুদ্র-মাঝারি সংস্থায় উদ্ভাবন জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে সাহায্য করে। উদ্ভাবন ও ক্ষুদ্র-মাঝারি সংস্থার গুরুত্বে স্বীকৃতি মেলায় বেশ কিছু দেশে উদ্ভাবনের জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নতুন কর্মসংস্থানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ক্ষুদ্র সংস্থার। আগামী দিনে সম্ভাব্য বৃহৎ নিয়োগকারী ও সম্পত্তি সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখা হয় বলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা ঘিরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলের খুব আগ্রহ। হেন্ডারসন ও ক্লার্ক (১৯৯০) বলেন যে উদ্যোগীরা নতুন কাজ সৃষ্টি করে, আয় ও সম্পত্তি বাড়ায় এবং বিশ্ব ও স্থানীয় অর্থনীতির মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে সাহায্য করে। অনেক অর্থনীতিবিদের কথায় তারা অর্থনীতির বিকাশের ইঞ্জিন। কিন্তু ক্ষুদ্র-মাঝারি সংস্থার বিকাশে উদ্ভাবনের ভূমিকা বুঝতে আমরা এখনও পিছিয়ে।

উদ্ভাবন বা নতুন পণ্য ও পরিষেবা গড়ার প্রক্রিয়া ক্ষুদ্র-মাঝারি সংস্থাগুলি কীভাবে হাসিল করে তা নিয়ে জোর চর্চা চালানো দরকার। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে পণ্য উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে সক্রিয় অঙ্গীকার থাকা জরুরি। কাইজার এবং অন্যান্যরা বলেন যে উদ্ভাবনে অবদান থাকে তিনটি উপাদানের। উদ্ভাবনের জন্য ভরতুকি কাজে লাগানো, জ্ঞান কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগসূত্র থাকা এবং গবেষণা বিকাশ বাবদ অর্থ বরাদ্দ করা।

কে বলে ভারতে উদ্ভাবন হয় না? ভারতকে এক উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য সাহায্য করছে ইন্ডিয়া ইঙ্ক (বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এতে ধরতে হবে)। একক প্রচেষ্টা তো আছেই কিছু কিছু বিষয়ে সংস্থাগুলি যৌথভাবে কাজ করছে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম বলে গণ্য। শিক্ষা (কারিগরি, পেশাগত), ভেষজ শিল্প, চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থাপনা, কৃষি, দূরসঞ্চার, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা, মহাকাশ বিজ্ঞান, পরমাণু বিজ্ঞান, তাপ, জল, গ্যাস ও অন্যান্য উৎস থেকে শক্তি উৎপাদন, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার অনুসন্ধান। সফ্‌টওয়্যার-হার্ডওয়্যার শিল্প, ব্যাংকিং ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক পরিষেবা, রেল এবং মেট্রো রেলের মতো অন্য পরিবহণ ক্ষেত্র, পরিকাঠামো উন্নয়ন। জাহাজ পরিবহণ ও বন্দর ব্যবস্থাপনা, জেনেটিক্স, বায়ো মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রল ও পেট্রকেমিক্যাল, ভোগ্যপণ্য, ওষুধ গবেষণা, উদ্ভিদ গবেষণা, ভূতত্ত্ব গবেষণা, মৌল-বিজ্ঞান গবেষণা কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের গবেষণার কথাও উল্লেখ করতে হয়। আর এসব ক্ষেত্রে যে কাজ তা 'ভারতে বিশ্ব মান'-এর বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

এখন, ভারতে পণ্য, প্রক্রিয়া বা পরিষেবা সংক্রান্ত উদ্ভাবনে শামিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলিও। বস্তুত, ভারতের আঞ্চলিক অবস্থান তাকে উদ্ভাবন প্রসারে বাধ্য করেছে। অন্যথায় বহু ক্ষেত্র অস্তিত্বের সংকটে পড়ত। তাই, ভারতের মতো দেশকে শিল্প-বাণিজ্যের সুপরিবেশ ও কৃষ্টি গড়ে তুলতে হবে। উদ্যোক্তা এবং সংস্থাকে উদ্ভাবনে সাহায্য করবে এই সুপরিবেশ ও কৃষ্টি। এর বিনিময়ে উদ্যোক্তা ও সংস্থাগুলি দেশে কর্মসংস্থান, সম্পত্তি সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকবে।❑

[অ্যামিটি বিজনেস স্কুল-এ ড. জোশী (manoj.joshi.m@gmail.com)'অন্ত্রপ্রেনিউরশিপ, স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইন্নোভেশন'-বিষয়ক অধ্যাপক, শ্রী শ্রীবাস্তব (mail z2 apoorva@gmail.com) লেকচারার এবং ড. শুক্ল (bshukla@amity.edu) উপাচার্য।]

উদ্ভাবন ও বিশ্বায়ন

সনাতন ধ্যানধারণাকে ধূলিসাৎ করে বিশ্বায়নের প্রভাবে গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের দুনিয়া কেমন আমূল পালটে গেছে। বিবর্তনের এই ক্রমপর্যায়ে ভারত-চীনসহ এশিয়ার বিকাশশীল দেশগুলির প্রথম সারিতে উঠে আসা এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের যুগের সূচনা বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরেছেন **ড. ভি. ভি. কৃষ্ণ**।

বিশ্বায়ন কেবলমাত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিসরে আবদ্ধ নয়। যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লব সারা পৃথিবীকে এমন এক গ্রামে পরিণত করেছে, যেখানে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অসংখ্য পথ খোলা। বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর। জ্ঞানের সৃষ্টি, মালিকানা, উন্নয়ন ও বিপণন বিষয়ক ধারণাগুলিই পালটে গেছে। এমনকী এর মূলে থাকা গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাঠামোও রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বায়নের প্রভাবে। গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবনের মতো শব্দগুলো শুধু যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঢুকে পড়েছে তাই নয়, এগুলি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী নীতি প্রণয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ন্যানো প্রযুক্তি, জীবচিকিৎসা, বৈদ্যুতিন এবং বস্তুবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগই হোক অথবা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কল্যাণ, জলবায়ু পরিবর্তন, সুস্থিত উন্নয়ন, এমনকী বিনোদন শিল্প সব ক্ষেত্রেই গবেষণা উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাট উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ও কারিগরি পরিবর্তনের মাত্রা স্বল্প, সব সময়ে গবেষণামূলক কার্যকলাপেরও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু মৌলিক উদ্ভাবন বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ পরীক্ষাগার ও বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির চালানো গবেষণার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই ধরনের উদ্ভাবন ও বিশ্বায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই আমরা আগ্রহী। গত কয়েক দশকে বিশ্বায়ন কীভাবে গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় রূপান্তর এনেছে তার বিশ্লেষণ, রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায় এবং এই পটপরিবর্তন কীভাবে এশিয়ায় উদ্ভাবনী জগতে নতুন ভৌগোলিক সীমানা এঁকে দিয়েছে, এই সবই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান হল গবেষণা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কাজকর্মের মূল কেন্দ্রস্থল। এ ক্ষেত্রে অর্থ মূলত আসে সরকার এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে। বিশ্বের অধিকাংশ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং ভোগ্যপণ্য আবিষ্কারের নেপথ্যে রয়েছে কর্পোরেট সংস্থাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা। আসলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি এতটাই গোপনীয় ও কাঠামোগত স্তরবিন্যাসে বিভাজিত যে, এর স্থান মূলত বহুজাতিক সংস্থাগুলির সদর দপ্তরেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। গত দেড় দশকে বিশ্বায়নের প্রভাবে তিনটি প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে, যা উদ্ভাবন ও বিশ্বায়নের পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুন রূপ দিয়েছে।

প্রথমত আটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেদের সংশ্লিষ্ট দেশে এই গবেষণা ও উদ্ভাবনের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড চালাত। ক্রমশ গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ এবং পরীক্ষাগারগুলিকে স্বদেশের বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়া হল। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড়ে তোলা হল সহায়ক পরীক্ষাগার। এই পরীক্ষাগারগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে তুলনামূলক কম ব্যয়ের সুবিধা। বিদেশি রাষ্ট্রের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, তার বাজার ও প্রযুক্তি পদ্ধতি আত্মীকরণ প্রভৃতি। এদের প্রধান কাজ হল প্রযুক্তি হস্তান্তরে অংশ নিয়ে মূল উদ্ভাবনী প্রক্রিয়াকে নিজেদের প্রয়োজন মতো গড়েপিটে নেওয়া। আটের দশকের শেষ থেকে এই সহায়ক পরীক্ষাগারগুলির বাইরে গিয়ে গবেষণার কাজ করার একটা প্রবণতা দেখা গেল। বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন এলাকায় গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করল, যাকে এক কথায় স্থানীয়ভাবে সংযুক্ত পরীক্ষাগার বলা যায়। (পিয়ার্স ও সিং, ১৯৯২; পিরার্স, ২০০৫)। এগুলিতে গবেষণার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল।

গবেষণা-উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের 'একমুখী যাত্রা' ক্রমশ রূপান্তরিত হল 'দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায়'। উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের বাইরেও চলল গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ। উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং পণ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করল নতুন এই কেন্দ্রগুলি। উন্নয়নশীল পৃথিবী, বিশেষত এশীয় অর্থনীতির সাপেক্ষে গবেষণার প্রকৃতি পালটে গেল। 'গ্রহণকারী' গবেষণা পরিবর্তিত হল 'সৃজনশীল' গবেষণায়। এর সুফল পেতে থাকল সারা পৃথিবীর বাজার। এই পর্যায়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কিছু উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া আনলেও উদ্ভাবনী শৃঙ্খল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করেনি। কিন্তু এরপর বিভিন্ন বিষয় ও উপাদান, গবেষণার বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করল। বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতা এবং সেইসঙ্গে ভোগকারীর চাহিদা, রুচি ও পছন্দের বিশ্বায়নের জেরে

প্রয়োজন হল নতুন প্রযুক্তির বিজ্ঞান ভিত্তির আরও প্রসারের। দরকার হয়ে পড়ল এর বহুমুখী সরবরাহ। বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেদের দেশে এবং উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানে যে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল, কেবল যেগুলির মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বাজার ও চাহিদার সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। সেই জন্য আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির গবেষণা এবং উৎপাদনকেন্দ্র নির্দিষ্ট ওই অঞ্চলের বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নতি এবং বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তির নতুন কাঠামো এই প্রক্রিয়ায় আরও গতির সঞ্চার করে।

নয়ের দশকে আবার নতুন এক প্রবণতার সূত্রপাত হল। ১৯৯০ সালের শেষদিক থেকে ব্যবসা ও জ্ঞান, গবেষণা ও কারিগরি পরিষেবার আউটসোর্সিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বিদেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হল। (টাপির্ন ও কৃষ্ণা, ২০০৭)। বেশ কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার খুলে দিল উদারীকরণ ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের দরজা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, পরিষেবা, খুচরো ব্যবসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে এর প্রভাব পড়ে গবেষণার ওপরেও। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে এশিয়ায় প্রতি বছর ১১ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি হয়। UNCTAD-এর 'বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০০৫' শীর্ষক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি এবং বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশকে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের পছন্দ হিসাবে চিহ্নিত করছেন। বিনিয়োগ গন্তব্যের বিচারে প্রথম সারিতে রয়েছে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ব্রাজিল। এদের প্রাপ্তমান যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ, ৫১ শতাংশ, ৫১ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে চীন, ভারত ও বিকাশশীল BRICS-এর নেতৃত্বে এশিয়ার উত্থানে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। গড়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব চাহিদা, নতুন এই ভোগবাদ, বিশ্বজুড়ে একই ধরনের জীবনচর্যা প্রভাব ফেলেছে গবেষণা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার ওপরেও। দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদায় কোনও পণ্যদ্রব্য পরীক্ষাগার থেকে উৎপাদন কেন্দ্র এবং ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। প্রবল এই গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে কর্পোরেট সংস্থার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থাকা গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র। (দ্য ইকোনমিস্ট, ৩ মার্চ, ২০০৭)। তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের সঙ্গে বৈদ্যুতিন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় অগ্রগতি ভৌগোলিক সীমাগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে। মূল্য শৃঙ্খলের বিভিন স্তরে সৃষ্টি হয়েছে নতুন উদ্ভাবনী সম্ভাবনা। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ, বৈদ্যুতিন সামগ্রী, গাড়ি শিল্পের মতো শয়ে শয়ে ক্ষেত্রে ইতিহাসে এই প্রথম জ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন, সরবরাহ ও ভোগের এক নতুন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। প্রতিটি পণ্যই একাধিক উপাদানের সমাহার। এই সবকটি উপাদানই বিশেষ পরীক্ষাগারে নির্মিত। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের ওয়াইন ও মদ প্রস্তুত বা ভারতের দার্জিলিং চায়ের মতো কয়েকটি সুপ্রাচীন শিল্প ছাড়া বর্তমানে এমন শিল্পক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া ভার, যেখানে কোনও বহুজাতিক সংস্থা গবেষণা, উদ্ভাবন, মোড়কজাতকরণ, সরবরাহ ও বিপণনের কাজ নিজেই একা করছে। পরিস্থিতির এই পরিবর্তন এবং নতুন "নলেজ হাব"-এর উন্মেষে জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে বেঙ্গালুরু, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, হংকং, সিওল, বেজিং, সাও পাওলো, কেপটাউনের মতো বিভিন্ন জায়গায়। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র ভারত ও চীনে বহুজাতিক সংস্থাগুলি ১৩৫০টিরও বেশি গবেষণাকেন্দ্র ও পরীক্ষাগার স্থাপন করেছে। (কৃষ্ণা ও অন্যান্য, ২০১২)। আগেকার আন্তর্জাতিকীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রবণতার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির সংমিশ্রণে যা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বলা যায় উদ্ভাবনের বিশ্বায়ন।

অ্যাপল, মোটোরোলা, আইবিএম, সিমেনস, ইনটেল, অ্যাডোব, জি.ই.-র মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলি গবেষণা, উদ্ভাবন ও উৎপাদনী শৃঙ্খল বিশ্বের নানা প্রান্তে সরবরাহ করে যে বিপুল মুনাফা করছে, তাই হল উদ্ভাবনের এই নতুন প্রবণতার জাজ্বল্যকর নিদর্শন। প্রযুক্তি ও গবেষণাক্ষেত্রের সঙ্গে মিশেছে অর্থ, ব্যাংকিং, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিনোদনের মতো নানা ক্ষেত্র। এই যাবতীয় উপাদানকে কোনও একটি স্থানে পাওয়া অসম্ভব। বিশেষ জ্ঞান ও তার সরবরাহ এখন আর কোনও নির্দিষ্ট বহুজাতিক বা বড় সংস্থার একচেটিয়া অধিকারে নেই। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন "নলেজ হাব" ও উদ্ভাবনকেন্দ্রে তা ছড়িয়ে পড়েছে। জ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন ও ভোগশৃঙ্খলের বিভিন্ন উপাদান এখন অনুভূমিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এগুলি ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে এবং বিভিন্ন এলাকার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ২০০৬ সালে INSEAD এবং বুজ অ্যালেন হ্যামিল্টনের করা একটি যৌথ সমীক্ষা বলছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির উদ্ভাবনী কার্যকলাপে গতি আনতে 'গবেষণা সংক্রান্ত নেটওয়ার্কগুলির মান বৃদ্ধি ও সংযুক্তিকরণ' একান্ত জরুরি। ১৯টি দেশের ১৭টি ক্ষেত্রের ১৮৬টি বহুজাতিক সংস্থাকে নিয়ে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জায়গা বাছতে গিয়ে ভবিষ্যতে তাঁরা কী কী বিষয় বিবেচনা করবেন সমীক্ষায় তা জানতে চাওয়া হয়েছিল সংস্থাগুলির কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে।

উদ্ভাবনের দ্রুততা ও সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বহুজাতিক সংস্থাগুলি এখন নানা ধরনের কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতায় আবদ্ধ হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভারত, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনের মতো এশীয় দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কেবল কম খরচের জন্য নয়, "নলেজ হাব" এবং উদ্ভাবনী তৎপরতার কেন্দ্রে থাকার সুবিধা পাচ্ছে তারা। চেসব্রো (২০০৩) একে মুক্ত উদ্ভাবন ব্যবস্থা মডেল আখ্যা দিয়েছেন।

তৃতীয়ত বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে এশিয়ার উত্থান, উদ্ভাবনের নতুন ভূগোল গড়ে তুলতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। 'ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন'-এর ২০১৪ সালের 'সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডিকেটর' অনুযায়ী, ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ সাল— এই এক

দশকে গবেষণার বিশ্বজনীন মাপকাঠিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ ৩৮ শতাংশ থেকে কমে ৩১ শতাংশ হয়েছে। অথচ এই একই সময়ে এশিয়ার ভাগ ২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫ শতাংশ। NSF-এর হিসাবমতো, ২০১১ সালে গবেষণা খাতে চীনসহ পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব্যয় ৩১.৮ শতাংশ, যা উত্তর আমেরিকার প্রায় সমান (৩২.২ শতাংশ) এবং ইউরোপের থেকে বেশি (২৪ শতাংশ)। এশিয়ার এই প্রাধান্যের প্রতিফলন ঘটেছে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতেও। টমসন সায়েন্টিফিক ডাটা জানাচ্ছে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কালে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বিজ্ঞান প্রকাশনার পরিমাণ কমেছে ৭ শতাংশ এবং ৬ শতাংশ হারে। এই সময়ে এশিয়ায় তা বেড়েছে ৮৭ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন'-এর পর্যবেক্ষণেও একই রকম প্রবণতা ধরা পড়েছে।

উদ্ভাবনের এই নতুন ভূগোল, কয়েকটি এশীয় অর্থনীতিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করছে, যারা বিশেষায়িত জ্ঞান ও উদ্ভাবনের নতুন উৎস হয়ে উঠেছে। মিতব্যয়ী ও বিপরীত উদ্ভাবনের ধারণারও জন্ম ভারত, চীন ও অন্য এশীয় দেশগুলিতে। উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজারের চাহিদা মেটাতে তৈরি কোনও কমদামি দ্রব্য যখন বিশ্ববাজারের উপযোগী করে বিক্রি করা হয়, তখন তাকে বিপরীত উদ্ভাবন বলে। যেমন—ভারতের জয়পুরের কৃত্রিম পা, অরবিন্দ আই ক্লিনিকে চোখের অস্ত্রোপচার, লেন্স প্রভৃতি। মিতব্যয়ী উদ্ভাবনের অর্থ, 'অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য ন্যূনতম সম্পদ ব্যবহার করে যথাসম্ভব বেশি ফললাভ।' আবার হার্ভার্ডের চিন্তাবিদ ক্লেটন ক্রিস্টারসন চাঞ্চল্যকর (ডিসরাপটিভ) উদ্ভাবন বলে নতুন একটি ধারণার নামকরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কোনও পণ্য বা পরিষেবা অত্যন্ত সহজ ও সাদামাটাভাবে বাজারে প্রবেশ করে। ক্রমশ তা প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগীদের হটিয়ে বাজারের উচ্চস্তরও দখল করে নেয়। বিকাশশীল অর্থনীতির কোনও উদ্ভাবন পরবর্তীকালে আরও উন্নত করে উন্নত দেশগুলির বাজারে পৌঁছে দেওয়ার পরিচিত ছকে যে এই ধারণা পড়ে না, ভারত ও চীনের অভিজ্ঞতা থেকে তা স্পষ্ট। এগুলি আসলে সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারে অসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত পথে পরিবেশ বান্ধব সর্বাত্মক উদ্ভাবন। বেজিং ও শাংহাইতে বর্তমানে ৫ কোটি ব্যাটারিচালিত মোটরবাইক চলে, বিশ্ব বাজারে যার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ভারতের দুটি ওষুধ সংস্থার গবেষণার জেরে হেপাটাইটিস বি-র প্রতিষেধকের দাম ইঞ্জেকশন পিছু ১৫ ডলার থেকে ০.১০ ডলারে নামিয়ে আনতে হয়েছে। বিশ্বে সব থেকে কম ব্যয়ে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করে বেঙ্গালুরুর নারায়ণা হৃদয়ালয়া হাসপাতাল আজ হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের মার্কেট মডেলের স্বীকৃতি পেয়েছে। এমন আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে, বিশ্বায়িত পৃথিবীতে উদ্ভাবন এখন সারা দুনিয়ায়, বিশেষত এশিয়ায় ছড়িয়ে থাকা "নলেজ হাব" ও উদ্ভাবন কেন্দ্রগুলির তীব্র প্রতিযোগিতার সামনে কোনও পণ্যের বিকল্প বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে এশিয়ার দক্ষতা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। ওষুধক্ষেত্রে জৈব সমতুল নির্মাণ বা অ্যাপল আই-প্যাড ও আই-ফোনের মোকাবিলায় স্যামসাঙের গ্যালাক্সি রেঞ্জের ট্যাবলেট ও মোবাইল ফোন বাজারে আনা, এই দক্ষতার জ্বলন্ত নিদর্শন। ২০২০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ভারত ও চীনেই মধ্যবিত্ত ভোগকারীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় একশো কোটিতে। সে জন্যই উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানে কাজ করে, এমন প্রতিটি বহুজাতিক ও বৃহৎ সংস্থাই আজ এশিয়াতে তাদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত করেছে।

উদ্ভাবনের বিশ্বায়নের ধারণা জ্ঞানভিত্তিক পণ্যশ্রেণিকে অতিক্রম করে যায়। বিকাশশীল অর্থনীতিগুলি এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচিগুলির অংশীদার হচ্ছে। ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও রাশিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের নানা বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী কর্মসূচির শরিক। এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারন্যাশনল থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্ট রিয়্যাক্টার (ITER), গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের ইউরোপীয় সংস্করণ গ্যালিলেও, ফ্যাসিলিটি ফর অ্যান্টি-প্রোটন অ্যাণ্ড আইয়ন রির্সাচ (FAIR), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT), ন্যানো প্রযুক্তি প্রভৃতি। কয়েক বছর আগে এই প্রথম, হিউমান জেনোম অর্গানাইজেনশ (HUGO) এবং এর প্রেসিডেন্টের সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ভারত ও চীন, আমেরিকার বিভিন্ন বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচিতেও অংশীদার। বিজ্ঞাননির্ভর বৃহৎ উদ্ভাবনই হোক বা বাজারচালিত প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন—উদ্ভাবনের বিশ্বায়ন দেশগুলির যাবতীয় বেড়াজাল ভেঙে দিয়েছে। উদ্ভাবন ক্রমশই হয়ে উঠছে আদানপ্রদান পারস্পরিক নির্ভরশীল এক পদ্ধতি। উদ্ভাবনের বিশ্বায়ন আমাদের নিয়ে চলেছে জ্ঞানের সহ-প্রযোজনা এবং সহ-উদ্ভাবনের দিকে।❑

[লেখক নয়া দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান নীতি অধ্যায়ন কেন্দ্রে অধ্যাপক।

email: vkrishna16@hotmail.com]

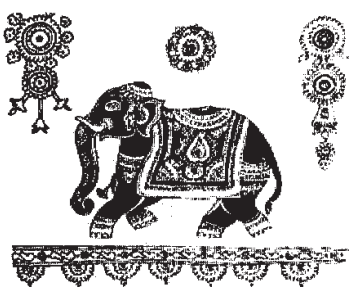

...আবার দুর্দান্ত রেজাল্ট

আকাশ ছোঁয়া সাফল্যের অংশীদার হতে পারো তোমরাও!

২০০৯, ২০১০, ২০১১-এর পর ডব্লুবিসিএস-২০১২। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর আবার চমকপ্রদ রেজাল্ট। পরপর চার বছর সংবাদের শিরোনামে এই প্রতিষ্ঠান। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের নিরিখে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখন এক নম্বর। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আজ যে উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে তার ধারেকাছে নেই আর কোনও কোচিং সেন্টার। এখান থেকে এবার 'এ' গ্রুপে সফল ৩৮ জন, 'বি'-গ্রুপে ৫ জন অর্থাৎ মোট ৪৩ জন চূড়ান্ত সফল। ডব্লুবিসিএস গ্রুপ 'এ' ও 'বি'-এর চূড়ান্ত তালিকার ২৭% বা এক চতুর্থাংশের বেশি হল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের। আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ পিছু সাফল্যের হার যখন একজনেরও কম তখন এখানকার একটি ব্রাঞ্চের সাফল্যের সংখ্যা ৪৩। সত্যিই অকল্পনীয় পারফরমেন্স।

সূচনার জন্মলগ্ন থেকেই একের পর এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। বিগত তিন বছরে সাফল্যের হার স্টেডিলি বৃদ্ধি পেয়েছে। ডব্লুবিসিএস-এর জগতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আজ এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাম। এখানকার দুর্দান্ত সাফল্যের পিছনে রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের ফোকাস, ডব্লুবিসিএস অফিসারদের স্ট্র্যাটেজি, ফ্যাকাল্টি এবং সাপোর্ট স্টাফদের নিরলস পরিশ্রম। উৎকৃষ্ট এবং সুসংহত মকটেস্টগুলিও সাফল্যের পথে ধনাত্মক অনুঘটকের কাজ করেছে। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠান যারা শুধুমাত্র ডব্লুবিসিএস-এর গাইডেন্স দেয়। তাই এই সংস্থা হল প্রকৃত অর্থে একমাত্র ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান। বর্তমান যুগ হল স্পেশালাইজেশনের যুগ। একজন হার্টের রোগী যেমন চিকিৎসার জন্য জেনারেল ফিজিসিয়ানের কাছে না গিয়ে কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান, একজন ডব্লুবিসিএস অ্যাসপিরান্টেরও ঠিক তেমনই 'Jack of all trades'-এর কাছে না গিয়ে 'Master of WBCS'-এর কাছেই যাওয়া উচিত। দক্ষতায়, সামর্থ্যে, স্ট্র্যাটেজিতে এবং সাফল্যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন অবিসংবাদিতভাবে এক নম্বর আসনটি আজ দখল করেছে। তাই যাদের প্রাথমিক বা চূড়ান্ত লক্ষ্য ডব্লুবিসিএস, তাদের এখন নিতে হবে জীবনের প্রথম সঠিক সিদ্ধান্তটি। কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হওয়া, নাকি নিজের যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করা—একজন 'would be' ডব্লুবিসিএস অফিসারের কাছে কোনটি প্রাধান্য পাওয়া উচিত? এই আপাত নিরীহ অথচ কঠিন সিদ্ধান্তের উপরই ডব্লুবিসিএস-এ সাফল্য-ব্যর্থতা বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে। কথায় আছে পরিকল্পনা যদি সঠিক হয় তবে অর্ধেক যুদ্ধ জয়লাভ করা হয়ে যায়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘ পরিশ্রম, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং ডব্লুবিসিএস-এর প্রতি নাছোড় মনোভাবের কারণে ডব্লুবিসিএস-এর সাফল্যের ক্ষেত্রে 'Art of Mastery' অর্জন করেছে। পরীক্ষার্থীদের এখন নিতে হবে সঠিক এবং ম্যাচিওরড সিদ্ধান্তটি। লক্ষ্য যদি হয় ডব্লুবিসিএস তবে নিঃসন্দেহে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল Hobson's Choice।

WBCS-2012 : C, D INTERVIEW

আপনি কি জানেন??

ডব্লুবিসিএস-২০১২ গ্রুপ-'এ' এবং 'বি' ইন্টারভিউয়ে—

● কোন ধরনের কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে? ● কথোপকথনের মাধ্যম কি ছিল—বাংলা না ইংরাজি? ● বায়োডাটা থেকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল? ● গ্র্যাজুয়েশন বা অপশনাল থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কিনা? ● বোর্ড ফ্রেন্ডলি ছিল, নাকি ট্রেসফুল? ● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে? ● হবি থেকে কি কোনও প্রশ্ন করা হয়েছিল? ● কাজের অভিজ্ঞতা/প্রকৃতি/পরিধি থেকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে? ● বোর্ড প্রার্থীর কাছ থেকে কি ধরনের উত্তর / অ্যাটিটিউট আশা করেছে? **—এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব শুনুন এবার যার গ্রুপ 'এ' এবং 'বি'-তে ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের মুখ থেকেই।**

ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে জেনে যেতে হবে—

● বিগত ২-৩ বছরের ইন্টারভিউয়ে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছিল। ● আপনি কিভাবে ইংরাজিতে কথা বলার দুর্বলতাকে ঢাকবেন? ● আপনি কিভাবে নিজের স্ট্রেংথকে প্রকাশ করবেন বা কিভাবে দুর্বলতার জায়গাগুলিকে লুকোবেন ● ইন্টারভিউয়ে আপনার সঠিক অ্যাপ্রোচ এবং অ্যাটিটিউড কেমন হবে। ● কোন ধরনের পোশাক আপনি পরবেন। ● ট্রেস ইন্ডারভিউ আপনি কিভাবে সামলাবেন। ● রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়গুলিকে কিভাবে সামলাবেন। ● আপনার পছন্দের পদগুলিকে কিভাবে সাজাবেন। ● আপনার প্রথম পছন্দের পদটি থেকে প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবেন। ● কিভাবে তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। ● ইন্টারভিউয়ের সময় বডি মুভমেন্ট এবং পসচার কেমন হবে। ● দীর্ঘ ট্রেন বা বাস যাত্রার পরেও কিভাবে নিজেকে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখবেন। ● কিভাবে বোর্ড সদস্যদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন। ● চা বা কফি অফার করলে আপনি কি করবেন। ● কিভাবে এবং কতটা ধৈর্য সহকারে প্রশ্নগুলি শুনবেন। ● আপনার উত্তরের অ্যাপ্রোচ এবং টোন কেমন হবে। ● ইন্টারভিউয়ের আগে এবং চলাকালীন কিভাবে টেনশন নিয়ন্ত্রণ করবেন। ● আপনার বায়োডাটা থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে বা তার উত্তরই বা কি হবে। ● গ্র্যাজুয়েশন বা মাস্টার ডিগ্রির পর অলস বছরগুলির হিসাব কিভাবে মেলাবেন।

ডব্লুবিসিএস গ্রুপ-'সি' এবং 'ডি' ইন্টারভিউয়ের ১৫-২০ মিনিট আপনার জীবন দর্শনটাকেই বদলে দিতে পারে। সুতরাং এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবেন না, বরং সদ্ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন এরকম সুযোগ জীবনে বার বার আসবে না।

Academic Association
The Self Culture Institute, 53/6, College Street (College Square), Kolkata-700073
9830770440
9674478644
Website: www.academicassociation.in ▪ Centre: Uluberia-9051392240 • Birati-9674555451 • Darjeeling-9832041123

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উদ্ভাবনী অভিমুখ

আমাদের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব ও অবদান ক্রমশই বাড়ছে। অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের মতোই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও আসছে পরিবর্তন। সে পরিবর্তন কখনও উৎপাদন কখনও বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত। এর ফলে নানা ক্ষেত্রের উৎপাদনে উৎকর্ষ বাড়ছে আর সেই সঙ্গে বাড়ছে উৎপাদনের দ্রুততা। আর স্বভাবতই আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে ভারতবর্ষের স্থান আজ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে, কীভাবে আনা হচ্ছে এই উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া? এর সমস্যা ও সম্ভাবনাই বা কী, জানাচ্ছেন **ড. নমিতা শর্মা।**

ভূমিকা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি হল নতুন উদ্ভাবন এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলির মূল উৎস। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাই করে না, তার সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদনেরও উন্নতি ঘটায়। বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ শ্রম এবং মূলধনের মতো প্রচলিত উপাদানকে পিছনে ফেলে জ্ঞান ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। বিশ্বায়িত বাজারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে উদ্ভাবনী প্রজ্ঞা কাজে লাগানো প্রয়োজন। ভারতে গড় বাণিজ্যিক লেনদেনের ৪৫ শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ৪০ শতাংশের জোগান আসে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি থেকে। যদিও এসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, উৎপাদিত সামগ্রীর বৈচিত্র, বিপণন, যোগাযোগ, গুণমানের সুনাম এবং দরাদরি করার ক্ষমতার নিরিখে বৃহৎ উদ্যোগগুলির থেকে অনেকটা পিছিয়ে। পাশাপাশি এটাও দেখা যায় যে, বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ আয়তনে বেড়ে প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নিচ্ছে। এই সব প্রতিষ্ঠান সাধারণত অনুকূল পরিবেশে গড়ে ওঠে। উৎপাদিত সামগ্রীর গুণমানও উন্নত। আর এই কর্মকাণ্ডে তারা নানা রকম উদ্ভাবনকে কাজে লাগায়, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেয় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে। গবেষণা ও পরিচালন পদ্ধতিতে নতুন উদ্ভাবন এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রবণতাকেই 'একুশ শতকের শিল্পধর্ম' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আর এই শিল্পধর্ম থেকেই জন্ম নিচ্ছে অর্থনৈতিক পরিবর্তন, পুনর্গঠন প্রতিযোগিতা এবং অনিশ্চিত ও অশান্ত বাণিজ্য জগতের শঙ্কা থেকে সাময়িক স্বস্তির বিশ্বাস জন্ম নিচ্ছে। কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি উদ্ভাবনে দক্ষ হয় তবে সেটি নতুন এবং স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি নতুন উদ্ভাবনির মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অন্যান্যদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। 'উদ্ভাবন' সংক্রান্ত প্রত্যেকটি সংজ্ঞা পৃথক এবং স্বতন্ত্র উদ্ভাবনী কর্মপ্রণালীর নির্দেশক। উদ্ভাবন শুরু হয় কোনও এক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তার পরে চলে তার উন্নতিবিধান এবং একটা নতুন পণ্য, পদ্ধতি বা পরিষেবা বাজারে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। নতুন ও উন্নত পণ্য কিংবা প্রক্রিয়া বাণিজ্যিকীকরণও ঘটে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

এখানে 'নতুন', 'গুরুত্বপূর্ণ' এবং 'উন্নত' শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে যা 'নতুন', অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে তা নাও হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে যা 'উদ্ভাবনী আচরণ' হিসেবে চিহ্নিত, অন্য প্রতিষ্ঠানে তেমনটি না হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, কোনও কর্মকাণ্ডকে নতুন উদ্ভাবন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে সেটিতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উৎকর্ষ থাকতে হবে। বিভিন্ন লেখক উদ্ভাবনের এই ভিন্নতাকে বিভিন্ন মাপকাঠিতে চিহ্নিত করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও কর্মপদ্ধতি তুলে ধরে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। উদ্ভাবন দু' প্রকারের : 'উৎপাদিত' সামগ্রী উদ্ভাবন এবং পদ্ধতি উদ্ভাবন। কোনও পণ্যের উৎকর্ষসাধন ও তার বাণিজ্যিকীকরণই হল উৎপাদন উদ্ভাবন। অন্যদিকে, নতুন বা উন্নত উৎপাদন বা সরবরাহ পন্থা অবলম্বন করাই হল 'পদ্ধতি' উদ্ভাবন। এই উদ্ভাবনে যন্ত্রপাতি, মানবসম্পদ, কর্মপ্রণালী ইত্যাদির পরিবর্তন বা যোগাযোগ ঘটতে পারে। উদ্ভাবনকে বৃদ্ধিসহায়ক বা আমূল পরিবর্তন হিসেবেও বর্ণনা করা যায়। বৃদ্ধিসহায়ক উদ্ভাবনের ফলে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে চলে। কিন্তু আমূল পরিবর্তন এমন এক বড় উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া যার ফলে গোটা শিল্পটাই বদলে যেতে পারে। উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা, অনুকরণ, সৃষ্টিমূলক অনুসরণ এবং উদ্ভাবন। সাধারণ বিকাশশীল দেশগুলিতে অনুকরণ, সৃষ্টিমূলক অনুসরণ এবং উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ঘটে। ভারতে নতুন এবং উন্নত পণ্য উৎপাদন এবং তার সঙ্গে উৎকৃষ্টতর জিনিস এবং পরিষেবা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন প্রযুক্তি অবলম্বন করাকেই উদ্ভাবনের সংজ্ঞা ধরা যেতে পারে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, উদ্ভাবন এবং গবেষণা বিষয়াবলি

দেখা গেছে যে, শিল্পক্ষেত্র নির্বিশেষে ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহকে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। যথা, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে উচ্চ অবদান, উল্লেখযোগ্য রপ্তানিজাত উপার্জন, বিনিয়োগের স্বল্প প্রয়োজনীয়তা, কর্মপ্রণালীর নমনীয়তা, অবস্থান অনুযায়ী স্থানান্তরের সুবিধা, যথাযথ অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানির বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে অনেক রকম সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন স্বল্প মূলধন, সমস্ত কর্মকাণ্ড একজন বা দুজন মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা, আন্তর্জাতিক পরিবেশে সুযোগ লাভের অপ্রতুলতা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) যুগের অভিঘাতের মোকাবিলা করার অক্ষমতা, গবেষণা এবং উন্নয়নে অবদানের স্বল্পতা, পেশাদারিত্বের অভাব ইত্যাদি। এসব প্রতিকূলতার মধ্যেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির টিকে থাকা এবং বেড়ে ওঠার লড়াই। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির নির্বাচিত ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। যদি নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয় তবে তার সঙ্গে আত্মীকরণে সহায়ক শর্তগুলিও চিহ্নিত করা দরকার। উদার এবং বিশ্বায়িত বাণিজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে বড় উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শামিল হতে হয়। তাই বড় উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির পক্ষে সহায়ক উদ্ভাবনীর অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রয়োজন। চারটি শিল্পক্ষেত্রে এই চর্চা করা হয়েছে। যথা, গাড়ির যন্ত্রাংশ, ওষুধ, তথ্য-প্রযুক্তি এবং বস্ত্র (পোশাক প্রস্তুতি)।

ভারতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির অবস্থান এবং কর্মদক্ষতা

ভারতে ক্ষুদ্র মাপের শিল্প (SSI) বলতে সেই শিল্পকেই বোঝায়, যেখানে কারখানা ও যন্ত্রপাতিখাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার মধ্যে। তা সে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা লিজ বা হায়ার পারচেজ—যাই হোক না কেন। অণু উদ্যোগগুলিকে সাধারণত 'অতিক্ষুদ্র' উদ্যোগ বলা হয়। এই অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগে কারখানা এবং যন্ত্রপাতিখাতে মোট বিনিয়োগ ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। যেসব উদ্যোগে কারখানা এবং যন্ত্রপাতিখাতে মোট বিনিয়োগ ১০ কোটি টাকার মধ্যে, সেই সব উদ্যোগ মালিকানাধীন, অথবা ভাড়া নেওয়া—যাই হোক না কেন, এগুলিকে মাঝারি উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভারতে অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অবদান ৮ শতাংশ। হিসেব করে দেখা গেছে, মূল্যের ভিত্তিতে এই উদ্যোগগুলি প্রস্তুতি শিল্পে ৪৫ শতাংশ এবং দেশের মোট রপ্তানির ৪০ শতাংশের জোগান দেয়। হিসেবে আরও দেখা গেছে, সারা দেশে মোট ২৬০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ৫৯০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, এই উদ্যোগগুলি দেশের অন্যান্য শিল্পোদ্যোগগুলির তুলনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বেশি বৃদ্ধির হার বজায় রেখেছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান বজায় রেখেছে। ভারতে প্রধান প্রধান শিল্পের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষিসহায়ক, রাসায়নিক, ওষুধপত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেক্ট্রনিক/ ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প, চর্ম ও চর্মজাত সামগ্রী প্রস্তুতি শিল্প, মাংসজাত সামগ্রী, জৈব-কারিগরি, খেলার সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী এবং কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার।

ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি হল সবচেয়ে গতিশীল শিল্পক্ষেত্র যা সাম্প্রতিক সময়ে নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেশি। ন্যাশকম-এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে বিপুল সংখ্যক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দশ কোটি টাকার কম লেনদেনসম্পন্ন প্রায় ৮৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলিকে মাঝারি মাপের শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে সিংহভাগই স্বনিযুক্ত ব্যক্তিমালিক পরিচালনাধীন ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগ। যদিও বাজারের অংশীদারিত্বের নিরিখে এই শিল্পের অবস্থানটি রীতিমতো তির্যক। রাজস্বের ৩২ শতাংশ ৫টি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের দখলে। এর পরেই রয়েছে ১০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকার লেনদেনসম্পন্ন ৪৭টি প্রতিষ্ঠান যাদের অংশীদারিত্ব ৩৫ শতাংশ। ১০০ কোটি টাকার কম বার্ষিক লেনদেনসম্পন্ন (মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ৯৮ শতাংশ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব মাত্র ১১ শতাংশ (ন্যাসকম, ২০০৩)। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপ্তি (সাইজ) আগের বছরগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিককালের তুলনায় দেখা যায় যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই সব ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগের বৃদ্ধি ঘটেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে (ন্যাসকম, ২০০৩)। ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে প্রচুর ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আরেক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, এই ক্ষেত্রে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র। McKinsey-এর প্রতিবেদন Indian Pharma 2015 (Unlocking the potential of Indian pharma market) অনুযায়ী ভারতীয় ঔষধ শিল্পে বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুতলয়ে। ২০০২ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বার্ষিক বৃদ্ধির হার (CAGR) ছিল ১৩ শতাংশ। আশা করা হয়েছে, ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে এই হার ১৬ শতাংশের উপরে থাকবে। এই শিল্প এখন তাই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের ঔষধ শিল্পকে সারা বিশ্বে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষত প্রাথমিক গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ক্লিনিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে। বিশ্ব ঔষধ শিল্পে ভারতের এই যে উচ্চাসন, তার কৃতিত্ব অংশত এ দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এবং পেটেন্টেড ড্রাগ মলিক্যুল-এর প্রতি কারিগরি দক্ষতা দাবি করতে পারে। এ দেশের গাড়ির যন্ত্রাংশ প্রস্তুতি শিল্প বর্তমানে বিশ্ব স্বয়ংক্রিয় যান নির্মাণ সংস্থাগুলির পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতার দ্বারা চালিত। এছাড়া পরিবর্তনীয় আইন-

কানুন এবং উদারীকরণের ফলে বিশ্ব স্বয়ংক্রিয় যান নির্মাণ শিল্প অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া তা এখন শাখা-প্রশাখায় বহুধাবিভক্ত। দাম এবং মানের নিরিখে ভারতের গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্প বিশ্ব প্রতিযোগিতায় কতিপয় শিল্পক্ষেত্রের এমন একটি ক্ষেত্র যা যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। ভারতের উৎপাদন পদ্ধতিগত কারিগরি দক্ষতাকে যন্ত্রাংশ নির্মাণের উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট কমিয়ে এনেছে। ভারতে গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্প ক্রমবর্ধমান, কিন্তু খুব বেশি অসংহত। অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন (জিডিপি)-এ বস্ত্র শিল্পের অবদান ৮ শতাংশ। শিল্পোৎপাদনের ২০ শতাংশ এবং রপ্তানি বাণিজ্যজাত উপার্জনের ৩০ শতাংশ হলেও এই শিল্পে আমদানির হার ২-৩ শতাংশ। প্রায় ৩৮০ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কৃষির পরে বস্ত্রশিল্পই হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারী শিল্পক্ষেত্র।

পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং পর্যালোচনা

দিল্লিতে করা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিতে উদ্ভাবনী অনুশীলন অনুসরণ করার বিষয়ে নির্বাচিত কিছু শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর এটা নির্ভর করে। যেমন, উৎপাদিত সামগ্রী ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, চাহিদা ও জোগানের ধরন, ব্যবহৃত কাঁচামালের প্রকার, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং বাজারের শক্তি। এই অনুশীলন খরিদ্দারের প্রয়োজন এবং তাদের সামর্থ্য দ্বারা চালিত হয়। এছাড়া, এ ধরনের অনুশীলন অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরেক ধরনের উদ্ভাবনকে জন্ম দিতে পারে। এধরনের পারস্পরিক সমন্বয় ও সংহতি শিল্পোদ্যোগগুলিকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলে এবং গ্রাহকরা তা থেকে লাভবান হন। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি প্রথাগত প্রয়োগ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ (CADM) ব্যবহার করে। এটা এমন এক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথাগত প্রয়োগ নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলি সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, পরিকাঠামো, পরিচালন পরিষেবা, তথ্য-প্রযুক্তি, পরামর্শ, প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা (অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট) এবং স্মার্ট কার্ডে স্মার্ট চিপ স্থাপন করে তার দ্বারা গ্রাহক/কর্মী শনাক্তকরণও করে থাকে। এই কার্ডগুলি RFID-সক্ষম এবং গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যা স্বাক্ষর (digital signage), ভ্রাম্যমাণ বিপণন (Point of Sale-POS) এবং কেন্দ্র স্মার্ট তথ্য ভাণ্ডার ব্যবহার প্রণালীও গ্রহণ করে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পরিষেবা প্রদানকারীদের সুবিধার্থে তাদের তথ্য-প্রযুক্তি পরিমণ্ডল স্বল্প ব্যয় নির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কাস্টমার কেয়ার পোর্টাল (CCP) ব্যবহার করে। গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ সংস্থা এবং বস্ত্র (পোশাক প্রস্তুতি) শিল্পের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি CAD/CAM-এর মতো উদ্ভাবনী অনুশীলনকে কাজে লাগায়। উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কম্পিউটার এডেড ডিজাইনিং (CAD) এবং কম্পিউটার এডেড ম্যানুফ্যাকচারিং (CAM)-কে সুসংহতভাবে ব্যবহার করা হয়। অটোমেটেড সুপারভাইসরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন (SCADA) ব্যবস্থার ব্যবহারও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থায় সরবরাহকারী এবং গ্রাহককে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। পোশাক প্রস্তুতি শিল্পে ব্যবহার্য প্রমাণ সেলাই মেশিনের জটিল কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের জন্যে বেশকিছু নিয়ন্ত্রক ইউনিট সংযুক্ত করা হয়। যেমন, কুঁচকে না যায় এমন কাপড়ের ব্যবহার, অন্যান্য বিশেষ ধরনের কাপড়ের ব্যবহার, কম ঘনত্বের কাপড়ের ব্যবহার, বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রকের ব্যবহার ইত্যাদি। পাশাপাশি ওষুধ শিল্পে এই ব্যবস্থা নভেল ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম (NDDS) এবং ক্লিনিক্যাল গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এড্স-এর ভাইরাস নিয়েও গবেষণা করেছে। বাজারে সফলভাবে লাইপোসোমাল ওষুধ আনার জন্য যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তার উন্নতি ও বাণিজ্যিকীকরণে নিয়োজিত এই সব উদ্যোগ। সর্বোত্তম গুণমানের নিশ্চিত করতে এরা LIPOSOME প্রযুক্তিও ব্যবহার করে। এসব উদ্ভাবনের লক্ষ্য হল জীবনদায়ী ওষুধ সকলের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসা। এমন কিছু কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ আছে যেগুলি ক্লিনিক্যাল গবেষণায় নিয়োজিত। এর বাইরে গুণমান নিশ্চিত করতে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান Six-Sigma পদ্ধতিরও প্রয়োগ করে থাকে।

নমুনা শিল্পক্ষেত্রে উদ্ভাবনের তুলনামূলক বিচার

কয়েকটি বাছাই করা শিল্পক্ষেত্রে উদ্ভাবনী আচরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির উদ্ভাবনী আচরণে বিস্তর ফারাক। এই সব পার্থক্যের জন্য মূলত উৎপাদিত সামগ্রীর প্রকৃতি, পণ্যের জীবনচক্র, প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক অবস্থান, শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধি, চাহিদা ও সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়াবলি দায়ী। এসব প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক উন্মেষপর্বে আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং ব্যবহারিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেও তাদের নিজস্ব শক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সব রকম বাধা অতিক্রম করে। এক নির্দিষ্ট সময় নিয়ে এগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির উদ্ভাবন ও পরিচালনের তুলনামূলক পর্যালোচনা সারণি-১-এ তুলে ধরা হল।

বিভিন্ন নির্বাচিত শিল্পক্ষেত্রগুলিতেও উদ্ভাবনের রকমফের রয়েছে। এটা নির্ভর করে শিল্পক্ষেত্রের প্রকৃতি, অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন মরশুমি চাহিদার ধরন এবং উদ্ভাবন ব্যয়ের উপর। যেমন, গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি বিভিন্ন স্তরে কাজ করে এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরবরাহ করে। তাই তারা বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর দেওয়া নকশা ও বিবরণ অনুযায়ী জিনিস তৈরি করে। তথ্য-প্রযুক্তি উদ্যোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রগুলির সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে উদ্ভাবনের সম্ভাবনা প্রশস্ত। যেমন, গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ, ওষুধ শিল্প কিংবা পোশাক প্রস্তুতি শিল্পে প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার আলাদা আলাদা এবং সেগুলির ব্যবহারও পৃথক। ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী উদ্ভাবনের সম্ভাবনা কম। কারণ তার জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও

সারণি-১
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের শিল্পক্ষেত্র-নির্ভর উদ্ভাবনের তুলনামূলক সমীক্ষা

মাপকাঠি	I	II	III	IV	V	VI
শিল্প	তথ্য-প্রযুক্তি	তথ্য-প্রযুক্তি	তথ্য-প্রযুক্তি	ফার্মাসিউটিক্যাল	ফার্মাসিউটিক্যাল	ফার্মাসিউটিক্যাল
আয়তন	মাঝারি	মাঝারি	মাঝারি	মাঝারি	মাঝারি	মাঝারি
উদ্ভাবনের প্রকার বা ধরন	উৎপাদন/পদ্ধতি (অফশোর প্রোগ্রামিং এবং তথ্য-প্রযুক্তি পরামর্শ; যথা, ASP.NET, VB.NET, C#.NET, VB6.0, SQL Server প্রভৃতি)	উৎপাদন/পদ্ধতি (কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি ডেস্কটপ্, নোটবুক্ TFT-LCD মনিটর GSM মোবাইল ফোন, DVD প্লেয়ার)	উৎপাদন/পদ্ধতি (এন্ড-টু-এন্ড বিলিং এবং যোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য বিষয়বস্তু পরিচালন আর্থিক পরিষেবা, মিডিয়া)	উৎপাদন (HIV/AIDs-এর জন্যে বিস্ময় ওষুধ 'জ্যোতি অমৃতম' ডি.এস./এটি একটি সরল ভেষজ, যার কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং রোগের যে কোনও পর্যায়ে ক্রয়সাধ্য)	উৎপাদন/পদ্ধতি (Lipsomal drug প্রস্তুতি। এটি শ্রেষ্ঠ অ্যান্টি ফাঙ্গাল খাওয়ার ওষুধ যা ফাঙ্গাস সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।)	পদ্ধতি (সকল প্রকার কাঁচামাল পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা হয়। সকল সামগ্রী CGMP গাইড লাইন মেনে প্রস্তুত করা হয়)
প্রতিবন্ধক	আর্থিক/কারিগরি/ বিপণন/ভাড়া নেওয়া/ গ্রাহকের আস্থা অর্জন	অভ্যন্তরীণ/কারিগরি/ গ্রাহকের আস্থা অর্জন	বিপণন/গ্রাহকের আস্থা অর্জন	ওষুধ পরীক্ষা, বিপণন নতুন ওষুধ প্রস্তুতিতে দীর্ঘ সময়, গ্রাহকের আস্থা অর্জন	বিপণন/গবেষণা ও উন্নয়নে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ	বিপণন/গ্রাহকের আস্থা অর্জন
উদ্ভাবন পরি-চালনা	ব্যয় হ্রাস/যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ/ কারিগরি প্রশিক্ষণ	ব্যয় হ্রাস/যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ/ কারিগরি প্রশিক্ষণ	যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ/প্রশিক্ষণ/ গবেষণা ও উন্নয়ন/ যোগসূত্র স্থাপন	ব্যয় হ্রাস/যোগসূত্র স্থাপন/সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ (DST)	পরিকাঠামোতে জোর দেওয়া/পরিচিতমহল থেকে কারিগরি সহায়তা	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন

উন্নয়নে খরচ এবং সময়—দুটোই অনেক বেশি লাগে।

তাই বেশিরভাগ শিল্পোদ্যোগগুলি পদ্ধতি সংক্রান্ত এবং বৃদ্ধি-সহায়ক উদ্ভাবনের ব্যাপারে আগ্রহী। বস্ত্র বা পোশাক প্রস্তুতি শিল্পে উদ্ভাবনের সুযোগ কম। কারণ, এই শিল্পক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি চাহিদার তারতম্য ঘটে, কিছু কিছু জিনিসের মরশুম অনুযায়ী চাহিদা তৈরি হয় এবং সর্বোপরি বস্ত্র বয়নের বৈচিত্রও খুব বেশি নয়।

উপসংহার

গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্প, বস্ত্রশিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে নতুন উদ্ভাবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যাচ্ছে। এটাও স্বীকার করতেই হয় যে, নতুন উদ্ভাবনের জন্য অনেকটা সময়ও দরকার হয়, যার খরচ জোগানোটা সাধারণত দস্তুর। গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্পে যেহেতু বড় সংস্থাগুলির দেওয়া নকশা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে হয়, তাই এক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বিষয়ে উদ্ভাবনের সুযোগ খুব কম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির এসব

সারণি-২
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে নতুন উদ্ভাবনের সম্ভাবনা

ক্রমিক সংখ্যা	শিল্পক্ষেত্র	উদ্ভাবনের সম্ভাবনা
১.	গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ	যেহেতু ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি নানা স্তরের মধ্যে কাজ করে এবং মূলত বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ তথা OEM-গুলোকে সরবরাহ করে, তাই এক্ষেত্রে উদ্ভাবনের সম্ভাবনা শুধুমাত্র উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরা বড় সংস্থাগুলো থেকে নকশা নিয়ে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী যন্ত্রাংশ নির্মাণ করে। কিন্তু এখানে পদ্ধতি সংক্রান্ত উদ্ভাবনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ এই সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি চূড়ান্ত উৎপাদনের গুণমানের উপর জোর দিয়ে থাকে।
২.	তথ্য-প্রযুক্তি	এক্ষেত্রে উদ্ভাবনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই প্রযুক্তি অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এমনকী ছোট বৃদ্ধিসহায়ক উদ্ভাবনও আর্থিক ও অন্যান্যভাবে খুব লাভজনক হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কোনও প্রতিষ্ঠান সফ্টওয়্যারে একটা নতুন বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা যোগ করতে সক্ষম হয় তবে তারা গ্রাহকদের কাছ থেকে অনেক টাকা দাবি করতে পারে।
৩.	ফার্মাসিউটিক্যাল	এক্ষেত্রে উৎপাদিত সামগ্রীতেই শুধুমাত্র উদ্ভাবনের সীমিত সম্ভাবনা। কারণ উদ্ভাবনের জন্য বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং তার থেকে সীমিত ফলাফল পাওয়া যায়। একটা নতুন ওষুধ উদ্ভাবনে অনেক সময় লাগে। কিন্তু পদ্ধতি সংক্রান্ত উদ্ভাবন এবং ক্লিনিক্যাল গবেষণা ও নতুন ড্রাগ সরবরাহ ব্যবস্থায় বৃদ্ধিসহায়ক উদ্ভাবনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
৪.	বস্ত্র (পোশাক প্রস্তুতি)	বিভিন্ন উপ-শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিত সামগ্রী উদ্ভাবনের সম্ভাবনায় তারতম্য রয়েছে। এটা কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে সীমিত হলেও কাপড় বা বস্ত্রের নকশা উদ্ভাবনে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু চাহিদার ধরন এক্ষেত্রে খুব দ্রুত বদলে যায়, তাই উৎপাদিত সামগ্রীর উদ্ভাবনের সুযোগ কম। এছাড়া, পোশাকের শ্রেণিগত বৈচিত্র কম, তাই উৎপাদন উদ্ভাবনও সীমিত।

ক্ষেত্রে তাই পদ্ধতি-সংক্রান্ত উদ্ভাবনের বিষয়ে চেষ্টা করে। বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ থেকে নেওয়া সুনির্দিষ্ট নকশা ও মাপ অনুযায়ী বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নির্মাণ করে যেহেতু সেগুলি আবার ওই সব সংস্থাতেই সরবরাহ করে, তাই তারা পদ্ধতিসংক্রান্ত উদ্ভাবিত নতুন পন্থা অবলম্বন করে পণ্যের গুণমান বজায় রাখার পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। বস্ত্রশিল্পে (পোশাক প্রস্তুতি) যেহেতু চাহিদার ধরন প্রতিনিয়ত বদলে যায় এবং মানুষের বোনা কাপড়ের বৈচিত্রও অপেক্ষাকৃত কম, তাই এক্ষেত্রে উৎপাদনে উদ্ভাবনের চাইতে উদ্ভাবন পদ্ধতির প্রতি ঝোঁক বেশি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি কারিগরি ও আর্থিক তথ্য, বাজারের সাম্প্রতিক হালচাল এবং নতুন গবেষণা-সংক্রান্ত খোঁজখবর রাখে। কিন্তু শিল্পক্ষেত্র অনুযায়ী এসব তথ্য বা গবেষণালব্ধ ফলাফল কাজে লাগাবার ব্যাপারে বিভিন্নতা দেখা যায়। উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র থেকে মাঝারিতে উন্নীত হয়েছে। গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ কিংবা বস্ত্র (পোশাক প্রস্তুতি) শিল্পের মতো শ্রম-নিবিড় শিল্পক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তি (IT) এবং ওষুধ শিল্পের মতো প্রজ্ঞা-নিবিড় ক্ষেত্রে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আরও লক্ষ করা যায় যে, যন্ত্রাংশ নির্মাণ বা বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্থাগুলি নতুন উদ্ভাবনের বিষয়ে আগ্রহী। কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তি বা ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি অবলম্বন করার আগ্রহ বেশি। ফলত দেখা যায় যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পণ্য উদ্ভাবনের চাইতে পদ্ধতি-সংক্রান্ত উদ্ভাবনে বেশি উৎসাহী। শুধুমাত্র তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি পদ্ধতিসংক্রান্ত এবং উৎপাদিত সামগ্রী—উভয় বিষয়েই নতুন উদ্ভাবনে নিয়োজিত।

তাৎপর্য এবং সুপারিশ

এই চর্চা থেকে জানা গেল যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবন গ্রহণ করে। যদিও বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে গৃহীত উদ্ভাবনগুলি ভিন্নতর। উপর্যুক্ত ফলাফল বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি দেওয়া হল।

১। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরি। বিভিন্ন উদ্ভাবনী শিল্প সংস্থাকে আর্থিক বা অন্যভাবে পুরস্কৃত করে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে যেসব প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনী নয়, সেগুলিকেও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।

২। পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া দরকার। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি এর ফলে প্রগতিশীল শিল্প পরিমণ্ডল লাভ করবে।

৩। আস্থা ও প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে প্রগতিশীল শিল্প পরিমণ্ডল গড়ে তোলা দরকার।

৪। উদ্ভাবনী এবং অ-উদ্ভাবনী ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির যাবতীয় তথ্য-ভাণ্ডার সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

৫। এই তথ্যভাণ্ডার শিল্পক্ষেত্র অনুযায়ী এমনভাবে তৈরি করা দরকার যার থেকে উদ্ভাবন এবং তার পশ্চাতে যেসব কারণ বিদ্যমান, শিল্পক্ষেত্রের শ্রেণি অনুযায়ী সেগুলির পার্থক্য যাতে প্রতীয়মান হয়।

৬। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিতে নতুন উদ্ভাবনসমূহ কাজে লাগাবার যেসব প্রক্রিয়া তা পর্যালোচনা করা দরকার। কারণ উদ্ভাবনই একমাত্র পন্থা, যা এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সাহায্য করবে। আর এর মাধ্যমেই শিল্পক্ষেত্র অনুযায়ী নতুন উদ্ভাবনের পরিষ্কার চিত্রটি পাওয়া যাবে।❑

[লেখক ইউনিভার্সিটি অব দিল্লির কেশব মহাবিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক।

email : nomitasharma@gmail.com]

চমকের পর চমক

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আবার

সাফল্যে নাম্বার ওয়ান

WBCS-2012 Gr.- A & B. ফল প্রকাশিত হল

একটি মাত্র সেন্টার থেকে ৪৩ জন চূড়ান্ত সফল

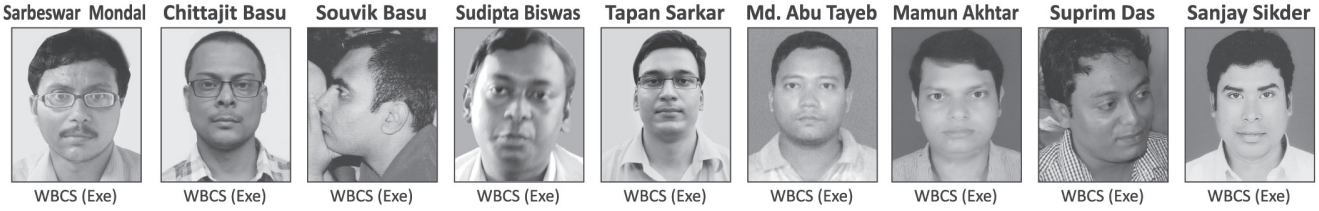

Sarbeswar Mondal — WBCS (Exe)
Chittajit Basu — WBCS (Exe)
Souvik Basu — WBCS (Exe)
Sudipta Biswas — WBCS (Exe)
Tapan Sarkar — WBCS (Exe)
Md. Abu Tayeb — WBCS (Exe)
Mamun Akhtar — WBCS (Exe)
Suprim Das — WBCS (Exe)
Sanjay Sikder — WBCS (Exe)

Ripan Baul — WBCS (Exe)
Arun Kr. Sardar — WBCS (Exe)
Shalini Ghosh — DSP
Md. Nazir Hossain — DSP
Sk. Aktar Ali — DSP
Samaren Halder — DSP
Soumyabhadra Lahiri — CTO
Sayandeep Sen — CTO
Md. Sayeb Alam — CTO

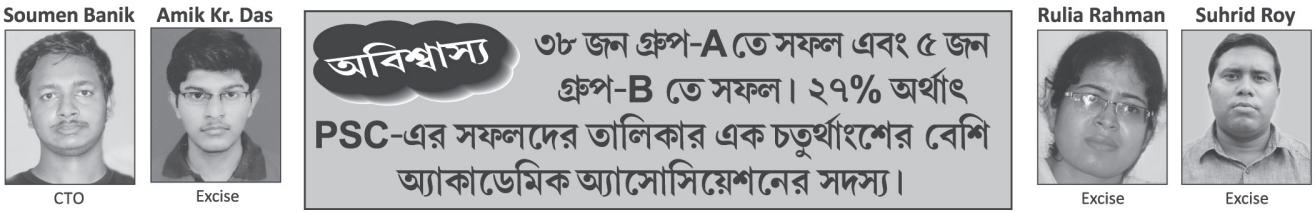

Soumen Banik — CTO
Amik Kr. Das — Excise

অবিশ্বাস্য ৩৮ জন গ্রুপ-A তে সফল এবং ৫ জন গ্রুপ-B তে সফল। ২৭% অর্থাৎ PSC-এর সফলদের তালিকার এক চতুর্থাংশের বেশি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য।

Rulia Rahman — Excise
Suhrid Roy — Excise

Sangram Biswas — Excise
Mrinal K. Maji — Excise
Sultan Ali — Excise
Amita Lepcha — Excise
Koushik Das — Food & Supply
Munmun Banerjee — Food & Supply
Nityananda Banerjee — Food & Supply
Sumit Sinha Roy — Food & Supply
Sharmistha Das — Food & Supply

Prasenjit Saha — Food & Supply
Joydeep Das — Food & Supply
Nirmal Nath — Food & Supply
Moni S. Naskar — Food & Supply
Surajit Kr. Roy — Food & Supply
Subhra Juin — ADSR
Md. Badiuzzaman — ADSR
Abdul B. Mondal — ADSR
Chandan Dutta — ADSR

ডব্লুবিসিএস-২০১৫ : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়েছে ডব্লুবিসিএস-২০১৫ এর জন্য নতুন ব্যাচ। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন কলেজ স্ট্রিটে আমাদের ঠিকানায় শুধুমাত্র শনি ও রবিবার বেলা ১১টা থেকে ৩টের মধ্যে।

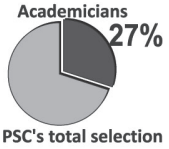

Science & Technology

মেনসের চতুর্থ পত্রের জন্য প্রকাশিত হতে চলেছে সামিম সরকার সম্পাদিত দেবাশীষ ঘোষের 'সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এন্ড এনভায়রনমেন্ট' বইটি। বইটি প্রকাশিত হবে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

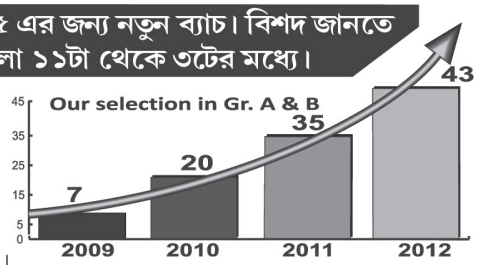

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6, College Street (College Square), Kolkata-700073

9830770440/9674478644

Website : www.academicassociation.in ▪ Centre : Uluberia-9051392240 • Birati-9674555451 • Darjeeling-9832041123

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতের চিরায়ত জ্ঞানের সুরক্ষা

এই দেশ দু'ভাগে বিভক্ত—একটি 'ভারত', অন্যটি 'ইন্ডিয়া'। মাঝে 'ডিজিটাল ডিভাইড' নামক উচ্চ প্রাচীর। একদিকে প্রযুক্তির ওপর ভর করে 'ইন্ডিয়া' তরতর করে এগিয়ে চলছে। অন্যদিকে 'ভারত' শুধুমাত্র পিছিয়েই পড়ছে না; বিশ্বায়িত দুনিয়ায় এই 'ভারত' আজ চরম বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। সনাতন ভারতীয় জ্ঞানকোষের অমূল্য রতন স্বদেশে অবহেলিত। আর এই অবহেলার সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশগুলি পেশির জোরে তা লুটে নিচ্ছে। দেশজ জ্ঞানের প্রকৃত মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ কীভাবে সম্ভব জানাচ্ছেন **অনিন্দ্য ভুক্ত।**

চিরায়ত জ্ঞান এক ধরনের গোষ্ঠী-জ্ঞান, যে গোষ্ঠী প্রকৃত অর্থে কোনও একটি অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী। এই সব আদি জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগটি অত্যন্ত নিবিড়। প্রকৃতির বুক থেকেই তারা খুঁজে পেতে জোগাড় করে তাদের জীবনযাত্রার রসদ, খাদ্য থেকে ওষুধ পর্যন্ত সবকিছু। আর এই যে জ্ঞান তারা তাদের দীর্ঘ জীবনচর্যার মাধ্যমে অর্জন করে তা প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। এই জ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলি শ্রুতিবাহিত, বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় এইভাবে শ্রুতিবাহিত হয়েই। এইভাবে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হতে হতেই এই সব জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়, মানুষের আরও কাজে লাগে এবং এইভাবে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হতে হতেই, এইসব জ্ঞান একদিন সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় চিহ্নের মতো হয়ে ওঠে।

চিরায়ত জ্ঞানগুলি অতএব আদি জনগোষ্ঠীগুলির প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর সে কারণেই জীবনযাপনের প্রতিটি ধাপের সঙ্গেই জড়িত থাকে একটা না একটা জ্ঞানের চর্চা। কৃষির উৎপাদন কৌশল থেকে শুরু করে হস্তশিল্পের চর্চা, গাছগাছড়ার ঔষধি গুণ সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে শস্যবীজের মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অধিবিদ্যা, লোকনৃত্যের চর্চা থেকে পরিবেশ সুরক্ষার কৌশল—এই সবই চিরায়ত জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ। বিশ্ব মেধাসম্পদ সংগঠনের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'কোনও জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের চিরাচরিত রীতিনীতির সঙ্গে জড়িত উৎপাদন কৌশল, দক্ষতা, আবিষ্কার, চর্চা—এসব নিয়েই গড়ে ওঠে চিরায়ত জ্ঞানের ভাণ্ডার যা প্রজন্মক্রমে প্রবাহিত হয় ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যেই।' কোনও জনগোষ্ঠীর জ্ঞানের এই ভাণ্ডার তাই ধীরে ধীরে একরকম ওই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যস্বরূপও হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে, কোনও জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে চিরায়ত জ্ঞানের ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই জ্ঞান-ভাণ্ডারই চুরি হয়ে যাচ্ছে অবাধে। এই সব জ্ঞানের কোনও লিখিত নথি না থাকাতেই সম্ভবপর হচ্ছে এই অবাধ লুণ্ঠন। চিরায়ত জ্ঞানের সুরক্ষার প্রশ্নটি তাই এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী জুড়েই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, বিশেষত সেই সব দেশের কাছে যাদের এই জ্ঞানের ভাণ্ডারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

জৈব দস্যুতা

চিরায়ত জ্ঞানের নানান প্রকারভেদ থাকলেও আর্থনীতিক দিক থেকে মূল্যবান সেগুলিই যেগুলির সঙ্গে যুক্ত কোনও জৈব সম্পদ। এর কারণ এগুলি থেকেই তৈরি হয় অমূল্য সব ওষুধ, এগুলিই আমাদের খাদ্যের জোগানদাতা। ফলে জৈব সম্পদে সমৃদ্ধ যে সমস্ত দেশ, চিরায়ত জ্ঞানের সুরক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ সে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই। ভারত এমনই একটি দেশ। আর জৈব সম্পদে সমৃদ্ধ অন্যান্য সব দেশের মতোই ভারতও ইতিপূর্বে কখনও তার এই অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের কথা ভাবেনি। অথচ পৃথিবীতে মেধাসম্পদ সংরক্ষণের সূত্রপাত কিন্তু হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগেই। তা সত্ত্বেও আদি জনগোষ্ঠীগুলির মেধাজাত এই সৃষ্টিগুলিকে সুরক্ষিত রাখার উদ্যোগ না নেবার খেসারত দিতে হচ্ছে আজ। চুরি হয়ে যাচ্ছে জৈব সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞানগুলি, যাকে বলা হচ্ছে জৈব দস্যুতা।

ভারত জৈব দস্যুতার প্রথম শিকার হয় ১৯৯৩ সালে। ১৯৯৩ সালে ইউনিভার্সিটি অব মিসিসিপি মেডিক্যাল সেন্টার একটি পেটেন্ট অর্জন করে আমেরিকার পেটেন্ট অফিসের কাছ থেকে। হলুদের যে ব্যথানাশক গুণ আছে সেই ব্যথানাশক গুণটির উপরই পেটেন্টটি প্রদান করা হয়েছিল। হলুদের এই ব্যবহার আদতে ভারতেরই কোনও প্রাচীন জনগোষ্ঠীর। অর্থাৎ এটি ভারতের চিরায়ত জ্ঞান ভাণ্ডারের একটি সম্পদ।

হলুদ দিয়ে শুরু। তারপর একে একে নিম, গোলমরিচ, অড়হর, বাসমতী চাল, আদা, করলা—জৈব দস্যুতার শিকার হয় ভারতের এই সব গেঁয়ো গাছগাছালি। একেকটি পেটেন্ট অধিকার বাতিল করতে গড়পড়তা পাঁচ থেকে সাত বছর আর কুড়ি থেকে ষাট লক্ষ ডলার গাঁটের কড়ি বেরিয়ে যায়। টাকা এবং সময়ের এই গচ্চাই অবশেষে টনক নড়িয়েছে। চিরায়ত জ্ঞানগুলির একটি লিখিত তথ্য ভাণ্ডার থাকলে চৌর্যবৃত্তির এই ঘটনাগুলি ঘটত না। এই বোধ থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে ট্র্যাডিশনাল নলেজ ডিজিটাল লাইব্রেরি (টিকেডিএল)।

কোনও আবিষ্কারের জন্য যখন কেউ পেটেন্ট দাবি করে আবেদন করে, পেটেন্ট অফিস তখন দলিল-দস্তাবেজ খুঁজতে বসে—এমন আবিষ্কার আগে কেউ কখনও করেছে কি না, তার কোনও লিখিত নথি আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে প্রাথমিক স্তরেই বাতিল হয়ে যায় আবেদন। যদি না থাকে বা যদি তেমন কোনও নথি খুঁজে না পায় পেটেন্ট অফিস, তাহলে পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়। সে ক্ষেত্রেও অবশ্য পরবর্তীকালে নাকচ করানো যায় সেই পেটেন্ট। লিখিত নথি জোগাড় করে পেটেন্ট অফিসে গিয়ে প্রমাণ

করতে হয় আবিষ্কারটির প্রাক্-অস্তিত্ব। প্রমাণ করতে পারলে মঞ্জুরীকৃত পেটেন্ট বাতিল করে দেয় পেটেন্ট অফিস। এই দ্বিতীয় রাস্তাটি কতটা সময় ও ব্যয়বহুল তা জৈব দস্যুতার ঘটনাগুলি থেকেই প্রমাণিত। টিকেডিএল-এর জন্ম এই খরচ আটকাতে।

ট্র্যাডিশনাল নলেজ ডিজিটাল লাইব্রেরি

জৈব দস্যুতার হাত থেকে চিরায়ত জ্ঞানগুলিকে বাঁচাতে মেধাসম্পদ সংক্রান্ত দু' ধরনের রক্ষাকবচের কথা বলা হয়। একটিকে বলা হচ্ছে ধনাত্মক সুরক্ষা, অন্যটি রক্ষণাত্মক সুরক্ষা। কোনও জ্ঞান চুরি হয়ে যাবার পর তাকে উদ্ধার করার যে পথ সেগুলি ধনাত্মক সুরক্ষা আর চুরি আটকানোর যে প্রতিরোধমূলক পন্থা সেটি রক্ষণমূলক সুরক্ষা হিসেবে পরিচিত। ধনাত্মক সুরক্ষার সাহায্য নিতে গেলে তাই সবার আগে দরকার একটি উপযুক্ত আইনি কাঠামো গড়ে তোলা। মেধাসম্পদ সুরক্ষার জন্য আইনি কাঠামো ভারতের আছে। ভারতের ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনটির সুখ্যাতিও দেশবিদেশ জুড়ে আছে। কিন্তু সেই আইন দিয়ে চিরায়ত জ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে সুরক্ষা দেবার অসুবিধাও আছে। অসুবিধার কারণ চিরায়ত জ্ঞানের বিষয় বৈচিত্র্য। যে আইন দিয়ে ওষুধের আবিষ্কারকে সুরক্ষা দেওয়া যায় সেই একই আইন দিয়ে কোনও নৃত্যকৌশলকে সুরক্ষা দেবার বাস্তবিক অসুবিধা আছে। এই অসুবিধার কারণেই ভারত রক্ষণমূলক সুরক্ষার রাস্তাটি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয়।

রক্ষণমূলক সুরক্ষার পথটি অবলম্বন করতে গেলে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হল একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা। এই তথ্যভাণ্ডারটিকে কাজে লাগিয়েই সে ক্ষেত্রে আটকে দেওয়া যাবে চুরি যাওয়া কোনও জ্ঞানের পেটেন্ট প্রাপ্তিকে। ২০০১ সালেই এই রকম একটি ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে, যে কথা আমরা আগেই বলেছি, চিরায়ত জ্ঞানসমূহের মধ্যে যেহেতু সবচেয়ে মূল্যবান জৈবসম্পদ সংক্রান্ত জ্ঞান সেহেতু এই তথ্যভাণ্ডার কেবলমাত্র এই ধরনের জ্ঞানেরই ভাণ্ডার। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে এই ডিজিটাল লাইব্রেরি কেবলমাত্র ভারতের আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়াসমূহের একটি তথ্যভাণ্ডার মাত্র।

মনে হতে পারে আয়ুর্বেদিক ওষুধ নিয়ে এত ভাবনাচিন্তার কী আছে, কজনই বা আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবহার করে? উত্তর হচ্ছে, বিকাশশীল দেশগুলির ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আয়ুর্বেদিক ওষুধের উপর নির্ভরশীল। এমনকী আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশেও ৫০ শতাংশের মতো মানুষ কখনও না কখনও আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবহার করেছেন। এই পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট চিরায়ত জ্ঞান ভাণ্ডার কীভাবে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

ভারতের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) এবং ডিপার্টমেন্ট অব আয়ুর্বেদ, যোগ অ্যান্ড নেচারোথেরাপি, ইউনানি অ্যান্ড সিদ্ধা অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি (আয়ুষ)-এর যৌথ উদ্যোগের ফসল এই ডিজিটাল লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে প্রায় ২২,৬০,০০০ ওষুধের ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করা আছে। শুধু লিপিবদ্ধ করাই নয়, সারা পৃথিবীর পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যাতে এগুলি বোধগম্য হয় সেজন্য এগুলিকে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, জাপানি, স্প্যানিশ অনুবাদ করেও দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত গাছগাছড়া থেকে এগুলি তৈরি সেই সব গাছের বোটানিক্যাল নামও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

ডিজিট্যাল লাইব্রেরি তৈরি করলেই কাজটা শেষ হয়ে যায় না। এমনভাবে সেটা ব্যবহার করা দরকার যাতে তা সবার কাছে উন্মুক্তও না হয়ে যায় অথচ বিভিন্ন দেশের পেটেন্ট কর্তৃপক্ষ কোনও নতুন পেটেন্ট মঞ্জুর করার আগে এই তথ্য ভাণ্ডারে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে, তথ্য ভাণ্ডারটি তৈরির পর, ভারত বিভিন্ন দেশের পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি 'টিকেডিএল অ্যাকসেস এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষরে উদ্যোগী হয়েছে। এই চুক্তিতে যারা সই করবে তারা নতুন পেটেন্ট আবেদন পরীক্ষার জন্য তথ্যভাণ্ডার ঘাঁটতে পারবে এবং কোনও পেটেন্ট বাতিল করার পর আবেদনকারী সেই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করলে তাকে তথ্য ভাণ্ডারের যে তথ্যের ভিত্তিতে আবেদন বাতিল করা হয়েছে সেই তথ্যটি দেখাতে পারবে। ২০১১ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান পেটেন্ট অফিসের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে, তার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অন্য একটি প্রশ্নও এই সূত্রে উঠে যাচ্ছে। সুফল কি সত্যিই পাওয়া যাচ্ছে? জ্ঞানের সুফল মানে কি শুধু অন্যেরা যাতে সেই জ্ঞান চুরি করতে না পারে সেটুকুকে নিশ্চিত করা? নাকি জ্ঞানের সুফল সেটাই যেটা অন্যকে যেমন সেই জ্ঞানের ভাগ দেয় তেমনি ভাগ দেবার বিনিময়ে নিজেও কিছু অর্জন করে? চিরায়ত জ্ঞান ভাণ্ডারকে তাই বরং অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে এবং দেখতে হবে তার বিনিময়ে যেন জ্ঞানের যে বা যারা আদতে মালিক তারা কোনও সুবিধা পায়। জ্ঞানের এই আদানপ্রদানকে বলা হয় সুবিধার বণ্টন। এই জিনিস চালু হয়েছে ইতিমধ্যেই, দেশে এবং বিদেশে। তবে এক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন উঠেছে। চিরায়ত জ্ঞানের বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে যে লাভ হবে সেই লাভের ভাগ কে পাবে—যে জনগোষ্ঠী জ্ঞানটির আদত মালিক সে নাকি সংশ্লিষ্ট দেশ। পেরু বা কলম্বিয়ার মতো কিছু দেশ লাভের ভাগ পুরোটাই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে দিতে আগ্রহী। আবার ভারত চায়, এই লাভ সবটাই যাবে সরকারের ঘরে। যুক্তি এই যে, এই বিশাল দেশে অসংখ্য জনগোষ্ঠী যেমন আছে, তেমনই আছে চিরায়ত জ্ঞানের এক বিপুল সম্ভার। কোন জ্ঞান কোন জনগোষ্ঠীর তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করাই মুশকিল। কারণ সরকার তো লাভটা দেশের মানুষের জন্যই খরচ করবে।

এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অবশ্য আমাদের মাথাব্যথা নেই। বলার কথা একটিই, এইসব তুচ্ছ বিতর্ক যতদিন চলবে ততদিন জ্ঞানের সুবিধাটি ভোগ করবে উন্নত বিশ্ব, আর জ্ঞানের যারা আদত মালিক সেই বিকাশশীল দেশগুলি আঙুল চুষতে চুষতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।❑

[লেখক আরামবাগ কলেজে অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক।]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতি

বিকাশ, সম্ভাবনা ও সমস্যা

প্রযুক্তির আধিপত্য এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বিশ্ব বাজারে প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতির ইঁদুর-দৌড়ে প্রথম সারির উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে এ দেশও। সম্ভাবনাময়, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের এই ক্ষেত্রে। অন্তত বিশেষজ্ঞদের তাই মত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশ্ব ব্যাংকের জ্ঞান-অর্থনীতি-নির্দেশক অনুসারে মোট ১৪৫টি দেশে ভারতের ক্রমিক স্থান ১০৯। কেন? এই সব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে **ভব রায়***-এর নিবন্ধে।*

পৃথিবীর যে কোনও দেশের আধুনিক অর্থনীতিতে প্রযুক্তির একটি অত্যাবশ্যক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুন্নত, উন্নয়নশীল বা উন্নত, দেশটি যে অর্থনৈতিক গোত্রেরই হোক না কেন—তার কৃষি-শিল্প বা অন্যান্য উপক্ষেত্রের অগ্রগতি তথা উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, তার বহুবিস্তারী ভূমিকা পালন করে থাকে—কোথাও সীমিত পর্যায়ে, কোথাও ব্যাপকভাবে। কিন্তু, এই 'প্রযুক্তি' হল সাধারণভাবে প্রথাগত অর্থনীতিতে (traditional economy) ব্যবহৃত ও ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি, যার সঙ্গে বর্তমান আলোচ্য প্রযুক্তি, উদ্ভাবন তথা জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির রয়েছে মৌলিক ও দুস্তর পার্থক্য। বর্তমান আলোচনায় লক্ষণীয়, 'প্রযুক্তি' ও 'উদ্ভাবন'—শব্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, অর্থাৎ আধুনিকতম প্রযুক্তির প্রধানতম 'ফসল' হিসাবে ধরে নেওয়া যায় উদ্ভাবনকে এবং এ দুটির সামগ্রিক 'আধার' হিসাবে 'জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতি'-কে।

তবে, বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে সংক্ষেপে দেখে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে—'জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতি' বলতে ঠিক কী বোঝায়। তার মূল বৈশিষ্ট্য, উপকরণ বা চালিকা শক্তিগুলিরই স্বরূপ ঠিক কীরকম। আসলে, 'জ্ঞান-বিশ্ব' (knowledge world) একটি আধুনিকতর সমাজতাত্ত্বিক ধারণা বা বিষয়, যেখানে শুধুমাত্র অর্থনীতিই নয়, অধীত বিদ্যা বা জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়েরই রয়েছে স্বাভাবিক অন্তর্ভুক্তি বা অনায়াস বিচরণ— ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু, এই যে জ্ঞান-বিশ্ব, সেখানে কোনও বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি বা সংযোগের ক্ষেত্রে রয়েছে কিছু অলিখিত 'শৃঙ্খলা' বা নিয়মনীতি। এক কথায় সেটি হল—কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রথাগত সাধারণ বা 'সহজপাঠ' নয়, বরং সেই বিষয়ের এক ধরনের উচ্চ উৎকর্ষ বা বিশিষ্ট (specialised) ঘরানার জ্ঞান-বিনিময় তথা চর্চার বিচিত্র বিষয় ও কর্মপ্রক্রিয়াই হল জ্ঞান-বিশ্বে পদক্ষেপ করার অবিকল্প মাধ্যম।

যাই হোক, জ্ঞান-বিশ্বের এই সংক্ষিপ্ত ধারণাটিকে মাথায় রেখে সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির আলোচ্য প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। জ্ঞান-বিশ্বের মতোই জ্ঞান-অর্থনীতির উৎস বা সূত্রের ইতিহাসটিও খুব বেশি দিনের নয়—৫০ বছরেরও কম। আন্তর্জাতিকভাবে সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিদ পিটার ড্রুকার ১৯৬৬ সালে অর্থনীতির এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করেন 'knowledge economy' নামে। যে কোনও উৎপাদনভিত্তিক কর্মীবাহিনীকে দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণিতে বিভাজিত করেন তিনি—(১) কায়িক বা হস্ত-নির্ভর শ্রমিক (manual worker), (২) জ্ঞান-নির্ভর শ্রমিক (knowledge worker)। তাঁর অভিমতে, প্রথম শ্রেণির শ্রমিক বা কর্মীরা কোনও পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন করেন মূলত তাঁদের হাত বা কায়িক শ্রম দিয়ে, আর দ্বিতীয় শ্রেণি, হাত বা শারীরিক শ্রমের পরিবর্তে, তাঁদের 'মস্তিষ্ক' দিয়ে উৎপাদন করে বিভিন্ন ধারণা (ideas), সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান ও তথ্য (knowledge and information)।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিক থেকেই, আধুনিক প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রায় হাত ধরেই জ্ঞান-অর্থনীতির সূত্রপাত। পরবর্তী বছরগুলিতে অতি দ্রুতগতিতে তার বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। কিন্তু, ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে জ্ঞান-অর্থনীতির অভিঘাত ও প্রভাব পৌঁছোতে লেগে যায় আরও ২০-২৫ বছর। অবশেষে, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে অর্থনীতির এই আধুনিকতম ক্ষেত্রটি জাতীয় প্রেক্ষিত সহ একটি সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এসবের মধ্যে দিয়েই জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতি নিয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে নানা গবেষণা ও বিশ্লেষণ, প্রচলিত হয়েছে বিভিন্ন সংজ্ঞাও। এগুলির মধ্যে থেকে একটি বহু-প্রচলিত সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে : "The knowledge economy is the use of knowledge (savoir, savoir-faire, savoir-etre.) to generate tangible and intangible values. Technology and in particular knowledge technology (Artificial Intelligence) help to transform a part of human knowledge to machines. This knowledge can be used by decision support systems in various fields and generate economic values. Knowledge economy is also possible without technology" (সূত্র : Wikipedia)।

এই সংজ্ঞার সূত্র ধরে বোঝা যায়, জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতি হল সেই বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির সুবাদে মানবিক প্রযুক্তির রূপান্তর ঘটে যন্ত্র মাধ্যমে এবং তারই ফসল হিসাবে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত অথবা অবস্তুগত পণ্য এবং এই যে বিশেষ ধরনের জ্ঞানের প্রয়োগ, তার পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে নানা ধরনের সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রকরণ। ভিন্নতর আর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ".....The

key component of a knowledge economy is a greater reliance on intellectual capabilities than on physical inputs or natural resources." অর্থাৎ, এখানেও সেই জ্ঞানভিত্তিক বা 'বৌদ্ধিক সক্ষমতা'-কেই জ্ঞান-অর্থনীতির প্রধান চাবিকাঠি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এবার, সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে কিছুটা অন্যভাবে দেখা যাক। যেকোনও অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেলের (growth model) রয়েছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় (phase)। তা সেই তাত্ত্বিকতার প্রেক্ষিতে এই জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতিকে কীভাবে দেখা যেতে পারে? বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে, বিশেষত পাশ্চাত্য ধারণায়, জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতিকে আধুনিকতম বা সাম্প্রতিকতম 'বিশ্ব অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তাত্ত্বিকতায় বলা হয়েছে, উন্নততর অর্থনৈতিক বিশ্ব, অনেক বছর আগেই কৃষি অর্থনীতি থেকে শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে উত্তরিত হয়েছে, তারপর তার উত্তরণ ঘটেছে উত্তর-শিল্পায়ন পরিষেবা-প্রভাবিত অর্থনীতিতে (১৯৬০-১৯৭৫) এবং গত শতাব্দীর শেষপর্ব থেকে অদ্যাবধি (১৯৭৫ এবং তার পরবর্তী ২০০০-উত্তর অদ্যাবধি) চলছে জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির (প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা-উন্নয়ন সমৃদ্ধ পণ্য, পরিষেবা) বহুলাংশ ও সিংহভাগ প্রভাব। আসলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ও ভূমিকাটিকে সঠিকভাবে জানতে হলে জ্ঞান-অর্থনীতির এই আন্তর্জাতিক পটভূমিটির সংক্ষিপ্তস্বরূপ জানার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও জ্ঞান-অর্থনীতি : সূত্রপাত ও বিকাশ

পূর্ব-বর্ণিত আন্তর্জাতিক পটভূমিকে মনে রেখে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানকে জানতে হলে গোড়াতেই কয়েকটি বিষয় মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত, পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে যেভাবে বা যে সময়ে এই ক্ষেত্রটির সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটেছে, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই অর্থনৈতিক রূপান্তর সেভাবে ঘটেনি। বরং, পাশ্চাত্য অর্থনীতির তুলনায় অনেক পরে ভারতে এর সূচনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বিশেষ ক্ষেত্রটির বিকাশের অনুকূলে এশিয়ার মধ্যে ভারতকে একটি ইতিবাচক পটভূমি হিসাবে বিবেচনা ও চিহ্নিত করা হলেও জাতীয় অর্থনীতিতে এই বিশেষ ক্ষেত্রটির বিকাশের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতাও কিছু কম ছিল না। তৃতীয়ত, উন্নত ও উন্নততর দেশগুলির কর্মীবাহিনীতে বর্তমানে জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সিংহভাগ (৭০ শতাংশ-এরও বেশি) দখল করলেও ভারতের অর্থনীতিতে এই অনুপাতটি আজও যথেষ্ট দুর্বল (২৫-৩০ শতাংশ)। এটি অবশ্যই জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির সম্প্রসারণের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। চতুর্থত, দেশের সামগ্রিক জনসাধারণের দৈনন্দিন আর্থ-সামাজিক জীবনচর্চায় এমন কিছু উপাদান থাকে, যা জ্ঞান-অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে হয় অনুকূল অথবা প্রতিকূল ভূমিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ভারতের অবস্থান আজও খুব শক্তপোক্ত না হওয়ায় জ্ঞান-অর্থনীতিতে আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটছে না। সারণি-১ দেখলেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারণি-১
ভারত-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) তুলনামূলক বিস্তার

দেশ	প্রতি ১০০০ মানুষে দৈনিক সংবাদপত্র ব্যবহার	টেলিভিশন আছে, এমন গৃহস্থ (%)	ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও ইন্টারনেট		তথ্য ও সংযোগ-প্রযুক্তিজাত বাণিজ্য (Trade)		
			প্রতি ১০০০ জন মানুষে		পণ্য		পরিষেবা
			ব্যক্তিগত কম্পিউটার	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	মোট পণ্য রপ্তানির সংশ্লিষ্ট রপ্তানি (%)	মোট পণ্য আমদানির সংশ্লিষ্ট আমদানি (%)	মোট পরিষেবা রপ্তানির সংশ্লিষ্ট রপ্তানি (%)
	২০০০-০৫	২০১০	২০১০	২০১০	২০১০	২০১০	২০১০
আমেরিকা	১৯৩	—	—	৭৪.২	১০.৫	১৪.২	৪.৬
ইংল্যান্ড	২৯০	—	৮৬.৭	৮৪.৭	৫.৯	৯.৩	৮.৮
ফ্রান্স	১৬৪	৯৯	৭৮.০	৭৭.৫	৪.৪	৭.৩	৪.২
জার্মানি	২৬৭	৯৫	৮৫.৪	৮২.৫	৫.১	৯.২	৯.১
জাপান	৫৫১	৯৯	৬৬.৯	৭৭.৬	১০.৭	১২.০	১.৩
কোরিয়া	—	—	৮১.৫	৮২.৫	২১.৪	১১.৯	১.২
ব্রাজিল	৩৬	৯৮	৪৪.১	৪০.৭	১.০	৯.৫	২.৯
চীন	৭৪	—	—	৩৪.৪	২৯.১	২০.৪	৬.১
ভারত	৭১	৬০	—	৭.৫	২.০	৬.৬	৪৭.০
পাকিস্তান	৫০	৬৮	—	১৬.৮	০.২	৩.৩	৬.৬
সমগ্র বিশ্ব	১০৪	—	—	৩০.২	১১.১	১২.৭	৯.৩

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক (বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, ২০১২)

বলা নিষ্প্রয়োজন, সারণি-১-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন উপ-শিরোনামগুলি (সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান-সহ) আলোচ্য জ্ঞান-অর্থনীতির অপরিহার্য উপাদান (components) বা অবিকল্প প্রবেশদ্বার। এখানে এও লক্ষণীয়, জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বা উপক্ষেত্রে (সংবাদপত্র-কম্পিউটর-ইন্টারনেট ব্যবহার ইত্যাদি) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত, মাত্র দু-তিন বছর আগে পর্যন্তও, কী চরম হতাশাজনক অবস্থায় ছিল। অতি সম্প্রতি হয়তো এসব ক্ষেত্রে সামান্য কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু, পৃথিবীর অন্য অনেক দেশ তো আরও অগ্রগতি ঘটিয়ে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রায় পূর্ণ-সম্পৃক্তির (full saturation) বিন্দু ছুঁয়ে ফেলেছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান কারণ পিছিয়ে পড়ার, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী হল সরকারি নীতি এবং সরকারের বাইরে কিছু কিছু মহলের চরম প্রতিকূল অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া। এসবের ফলে, আধুনিকতম এই প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সুযোগ নেওয়ার দৌড়টা শুরু করতেই অনেক দেরি করে ফেলেছিল ভারত। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি, সারা

পৃথিবীর বহু দেশেই যখন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে-উৎসাহে তথ্য-প্রযুক্তি দ্রুতলয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, তখন ভারত সরকার এক্ষেত্রে অতি সীমিত ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থনীতিবিদ রফিক দোসানি এরকমও অভিযোগ করেছেন—ভারতে, রাষ্ট্রীয় সরকার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে তার প্রাথমিক বিকাশ পর্বে শুধু অবহেলাই করেননি, বরং এই ক্ষেত্রটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সরকারের অবস্থান ছিল চরম প্রতিকূল (hostile) [সূত্র : দ্য সার্ভিস রেভলিউশন ইন সাউথ এশিয়া; রফিক দোসানি]।

তাঁর মতে সরকারের এই বিরূপ ভূমিকা বজায় ছিল প্রায় এক দশক (১৯৭০-৮০)। সেই বিরূপ ভূমিকার ফলস্বরূপ সেই দীর্ঘ সময় জুড়ে, তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্রাংশ বা আনুষঙ্গিকের উপর আরোপ করা হয়েছিল অতি উঁচু হারে আমদানি শুল্ক (হার্ডওয়্যারের এবং সফটওয়্যারের)।

যাই হোক, অবশেষে এক্ষেত্রে বরফ গলল ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। সারা বিশ্ব জুড়ে নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়ে চলার সুবাদে, এই ক্ষেত্রটির গুরুত্ব ক্রমশ উপলব্ধি করতে শুরু করল এ দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল। সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ও কর্মসূচিতেও দেখা দিল ইতিবাচক পরিবর্তন। এই ক্ষেত্রটির যথোচিত বিকাশের অনুকূলে সরকারের তরফে ঘোষিত হল 'নতুন কম্পিউটর নীতি ১৯৮৪' (NCP), যা দেশ জুড়ে আধুনিকতম প্রযুক্তির দ্রুত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ এবং জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির প্রকৃত বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার দাবি রাখে। পরবর্তীকালে ১৯৯০ দশক জুড়ে ২০০০ সাল এবং তার পরবর্তী সময়েও পূর্বোক্ত কম্পিউটর নীতির পরিপূরক হিসাবে প্রয়োজন মাফিক ও সময়োপযোগী নীতির সংস্কার হয়েছে এবং নানাবিধ উদার ও ইতিবাচক পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সূচনা অনেকটা দেরিতে ঘটলেও, শুরুর পর কিন্তু তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিশেষ করে ২০০০ সালের পর এক দশকের বেশি সময় ধরে এক্ষেত্রে ভারত যে চমকপ্রদ অগ্রগতির প্রমাণ রেখেছে, পৃথিবীর অন্য কোনও উন্নয়নশীল দেশে তার নজির নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের পরিষেবা ক্ষেত্রকে অতি সমৃদ্ধ ও জাতীয় অর্থনীতিকে পুষ্ট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেছে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ICT (ইনফর্মেশন অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি)। এই ICT-র সুফল ভারতীয় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও কীভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এবং কীভাবেই তা বৃহত্তর জ্ঞান-অর্থনীতি তথা জ্ঞান-জগতের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে চলেছে, তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে অর্থনীতিবিদ পুরী ও মিশ্রের এই মন্তব্যে, "An important sector contributing to the rapid growth of services in India in recent years has been the Information and Communication Technology (ICT).....A strong ICT infrastructure enables rapid and efficient exchange of information around the world. Recent advances in various technologies are affecting the acquisition, creation, sharing and application of knowledge, which in turn affect a wide range of economic and social activities—among them how manufacturers, service providers...are organised and how they perform their functions (সূত্র : 'ইন্ডিয়ান ইকোনমি', পুরী ও মিশ্র)। অর্থাৎ, প্রযুক্তি-উদ্ভাবনের সেতুর মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের সুবাদে জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারার অনেক ক্ষেত্র ও উপক্ষেত্রও (যেমন, শিল্প উৎপাদন, বাণিজ্য ইত্যাদি) বহুলাংশে পুষ্ট হয়ে চলেছে।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় ICT কতখানি উন্নতি ঘটিয়েছে, সারণি-২-এর পরিসংখ্যানগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে।

১৯৯৫ সালের মাত্র ১.১ বিলিয়ন ডলারের সংশ্লিষ্ট শিল্প ২০০২-এ ১৬.১ এবং ২০১২-তে ১০০.৮ বিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। আরও যা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই শিল্পের সিংহভাগই ভারত রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে, রপ্তানিকৃত এই ভারতীয় পণ্যের পরিমাণ ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল মাত্র ০.৬ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১১-১২-তে পৌঁছেছিল ৬৯.১ বিলিয়ন ডলারে। এইভাবে, ২০১১-১২ সালে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তির মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি রপ্তানি হয়েছে এবং এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি পরিমাণের বিপণন হয়েছিল অভ্যন্তরীণ বাজারে। অবশ্য, ২০০৫ সাল থেকেই ভারত বিশ্বের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং অতিসাম্প্রতিক-কাল (২০১২-১৩) পর্যন্ত সেই স্বীকৃতি ধরে রেখেছে।

ভারতে জ্ঞান-অর্থনীতি : আরও অনেক সম্ভাবনা

ভারতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন তথা জ্ঞান-অর্থনীতির অগ্রগতির আরও কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ছবি তুলে ধরা যেতে পারে :

(১) তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভারতের 'বিপিও' এবং 'কল-সেন্টার'-এর খ্যাতি অনেক বছর আগে থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকেই এক্ষেত্রে সবচেয়ে আদর্শ উৎকর্ষ-কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে—বিশেষজ্ঞ মতে, এর প্রধান কারণ হল, ".....India had the right mix of educated, low-cost, English-speaking and skilled workforce (including software engineers) to undertake the job." (সূত্র : 'ইন্ডিয়ান ইকোনমি', পুরী ও মিশ্র)। এই সূত্রে আরও উল্লেখযোগ্য, যে সফলতম বিপিও প্রযুক্তির অনেক বেশি উন্নতি ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনের পরবর্তী পর্যায় 'কেপিও' বা (নলেজ প্রসেস আউটসোর্সিং)-এর জন্ম হয়েছে। এর সুবাদে আগামী দিনে ভারত আন্তর্জাতিক উৎকর্ষ-মূল্য ও জ্ঞান-শৃঙ্খলের শিখরে স্থায়ী আসন করে নিতে পারবে।

(২) বর্তমানে ভারতে নিট জিডিপি-র একটি বড় অংশ (১৪ শতাংশ) আসে জ্ঞান-নির্ভর ক্ষেত্র থেকে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ সুনীল মানি মন্তব্য করেছেন, ".....মনে রাখা দরকার যে, জ্ঞান-নির্ভর উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ, অর্থনীতির সার্বিক বিকাশহারকে ছাপিয়ে যায়। নতুন সংস্থাগুলির সিংহভাগই জ্ঞান-নির্ভর ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে। সত্যি বলতে কী, গত সাত বছরে এই ধরনের সংস্থায় বাজার ছেয়ে গেছে।" (সূত্র : যোজনা, ধনধান্যে, এপ্রিল, ২০১৪)।

(৩) জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির একটি অত্যাবশ্যক উপাঙ্গ হল 'গবেষণা ও উন্নয়ন' (R&D), যার সূত্র ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নতুন উদ্ভাবনের বিকাশ হয়। এই ক্ষেত্রটিতেও সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরেই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক বেশি গুরুত্ব ও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯১ সালে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের মাত্র ১৪ শতাংশ খরচ করা হত এই খাতে, বর্তমানে এই হার করা হয়েছে ৩০ শতাংশ। সরকারি ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রায় সব শিল্প প্রযুক্তির (যেমন, গাড়ি শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন অনুষঙ্গ ইত্যাদি) ক্ষেত্রেই চলছে নিরন্তর গবেষণা।

(৪) জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বিভিন্ন পণ্যের 'পেটেন্ট' নেওয়া এবং 'মেধা-স্বত্ব-অধিকার'-এর (ইন্টেলেকচুয়ল প্রপার্টি রাইটস্) বিকাশ, যে ক্ষেত্র দুটিতে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে এখনও হয়তো ততটা এগোতে পারেনি। তবে, আগের তুলনায়, ভারতে পেটেন্ট নেওয়ার সংখ্যা ও প্রবণতা বেড়েছে। আবার, ভারতের মাটিতে স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করে বেশ কয়েকটি উন্নত পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন সংস্থা তাদের সিংহভাগ পেটেন্ট অর্জন করে চলেছে। এক্ষেত্রেও, পরোক্ষ লাভ হিসাবে ভারত বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে 'জ্ঞান-বিনিময়'-এর সুযোগ নিতে পারছে। মেধাস্বত্ব অধিকারের ক্ষেত্রেও, ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের (১৯৯১) পর থেকে, অনেক বেশি নমনীয়তা ও উদারতা দেখানো হচ্ছে। এর ফলে, দেশীয় বা বিদেশি চুক্তিভিত্তিক 'রয়্যালটি' বা প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের পারিশ্রমিক ইত্যাদি বিষয়েও জটিলতা অনেকটাই কমেছে।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও জ্ঞান-অর্থনীতির ক্ষেত্রটিতে এখনও ভারতের রয়েছে ঢের বহুমুখী সম্ভাবনা। দেশ এবং বিদেশের বিশেষজ্ঞদের অন্তত এরকমই অভিমত। বিশেষ করে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এ ব্যাপারে উচ্চ-আশাবাদী। এ সম্পর্কে তাঁদের একটি পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, "India, with its youthful population and thriving Information and Communication Technology (ICT) industry, can become a knowledge-driven economy as long as regulatory, education and infrastructure barriers are overcome. .....By leveraging its strengths in human capital and ICT services, India can become a major global knowledge-based economy" (সূত্র : 'ক্যাপিটাল মার্কেট', ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)।

সারণি-২
ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বৃদ্ধি
(মার্কিন বিলিয়ন ডলারে)

সাল	সংশ্লিষ্ট শিল্পের মোট আয়তন	যার মধ্যে	
		রপ্তানি বাজার	দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজার
১৯৯৫-৯৬	১.১	০.৬	০.৫
১৯৯৬-৯৭	১.৮	১.১	০.৭
১৯৯৭-৯৮	২.৯	১.৮	১.১
১৯৯৮-৯৯	৪.০	২.৬	১.৪
১৯৯৯-২০০০	৫.৫	৪.০	১.৫
২০০০-০১	১২.২	৬.২	৬.০
২০০১-০২	১৩.৪	৭.৬	৫.৮
২০০২-০৩	১৬.১	৯.৯	৬.২
২০০৩-০৪	২১.৬	১৩.৩	৮.৩
২০০৪-০৫	২৮.১	১৮.২	৯.৯
২০০৫-০৬	৩৭.৪	২৪.২	১৩.২
২০০৬-০৭	৪৭.৯	৩১.৭	১৬.২
২০০৭-০৮	৬২.৯	৪০.৯	২২.০
২০০৮-০৯	৬৯.৪	৪৭.৫	২১.৯
২০০৯-১০	৭৪.২	৫০.১	২৪.১
২০১০-১১	৮৮.৪	৫৯.৪	২৯.০
২০১১-১২	১০০.৮	৬৯.১	৩১.৭

সূত্র : টাটা সার্ভিসেস, 'স্ট্যাটিস্টিকল আউটলাইন অব ইন্ডিয়া' (২০০৩-০৪ এবং ২০১২-১৩)।

তবে এত উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরেও এই সেদিনের (২০১২) হিসাবে, 'বিশ্ব ব্যাংকের জ্ঞান-অর্থনীতি-নির্দেশক' অনুসারে ভারতের ক্রমিক স্থান ১৪৫টি দেশের মধ্যে ১০৯তম। এই সব বহুবিধ সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা হল, আজও ভারতের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ জন মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল, উন্নত বিশ্বে এই অনুপাত যেখানে ৫ শতাংশের আশপাশে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ভারতীয় অর্থনীতিতে 'পরিষেবা' তথা তৃতীয় ক্ষেত্রের বিস্ময়কর, ইতিবাচক উত্থান ও অবদান সত্ত্বেও, ওই বিশাল সংখ্যক কৃষি-নির্ভর মানুষকে 'কৃষি থেকে শিল্পে'-ই স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি—পরিষেবা তথা জ্ঞান-অর্থনীতিতে তাদের আংশিক স্থানান্তরণও আক্ষরিকভাবে 'আকাশকুসুম' কল্পনা। পাশাপাশি, মনে রাখতে হবে, আজও দেশের ৩৫ থেকে ৪০ কোটি মানুষ দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করছে।

যাই হোক, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ও সর্বাত্মক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হলে, যে আশু সমস্যা সমাধান জরুরি, সেগুলি হল—সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আরও সহায়ক আইন প্রণয়ন, ব্যবসা ও বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে অনুকূল ও উন্নততর পরিকাঠামো গড়ে তোলা, কর্মীবাহিনীর ব্যাপক দক্ষতা ও উৎকর্ষ উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়নখাতে আরও অনেক বেশি খরচ করা এবং ছোটখাট ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিদের জন্য বেশি পরিমাণে উৎসাহদায়ী আর্থিক মঞ্জুরি। আগামী দিনে, ধাপে ধাপে এই সব সমাধানমূলক প্রস্তাবগুলি রূপায়িত করতে পারলে ভারতের জাতীয় অর্থনীতির অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেক বেশি 'জ্ঞানের আলো' ছড়িয়ে পড়বে—সেরকম আশা করাই যেতে পারে।❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

উদ্ভাবন বিপ্লব

ভারতের বৈচিত্রের সদ্ব্যবহার

ভারতবর্ষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মাপকাঠিতে অদ্বিতীয় যত বেশি বৈচিত্র, তত বেশি সম্ভাবনা না কি বৈচিত্রই সংঘাতের মূল। এই বিবাদ সংক্রান্ত বহুমাত্রিক আলোচনা করছেন **বিজয়কুমার কল।**

ভারতের প্রথম আন্তঃগ্রহ অভিযান মঙ্গলযান, ২০১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সফলভাবে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। এই মঙ্গলযান সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর ভারত একটা জি.এস.এল.ভি. রকেটও সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করেছে। এ সবই হল ভারতের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সাম্প্রতিক প্রকাশ। মঙ্গলযান সংস্থাপনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা)। উদ্ভাবনটি রীতিমতো কম খরচের। স্বাস্থ্য পরিষেবাসহ কিছু কিছু শিল্পক্ষেত্রে ভারত এধরনের স্বল্পব্যয়ের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। যেমন বেঙ্গালুরুর অরবিন্দ আই কেয়ার সিস্টেম প্রতি বছর প্রায় ৩,৫০,০০০ অত্যন্ত উচ্চমানের অস্ত্রোপচার করে, অবাক করে দেওয়ার মতো কম খরচে। কম খরচে ডা. দেবী শেট্টির হার্ট সার্জারি মডেল, ডা. শেট্টির জয়পুর (কৃত্রিম) পা, জি.ই.-র স্থানান্তরযোগ্য ই.সি.জি. মেশিন, কেরালার উপশমকারী (ভেষজ) চিকিৎসা, অরো ল্যাবের চোখের লেন্স। এমন কয়েকটি সুলভ মূল্যের উদ্ভাবনের নমুনা, যার জন্য ভারতীয় চিকিৎসা মহল রীতিমতো গর্বিত। অন্যান্য নানা শিল্প ক্ষেত্রে এমনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ কম খরচের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে এ দেশেই। যেমন মোবাইল ফোনের স্বল্প মাশুল, কম দামের মাটির রেফ্রিজারেটর, টাটা 'স্বচ্ছ' পানীয় জল শোধন ব্যবস্থা, তুষের সাহায্যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি।

ভারতে এমন মিতব্যয়ী (ফ্রুগাল) উদ্ভাবন সৃষ্টি হচ্ছে কীভাবে? যদিও ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকাঠামো সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তবে এ সংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত ভারতের দক্ষিণাংশে গড়ে উঠেছে। বিশেষত কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে। কম দামের অথচ উচ্চ গুণমানের সফ্‌টওয়্যার সলিউশন নির্মাণের ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পোদ্যোগগুলির সংখ্যাও এই রাজ্যগুলিতে বেশি এবং এসব জায়গায় যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তাও খুবই উচ্চমানের। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু (পূর্বতন ব্যাঙ্গালোর, যে শহরকে পূর্বে অবসর গ্রহণকারীদের আবাসস্থল বলা হত) এখন ভারতের 'সিলিকন ভ্যালি' হিসেবে সম্মানিত। কারণ ভারতের সফ্‌টওয়্যার উদ্ভাবনের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চ প্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগগুলি এই শহরেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভারতের অন্যান্য অংশেও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করে উচ্চ গুণমানের অথচ কম দামের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে চলেছে। এসব থেকে বোঝা যায় যে ভারত প্রথাগত সুসংহত উদ্ভাবন ও মিতব্যয়ী উদ্ভাবন—উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী। আর এ দেশের জন্যে উভয় প্রকার উদ্ভাবনই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতই বিভিন্ন উদ্যোগপতি এবং প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের স্বল্পমূল্যের সামগ্রী উৎপাদনের দিকে চালিত করেছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে এবং আর্থ-সামাজিক বিচারে ভারতের বৈচিত্র বহুধাবিস্তৃত। এ দেশের বহু বছরব্যাপী আর্থ-সামাজিক সংকট এখানে এধরনের সুলভ সামগ্রী উৎপাদনের উদ্ভাবনের জন্যে গতিশীল গবেষণাগার সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ কাজে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগপতিরা একসঙ্গে একটা লক্ষ্য অর্জন করতে সচেষ্ট। সীমিত সম্পদ নিয়ে গবেষণা, নকশা তৈরি, তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অবেশেষে সাধ্যের নাগালে সমাধান লাভ করাই এই কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকেই মিশন-ওরিয়েন্টেড (লক্ষ্যভিত্তিক) উদ্ভাবন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এর বিস্তার সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে, সরকারি আর্থিক মদতপুষ্ট মহাকাশ ও প্রতিরক্ষাক্ষেত্র সংক্রান্ত বা, অসরকারি এমনকী মানবকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাসমূহ ব্যাপী।

ভারত বিগত ছেষট্টি বছরের মধ্যে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতিলাভ করেছে, বহুমুখী শিল্প-বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছে, শক্তিশালী পরিষেবা ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে এবং কৃষিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। এসব কৃতিত্ব সত্ত্বেও ভারতে এখনও বিপুল সংখ্যক দরিদ্র, নিরক্ষর এবং কর্মহীন মানুষ বসবাস করে। এক বিরাট অংশের মানুষ এখনও স্বচ্ছতা, পানীয় জল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বিদ্যুতের মতো বুনিয়াদি স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত। এমনকী এই অনুজ্জ্বল চিত্রটির ভবিষ্যৎও রীতিমতো তমসাচ্ছন্ন, কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন আগামী দশকগুলিতে অসাম্যজনিত এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলবে।

প্রকৃতির বাস্তুতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা, জনসাধারণের প্রত্যাশা এবং ভারতের বিপুল সম্পদের কথা মাথায় রেখে অভ্যন্তরীণভাবে এসব সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী কতিপয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ভারতের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। বৈচিত্রই সংঘাতের জনক—এমন একটা বিতর্ক মাঝে মাঝে শোনা যায়। এই আলোচনায় বৈচিত্র এবং উদ্ভাবনের মধ্যে একটা সদর্থক সম্পর্ক বিদ্যমান, এটাই প্রতিপাদ্য। অবশ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা এই সম্পর্ক স্বীকৃত এবং সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল বৈচিত্র এবং উদ্ভাবনের মধ্যে একটা গঠনমূলক সম্পর্ক তুলে ধরা।

দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে দেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তুলছে দেশের নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব,

সেটা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী। 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' থেকে 'গঙ্গা নির্মলকরণ', 'ভারতে নির্মাণ করুন' থেকে 'ত্রুটি শূন্য এবং প্রতিক্রিয়া শূন্য'—সাম্প্রতিককালে গৃহীত এসব সরকারি উদ্যোগ সঠিক দিশায় পদক্ষেপ। ভারতের সামনে সমস্যাসমূহ জটিল এবং বহুমাত্রিক। সর্বসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এবং সর্বস্তরের অংশীদারদের উৎসাহিত ও আগ্রহী করে তুলে সমস্যার সমাধানের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট ইতিবাচক। এসব ছোট ছোট পদক্ষেপে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। দারিদ্র বেকারত্ব, অস্বাস্থ্য, বিদ্যুতের অভাব, পানীয় জলের সংকট ইত্যাদি সমস্যাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। অতীতেও অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন সেগুলিকে সুসংহত করা। অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে রচনা করতে হবে আগামী প্রকল্প। এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগগুলি হবে সুসমন্বিত। ভারতে একটা উদ্ভাবনী বিপ্লব (Innovation Revolution in India—IRiI) হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্ভাবনী বিপ্লব বা IRiI (যাকে উচ্চারণ করা হয় 'ইরি') বহুমাত্রিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুলভ উদ্ভাবনের সমষ্টি বলা যেতে পারে। জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমন উদ্ভাবন-পটু নেতৃত্ব সৃষ্টি করা দরকার, যারা আগামী দিনে সুলভ উদ্ভাবনের জন্য মরিয়া চেষ্টার সূচনা করবে। স্থানীয় এবং আঞ্চলিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সমস্যাসমূহের সমাধান করতে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক উদ্যোগপতিরা যাতে সমর্থ হন, সেটাই এই বিপ্লবের লক্ষ্য। কারণ একমাত্র স্থানীয় মানুষজনই সেখানকার অর্থনীতি, বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্বন্ধে অবহিত। সর্বোপরি, ভারতের যেমন সমস্যা সহস্রাধিক, তেমনি সহস্রাধিক সম্ভাবনাময় সমাধানকারীরও জননী সে।

'ভারতে উদ্ভাবনী বিপ্লব'-এর যে ধারণাটিকে অবলম্বন করে এই প্রতিবেদন, সেটি আপাতদৃষ্টিতে অতি সরল মনে হতে পারে। কিন্তু যদি এটিকে জাতির জিন এবং কর্মসংস্কৃতির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপনা দ্বারা শক্তি জোগানো যায়, তবে এই প্রচেষ্টা আগামী দিনে ভারতের বহুধা বিস্তৃত আর্থ-সামাজিক সমস্যা নির্মূল করতে সমর্থ হবে। আমাদের সদ্য নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতারা যেমন নানা গণআন্দোলনে সিদ্ধহস্ত, 'ইরি'-ও আগামী দিনে তেমনি স্থানীয় স্তরের প্রশাসন দ্বারা শক্তিশালীভাবে পরিচালিত এবং মূল্যায়ন করা এক গণআন্দোলন হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ দেশের আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র এবং সুলভ উদ্ভাবনের মধ্যেকার যোগসূত্রকে অনুধাবন করে উদ্ভাবনী উদ্যোগকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ভারতের বৈচিত্র

ভারত ভৌগোলিক বৈচিত্রের জন্য খ্যাত। এই বৈচিত্র এদেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বিদ্যমান। এদেশের নদী, জলাশয়, সমুদ্র, বনাঞ্চল, কৃষিজাত সামগ্রী, সবকিছুর মধ্যেই বৈচিত্র আছে। জনতত্ত্বের মধ্যেও ভারতে বিপুল বৈচিত্র। নানা সংস্কৃতি, নানা ধর্ম, বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, ভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা, খাদ্য, পোশাক, শিল্প, নৃত্যশৈলী, সংগীতের পরম্পরা, ছোট-বড়, গ্রাম কিংবা শহর, ধনী-নির্ধন, সকলেই মোটামুটি সাম্য এবং শান্তিতে বসবাস করে। ভারতের 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' এই বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটা প্রবহমান সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এই সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত আছে চিন্তাশক্তির উর্বরতা, উদ্ভাবনের সুলভতা এবং অর্থনৈতিক ও নৈতিকতা-নির্ভর মহাশক্তিধর আগামী ভারতের সম্ভাবনার আশা।

বৈচিত্রই ভারতের প্রধান শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। এই শক্তির সবচেয়ে উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ সৃষ্টির ঐতিহ্যে, যেমন সংগীত, সাহিত্য ও দর্শনের পরম্পরা, নৃত্যকলা, গণিত ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে নানা ক্ষেত্রের উৎকর্ষে। ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যেই বৈচিত্রের শক্তি প্রতিফলিত হয় এবং এই বৈচিত্র পরিচালনায় সহায়ক হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, যখনই এই বৈচিত্র অনুধাবনে ভ্রান্তি হয় কিংবা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে অপব্যাখ্যা করা হয়, তখনই দেখা দেয় উদ্বেগ, বিরোধ কিংবা সংঘাতের পরিস্থিতি। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে নানা নেতিবাচক প্রচার এড়ানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। এখন ভারতের বর্তমান অবস্থায় 'বৈচিত্র পরিচালনা' থেকে 'উদ্ভাবন পরিচালনা'-র দিকে এগোনোর পক্ষে সওয়াল উঠছে। ভারতে ব্রিটিশরাই প্রথম এই বৈচিত্রকে 'বিভাজন করে শাসন'-এর ('ডিভাইড অ্যান্ড রুল') নীতিতে কাজে লাগিয়ে কয়েক হাজার কিলোমিটার ব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য শাসন ও নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। এই সুবিশাল সাম্রাজ্য নানা সময়-মানমণ্ডলের আওতায় ছিল। আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতারা ভারত সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের ধ্যান-ধারণা, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক-রাজনৈতিক লক্ষণসমূহ অনুধাবন করে ভারতকে এক নতুন জাতি-সত্তা হিসেবে গড়ে তোলেন। এই নতুন ভারত তার বৈচিত্রকে চিহ্নিত এবং সঠিক পথে চালিত করে, এমনকী দেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বৈচিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে নীতি-নির্ধারণের চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এক অখণ্ড জাতি হিসেবে বর্তমান ভারত তার অন্তর্গত অভিন্ন সাংস্কৃতিক বন্ধন, অভিন্ন পরিচয়, সামাজিক রীতি-নীতি উত্তেজনা প্রশমনে কাজে লাগায়। বিরোধ ও সংঘাত নিরসনেও এসব সংহতি ক্রমাগত ভারতীয় সমাজকে সংস্কার এবং রূপান্তরের মাধ্যমে এক নতুন আকারের দিকে চালিত করছে। ভারতের এই বৈচিত্রকে বুনিয়াদিস্তরে উদ্ভাবনের বিপ্লব আনার কাজে লাগানো যেতে পারে এবং অবশ্যই সেটাই করা প্রয়োজন।

বৈচিত্র : সংঘাত বনাম উদ্ভাবন

ভারতে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন ভারতীয় বৈচিত্র-প্রসঙ্গ। কারণ বিজ্ঞদের মধ্যে বৈচিত্র কি শক্তির প্রেরণা, নাকি বৃহত্তর বিভেদ এবং অস্বস্তির কারণ—এ প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। বৈচিত্রের মধ্যেকার সহজাত বিরোধ এবং পার্থক্যের কারণে ভারতীয় সমাজে উদ্বেগ, বিরোধ এবং সংঘাত বিদ্যমান। বরং বহুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সংমিশ্রণ ও সহাবস্থানের ধারা জাতি-সত্তা, ভাষা, ধর্ম ও উপ-ধর্মীয় পরিচয়ের উপরে এক অনন্যতা আরোপ করেছে। এসব বিরোধ ও ভিন্নতাকে অঙ্গীভূত ও নিয়ন্ত্রণ করাটাই ভারতীয়

চিত্র-১ : বৈচিত্রকে আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের কাজে লিভার হিসেবে ব্যবহার

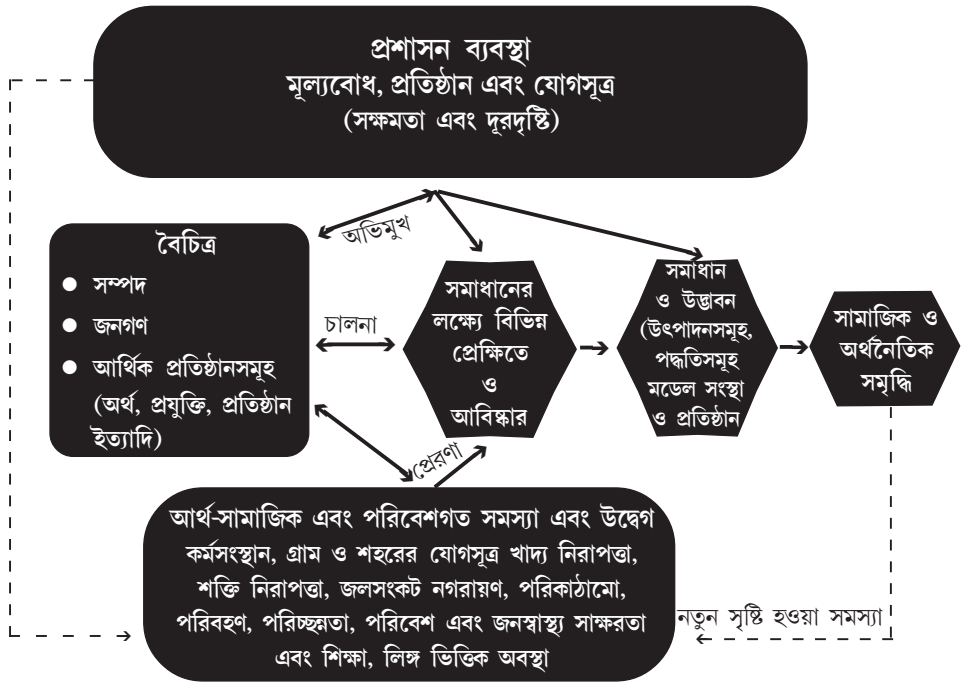

সূত্র : কল, ২০১৪

সমাজের সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। বহু মানুষ ও বহু সম্প্রদায় ভারত গঠন করেছে। আর এই বৈচিত্রই ভারতীয় অস্তিত্বরক্ষার প্রেরণা।

অনেকে দাবি করেন যে, বৈচিত্র এবং সামাজিক বন্ধন একে অপরের পরিপন্থী। আবার অন্য অনেকের বিশ্বাস, বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভালো বোঝাপড়া গড়ে ওঠার মূলে আছে নানা ধরনের মানুষের দীর্ঘ সময় জুড়ে সহাবস্থান। তাঁরা মনে করেন, বৈচিত্র শুধু অপ্রতিরোধ্যই নয়, বরং তা যথেষ্ট মূল্যবান সমৃদ্ধি-সহায়ক। বর্তমান প্রতিবেদনটি আরও এক ধাপ এগিয়ে এই মত ব্যক্ত করে যে, দূরদর্শী প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই বৈচিত্রকে এমন নানা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে পারে, যার দ্বারা দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান উদ্ভাবন সম্ভব হবে। এর ফলে দেশের সমাজ ও অর্থনীতি সমৃদ্ধতর হবে।[১]

চিত্র-১-এ আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান করে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিলাভ করার কাছে বৈচিত্রকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনও দক্ষ এবং দূরদর্শী প্রশাসন মানুষ, সম্পদ এবং সংগঠনসমূহের বৈচিত্রকে আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধানের যন্ত্র হিসেবে কাজে লাগায়। অন্যদিকে এই সব সমস্যা ইন্ধন হিসেবে কাজ করে। বৈচিত্র মানুষকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে চালিত করে এবং প্রেক্ষিতগুলি থেকেই উদ্ভাবনী সমাধান আবিষ্কারের চেষ্টা করে। সাধারণভাবে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমস্যা অনুধাবন করে, এবং নানাভাবে তার সমাধান খোঁজে। বৈচিত্র-প্রসূত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যে এক দক্ষ নেতৃত্বই এসব বৈচিত্রকে এক সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাতে পারে।

জটিল শহুরে পরিবেশে বৈচিত্রকে সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আর্থ-সামাজিক ফলাফল এবং সম্পর্কের বৈচিত্র গঠন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্র এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার একটা ভূমিকা রয়েছে। এখানে প্রশাসনের ধারণাটা ব্যাপকতর, যার মধ্যে সরকার ছাড়াও একাধিক কুশীলব অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বিভিন্ন অসরকারি প্রতিষ্ঠান (মুনাফাকারী এবং অমুনাফাকারী) রয়েছে যারা সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং রূপায়ণে যুক্ত। এটাই হল অংশগ্রহণমূলক এবং উন্মুক্ত গণতন্ত্র যেখানে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অসরকারি সংগঠন (সুশীল সমাজ, অসরকারি সংগঠন, তৃণমূলস্তরের আন্দোলনকারী) স্বকীয় বৈধ দাবি পেশ করতে পারে। এ ধরনের কাঠামো পাঁচমেশালি সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণীয়ভাবে টিকিয়ে রাখা দরকার, যেটা বৈচিত্রকে একটা সম্পদ, গতির উৎস, উদ্ভাবন, সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির হিসেবে অনুধাবন করার উপর নির্ভর করে।

বৈচিত্র বলতে যেটা মনে আসে, সেটা হল নরগোষ্ঠী, লিঙ্গ, জাতিসত্তা, শারীরিক সক্ষমতা, যৌন সম্পর্ক এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিন্নতা। অর্থনীতির ভাষায়, উদ্ভাবনের চাবিকাঠি থাকে মানুষের মস্তিষ্কে, তাই চিন্তা এবং মননে যত বৈচিত্র থাকবে, ততই মঙ্গল। ভিন্নতার শক্তির সম্ভাবনাকে গ্রহণ করতে হলে তাই মনের প্রসার দরকার। অর্থনৈতিক উন্নতির বীজ উদ্ভাবনের মধ্যেই নিহিত এবং উন্নতি নির্ভর করে সম্মিলিত বিভিন্নতার গড় সামর্থ্যের উপর। যদি সকলে একইরকম চিন্তা করে, তবে তারা স্থানীয়স্তরে অভিন্ন সমাধানসূত্রের মধ্যেই আটকে থাকবে। নতুন নতুন উৎকর্ষতর সমাধান বা উদ্ভাবনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। তাই বহুধাবিভক্ত সমাজে বৈচিত্রকে উদ্ভাবনের

ক্ষমতা হিসেবে দেখা হয়। আর এসব উদ্ভাবন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করে। পরবর্তী অংশে ভারতের উদ্ভাবনী ব্যবস্থা নিয়ে ভবিষ্যতের চর্চা করা হল।

ভারতে উদ্ভাবন ব্যবস্থা

ভারতের উদ্ভাবনী ব্যবস্থা সর্বদা বিবর্ধিত হয়ে আসছে। এক বিরাট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে সরকারি ক্ষেত্র ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যেই গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উদ্ভাবনী ব্যবস্থার কেন্দ্রে আছে লক্ষ্য-ভিত্তিক গবেষণা, যেখানে প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৮০-র পরে অসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি একাজে অংশগ্রহণ করা শুরু করে, যার মধ্যে ওষুধ শিল্প অগ্রগণ্য। ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ ও বিশ্বায়ন এবং ১৯৯০-এর পরে তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব পরিষেবা ক্ষেত্রের উদ্ভাবনকে শক্তি জুগিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে ভারতকে জায়গা করে দিয়েছে। বিজ্ঞমহল এটাও লক্ষ্য করেছে যে, যে সব শর্ত উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করে, তার মধ্যে আছে 'ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রতিযোগিতা, গবেষণা ও শিল্প সংস্থাগুলোতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চনমনে উচ্চাভিলাষী তরুণদল, স্বল্পমূল্যের তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বকেন্দ্র, মুক্ত এবং স্বাধীন সমাজের অস্তিত্ব, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের শিরোপা, পরিবর্তনশীল মূলধন বাজার এবং তার সঙ্গে অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল বৈচিত্র ও তৎসহ গবেষণার পরিকাঠামো'।[২]

ভারতের অর্থনৈতিক উদ্ভাবন এখন বিপরীত কারিগরি (রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং), বৃদ্ধিসহায়ক পদ্ধতি উদ্ভাবন থেকে সরে এসে মিতব্যয়ী (ফ্রুগাল) উদ্ভাবনের দিকে এগিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং ওষুধ শিল্প তথা প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য দেশের তরুণ ও দক্ষ উদ্যোগপতিদের সামাজিক উদ্ভাবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী করে তুলেছে এবং সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলির হাতের নাগাল পর্যন্ত পরিষেবা পৌঁছানোর জন্য উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করেছে। স্বল্পব্যয় অভিমুখী উদ্যোগ হল 'হানি বি' নেটওয়ার্ক। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, আমেদাবাদের ডঃ অনিল এটা প্রথম শুরু করেছিলেন। এই নেটওয়ার্কে বিনিয়োগকারী, উদ্যোগপতি, কৃষক এবং বিশেষজ্ঞরা সমাজের ভালোর জন্যে জ্ঞান বিনিময় করেন।

ভারতে উদ্ভাবন চালু করবার জন্যে মিতব্যয়ের উদ্ভাবন ব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সংযোগ সাধন করা দরকার। মিতব্যয়ের উদ্ভাবন হল বিরূপতম পরিবেশে সুযোগ সন্ধানের সাহসী পন্থা, যাতে দক্ষতার সঙ্গে খুব সরল অথচ ব্যতিক্রমী উপায়ে সম্পদকে ব্যবহার করে সমাধান লাভ করতে হয়। নেতা এবং উদ্যোগপতিদের অবশ্যকর্তব্য হল :

- এক, জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা এবং মূল্যবোধ অনুধাবন করা;
- দুই, এমন এক উদ্যোগমুখী বাস্তুতন্ত্র সৃষ্টি করা, যাতে অন্যান্য কোম্পানির অংশীদারিত্বের সুযোগ থাকবে, বিশেষত সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে অসরকারি সংগঠনগুলি (NGO) এবং
- তিন, এমন এক তথাকথিত 'ইনোভেশন স্যান্ডবক্স' পরিচর্যা করা দরকার যাতে নতুন চিন্তাভাবনা উৎসাহ পায়।[৩]

প্রথম শর্ত স্বয়ংস্বচ্ছ। উদ্ভাবিত সমাধান যেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্যে প্রাসঙ্গিক হয়। দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ উদ্যোগমুখী বাস্তুতন্ত্র সৃষ্টি বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হল। শেষ শর্ত, অর্থাৎ 'ইনোভেশন স্যান্ডবক্স' প্রসঙ্গটি হল, উদ্ভাবিত পণ্য বা পরিষেবার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা এবং তৎসম্পর্কিত আর্থিক ও পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলি প্রতিরোধ করা। সমাজের নিম্নস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষকে লক্ষ করে উদ্ভাবিত সামগ্রীর প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য হল:

ক) পণ্যটি পরিমাপযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়;

খ) পণ্যটি দামের সঙ্গে কার্যকারিতার সাযুজ্য থাকা বাঞ্ছনীয়;

গ) পণ্যটি আধুনিক এবং সংকর (হাইব্রিড) প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়া উচিত; এবং

ঘ) গুণমান, নিরাপত্তার মান এবং টেঁকসই হওয়ার নিরিখে বিশ্বমান অর্জন করা উচিত।

উদ্যোগমূলক বাস্তুতন্ত্র দৃঢ়করণ

সামাজিক মঙ্গলের অবদানের স্বার্থে উদ্যোগপতিদের একটা অনুকূল পরিবেশ এবং সহায়ক উদ্যোগমূলক বাস্তুতন্ত্র দরকার। একটা উদ্যোগের সাফল্য সেটি যে উদ্যোগমূলক বাস্তুতন্ত্রের অঙ্গ, তার উপর নির্ভরশীল। বাস্তুতন্ত্রটির মধ্যে আছে একটি সুনির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী, যারা মুখ্য অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত। যেমন সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠন, উপভোক্তা, বিনিয়োগকারী, আর্থিক বাজার, মূলধনি বাজার, জাতীয় এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি তথা প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। উপযুক্ত উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উদ্যোগকে প্রভাবিত করে এবং পক্ষান্তরে উদ্যোগমূলক বাস্তুতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই উদ্ভাবন বিপ্লব, ভারতের সংরক্ষণ করা উচিত।

একটি উত্তম উদ্যোগমূলক বাস্তুতন্ত্র সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাবন এবং উৎকর্ষকে মর্যাদা দেয়, গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অংশীদারিত্ব গঠনের পথ সুগম করে তোলে এবং নতুন অভিপ্রায় ও প্রযুক্তি, যা বাজার ধরতে সফল হয়, সেটা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের বাস্তুতন্ত্র উচ্চ প্রযুক্তিযুক্ত উদ্যোগপতিদের আকৃষ্ট করে, কারণ তারা দ্রুত সাফল্য অর্জনের আশা দেখতে পায়। একটা ভালো উদ্যোগমূলক বাস্তুতন্ত্র স্থানীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগও আকৃষ্ট করে। ফলে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয়স্তরে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। ভারতে এ ধরনের উদ্যোগমূলক বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান, কিন্তু এগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তোলা দরকার যাতে দেশে উদ্ভাবন বিপ্লব সম্ভব হয়। এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন[৪]:

- সরকার এবং তার অধীনস্থ সংগঠনগুলির শিল্পোদ্যোগের পথ সুগম করার লক্ষ্যে অতিসক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নিম্নবর্ণিত সহযোগিতাসমূহ নিশ্চিত করা দরকার:

ক) প্রাথমিক পর্যায়ের বিনিয়োগকারী, তাদের উদ্যোগ, বীজ-মূলধন এবং পরবর্তী বিনিয়োগকারী চিহ্নিত করা;

খ) প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন উদ্যোগগুলিকে উৎসাহদানের প্রকল্পের জন্য পরিকাঠামো গঠন ও বিস্তার করা;

গ) প্রবেশ ও বহির্গমনের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন সরলীকরণের মাধ্যমে উদ্যোগমূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা;

● অংশীদারি মূলধন এবং ঋণগ্রহণের পথ সুগম করার লক্ষ্যে:

ক) অভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা দূর করা;

খ) প্রাথমিক স্তরে উদ্যোগগুলিকে মূলধন জোগানোর লক্ষ্যে 'ফান্ড অব ফান্ডস (FOF)' গঠন করা;

গ) ঋণদান ব্যবস্থার বিস্তার ও উন্নতিবিধান করা।

● উদীয়মান শিল্পোদ্যোগে আগ্রহী প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংস্থা এবং শিল্পসংস্থাগুলিকে শামিল করে উদ্যোগমূলক শিল্পকেন্দ্র সৃষ্টি ও উন্নীতকরণ করা;

● পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগের উৎসাহ প্রদান করার সংস্কৃতি সূচনা করা;

● এমন কার্যকরী এবং যথাযথ সংযোগক্ষেত্র সৃষ্টি করা, যেখানে পারস্পরিক আগ্রহসম্পন্ন সকল অংশীদারগণ সম্মিলিতভাবে তাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃহত্তর পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

উপসংহারের পর্যবেক্ষণ

যে সমাজ পণ্য, পদ্ধতি, মডেল, সংগঠন বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনে অগ্রগণ্য, সেই সমাজই বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সমাজের অংশীদার হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করার বোধেরও বিকাশ ঘটছে। সাম্প্রতিক যুব সম্প্রদায় ভারতের মতো একটা উন্নত দেশের নাগরিক হিসেবে গর্বিত।কারণ, মঙ্গলের কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপন, জি.এস.এল.ভি. বাণিজ্যিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিশাইল এবং অগ্নি-৫ উৎক্ষেপণে ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্য। এসব যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রত্যেক ভারতীয় এসব সাফল্যের জন্যে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গর্ব অনুভব করে। যদিও আত্মতুষ্টির চাইতে নতুন পণ্য ও পদ্ধতি আবিষ্কার কিংবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আরও বেশি বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

বৈচিত্রের কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকেও পণ্য, পরিষেবা এবং তা পৌঁছে দেওয়ার দক্ষতার মাধ্যমে বিচিত্র সমাধান করা সম্ভব। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোও পণ্য, পরিষেবা এবং সরবরাহশৃঙ্খল গঠনের কাজে এই বৈচিত্রকে কাজে লাগাচ্ছে। ফলে মেধা এবং সক্ষমতার শুভ সমাহারে প্রাপ্ত উদ্ভাবন ও নতুন শক্তি লাভ হচ্ছে। যেকোনও উদ্ভাবনী সমাজেরই মূল শর্ত হল, মেধা এবং সক্ষমতার বৈচিত্র। ভারত এ বিষয়ে যথেষ্ট ধনী। এখন যেটা দরকার, তা হল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এই সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করা। যখন কেউ প্রশ্ন তোলেন, ভারতের এই বিপুল বৈচিত্র সত্ত্বেও সে তার নিজের সমস্যা নিজে সমাধানে সক্ষম নয় কেন, তখন দোষ চাপানো হয় উদ্ভাবনী সমাজসৃষ্টিতে বৈচিত্রের সম্ভাবময় ভূমিকা অনুধাবনে প্রশাসনের ব্যর্থতার উপর। উদ্ভাবন সক্ষমতার কোনও অভাব নেই এদেশে। অভাব শুধু দূরদৃষ্টি এবং সঠিক বাস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জলবায়ুর পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংকটের কারণেই 'অ্যাকশান প্রোগ্রাম অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্পের ঘোষণা। এমন আরও অনেক প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে, যেগুলো রূপায়িত হচ্ছে। তথাপি দেশের সার্বিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনে গতি আনবার জন্যে এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে কোনও সমন্বয় বা যোগসূত্র রচিত হয়নি। জলবায়ুর পরিবর্তন একটা সর্বজনীন সংকট। সাধারণ মানুষ, দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান—সকলকে এই সংকট মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে শামিল করা যেতে পারে। এমনকী বর্তমান জীবনশৈলীও বদলে ফেলা সম্ভব। উদ্ভাবন অভিলাষী সমাজ গঠনের জন্য চাই স্বচ্ছ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দৃঢ় নেতৃত্ব, কার্যকরী সরকারি নীতি এবং সার্থক ও সর্বত্রব্যাপী রূপায়ণ।

পরিশেষে, জনসাধারণ যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করে, তার জন্য তাদের যথার্থ উদ্ভাবনের চিন্তা ও সম্ভাবনার বিকাশ প্রয়োজন। আর এই বিকাশের পথ সুগম করার জন্য নীতি নির্ধারক থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে লভ্য যাবতীয় অধীত বিদ্যা একত্রিত করে বিশ্লেষণ করার পর সমাজ নির্ভর প্রগতির স্বার্থে সততা দায়বদ্ধতার সঙ্গে তাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশজুড়ে উদ্ভাবনের গতিসঞ্চার প্রয়োজন। তার সঙ্গে মননশীলতা এবং সমাধান উদ্ভাবনে দেশের যুব সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করা দরকার।

যুব সম্প্রদায়কে উদ্ভাবনের শিক্ষা, পছন্দের বিষয় বেছে নেওয়ার সুযোগের নমনীয়তা এবং অভীষ্ট উদ্যোগধর্মী লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। সৃষ্টিশীল এবং উদ্ভাবনমূলক কাজের সমন্বয়ে যাতে সমাজের সকল অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত নেটওয়ার্ক দরকার। পাশাপাশি দরকার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন। বই-নির্ভর, পরীক্ষা-সর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। মননশীল ভাবনা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যার উদ্ভাবনমূলক সমাধান অনুসন্ধানে ছাত্র সমাজকে উৎসাহিত করতে হবে। বৈচিত্রই হল সেই সম্পদ, যাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক সংকটসমূহের সমাধানসহ সার্বিক মঙ্গল সম্ভব।❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী প্রমোদ যোশী, ড. অনন্যা ঘোষদস্তিদার ও ড. যামিনী গুপ্ত।

[লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিজনেস ইকোনমিকস্'-এর বিভাগীয় প্রধান।
email : kaulvijay@yahoo.com]

উল্লেখপঞ্জি :

১. বিজয়কুমার কল, ইন্ডিয়ান ডাইভারসিটি: ফ্রম কনফ্লিক্টস টু ইনোভেশন, ওয়ার্কিং পেপার, এস.এস.আর.এন. জুন, ২০১৪।

২. পঙ্কজ শর্মা ও অন্যান্য, ইন্ডিয়া'জ ন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল ইনোভেশন সিস্টেম: চ্যালেঞ্জেস, অপরচুনিটিজ অ্যান্ড রেকমেন্ডেশনস ফর পলিসি মেকারস, ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইনোভেশন, ভ্যলুম ১৯, নম্বর ৬৫১৭-৫৩৭, আগস্ট ২০১২।

৩. প্রীতম ব্যানার্জি এবং আনা এন লির্নার, এমব্রেসিং দি বটম অব দি পিরামিড উইথ ফ্রুগাল ইনোভেশন, ব্রান্ডিস ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল, ২০১৩।

৪. ক্রিয়েটিং অ্যা ভায়েব্রান্ট এন্ট্রেপ্রিনিয়ার ইকোসিস্টেম ইন ইন্ডিয়া, রিপোর্ট অব দি কমিটি অন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড আর্লি স্টেজ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, জুন, ২০১২, যোজনা কমিশন, ভারত সরকার।

সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা

একটি রূপরেখা

সাংসদদের একটি করে গ্রাম উন্নয়নের জন্য বেছে নেওয়ার লক্ষ্যে একটি কর্মসূচির খসড়া সম্প্রতি তৈরি করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। 'সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা' (SAGY) নামে এই কর্মসূচিটির আওতায় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার জনবসতিপূর্ণ এক একটি গ্রাম বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সমতল এলাকাগুলিতে। অন্যদিকে পার্বত্য এলাকায় ১ হাজার থেকে ৩ হাজার জনবসতিপূর্ণ একটি গ্রামকে বেছে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বেছে নেওয়া এক একটি গ্রামকে ২০১৬ সালের মধ্যে 'আদর্শ গ্রাম' বা 'মডেল ভিলেজ'-এ রূপান্তরিত করার রূপরেখা তৈরি হয়েছে। পরে ২০১৯-এর মধ্যে সাংসদদের বেছে নিতে হবে আরও দুটি করে গ্রাম। টাকা-পয়সা লেনদেনের কোনও কর্মসূচি এটি নয়, বরং জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই চাহিদা ভিত্তিক এই কর্মসূচিটি রূপায়িত হতে চলেছে। বর্তমানে দেশে সংসদের উভয় কক্ষ মিলিয়ে মোট সাংসদ সংখ্যা আটশো। সুতরাং তিন বছরে আড়াই হাজারের মতো গ্রামকে এই বিশেষ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্যগুলি যদি তাদের সংশ্লিষ্ট বিধায়কদেরও এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে, তাহলে ওই তিন বছরে ৬ থেকে ৭ হাজার গ্রাম আদর্শ গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার রূপরেখা অনুযায়ী, সাংসদদের দায়িত্ব হবে একটি গ্রামের উন্নয়নের ছক বা প্রকল্প তৈরি করে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের এই কাজে শামিল হতে উৎসাহিত করে তোলা। সাংসদদের স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন (MPLAD) তহবিল থেকে এই কাজে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা এবং জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য যে অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে তার জোগান আসবে কর্পোরেট ক্ষেত্রগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্প থেকে।

সমগ্র কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মানবিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক—গ্রাম জীবনের এই চারটি বিশেষ দিকের সামগ্রিক বিকাশ তথা উন্নয়ন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিকাশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল পরিচ্ছন্নতা, সাংস্কৃতিক পরম্পরা তথা ঐতিহ্য এবং আচরণগত পরিবর্তন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা—এগুলি হল মানবিক বিকাশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক। অন্যদিক অর্থনৈতিক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা, দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা ও সুযোগসুবিধা এবং প্রাথমিক সুযোগসুবিধা ও পরিষেবার প্রসার। সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে সেগুলি হল স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব বা মানসিতাকে উৎসাহদান, সামাজিক মূল্য ও নীতিবোধ, সামাজিক ন্যায় ও সুপ্রশাসন। এছাড়াও পরিবেশ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, সুপ্রশাসন এবং প্রাথমিক সুযোগসুবিধা ও পরিষেবার প্রসার—উন্নয়নের এই সমস্ত দিকও সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনায় গুরুত্ব পাবে।

সামগ্রিকভাবে মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে সেগুলি হল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্চা সকলের জন্য উন্মুক্ত করা, যার মধ্যে থাকবে হেল্‌থ কার্ড ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ, সার্বজনীন টিকাদান, লিঙ্গানুপাতের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে ভারসাম্য বজায় রাখা, পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রসারের ব্যবস্থা করা, সকলের জন্য উন্নত পুষ্টির জোগান, বিশেষত কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া ইত্যাদি (এর মধ্যে আবার শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশেষ যত্নের কথাও বলা হয়েছে)। এছাড়াও, দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষা উন্মুক্ত করা, বিভিন্ন বিদ্যালয়কে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাযুক্ত ক্লাসরুম সহ স্মার্ট স্কুলে রূপান্তরিত করা, ই-লাইব্রেরি গড়ে তোলা, গুণগত শিক্ষার প্রসারের জন্য সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ইন্টারনেট-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ই-সাক্ষর করে তোলা, বয়স্ক সাক্ষরতার ব্যবস্থা করা, ই-সাক্ষরতা এবং ই-লাইব্রেরি সহ গ্রামীণ পাঠাগার গড়ে তোলাও মানব উন্নয়নের আরও কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কর্মসূচির সামাজিক উন্নয়নের দিকটিসহ লক্ষ রাখা হবে আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর। তা হল গ্রামের প্রধান ও বয়স্কদের প্রতি মর্যাদাদান, স্থানীয় মহিলা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের মধ্য থেকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করা, হিংসা ও অপরাধের ঘটনা মুক্ত গ্রাম্য পরিবেশ গড়ে তোলা ইত্যাদি। এ জন্য গঠন করা হবে নাগরিক কমিটি এবং আয়োজন করা হবে যুব সম্প্রদায় সহ সকলের জন্য জনসচেতনতা প্রসার অভিযান, গ্রামীণ ক্রীড়া ও লোকশিল্প কলা অনুষ্ঠান ও উৎসব, গ্রামবাসীদের মধ্যে গৌরবের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে গ্রাম-সংগীত রচনা, 'গ্রাম দিবস' পালন ইত্যাদির। এছাড়া তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিভুক্ত গ্রামবাসী সহ সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত সমস্ত ধরনের মানুষের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।

সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার আওতায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচিতে রয়েছে কৃষি এবং গবাদি পশুপালন ও উদ্যানচর্চা সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রে রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করা, অর্গানিক কৃষিচর্চা-কৃষিকাজ, মাটির জন্য হেল্‌থ কার্ড, শস্যচাষ বৃদ্ধি, বীজাগার অর্থাৎ সিড ব্যাংক স্থাপন, গাছ বা কাঠ ব্যতিরেকে অন্যান্য বনজ উৎপাদনের ব্যবস্থা, গবাদি পশুপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন, গোবর ব্যাংক স্থাপন, গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেগুলির উপযুক্ত থাকার ব্যবস্থা, অতিক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা এবং কৃষি-পরিষেবা কেন্দ্রের গঠন ও সম্প্রসারণ। একই সঙ্গে ফসল তোলার পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ, অতিক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা গঠন, দুধ উৎপাদন এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিকাশ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং চিরাচরিত শিল্প সংস্থাগুলির বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পায়ন সুনিশ্চিত করা হবে। কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা এবং পরিবেশ-পর্যটনসহ সমস্ত ধরনের গ্রামীণ পর্যটনের ওপরও এই কর্মকাণ্ডে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। কর্মসূচিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে দারিদ্রসীমার ওপরে নিয়ে আসাই এই অর্থনৈতিক উন্নয়নসূচির মূল লক্ষ্য। এ জন্য মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, সমস্ত ধরনের কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং অর্থনৈতিক সহায়তা সম্পর্কিত কাজকর্মকে উৎসাহ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচিতে রয়েছে সবুজায়নের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য পরিবেশ গড়ে তোলা। প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ি এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শৌচাগার গড়ে তোলা হবে এবং সেগুলি যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় তার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচিতে রয়েছে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের যথাযথ নিষ্কাশন, রাস্তার দু'দিকে বৃক্ষরোপণ, বাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি কার্যালয় ও অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় মানুষের পছন্দের ভিত্তিতে গাছপালা বসানো, চলাফেরার রাস্তার দু'দিকের সবুজায়ন, সামাজিক বনসৃজন, জল বিভাজিকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, নদীনালা, পুকুরসহ বিভিন্ন জলাশয়কে নতুন করে গড়ে তোলা, বৃষ্টির জলকে চাষের কাজে ব্যবহার এবং বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল উপযুক্ত কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। এর ফলে স্থানীয় অঞ্চলে মাটি, জল ও বায়ুর দূষণের মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচিতে যোগ্য সব কটি পরিবারের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে বার্ধক্যভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা ও বিধবাভাতা। এছাড়াও থাকবে আম আদমি বিমা যোজনা, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা (RSBY), সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS)। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সব কটি চিহ্নিত পরিবারের জন্যই। এছাড়া গ্রামের চিহ্নিত পরিবারগুলির জন্য, প্রাথমিক সুযোগসুবিধা ও পরিষেবারও প্রসার ঘটানো হবে। এর মধ্যে রয়েছে গৃহহীন দরিদ্র পরিবার এবং কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারগুলির জন্য পাকা অর্থাৎ স্থায়ী গৃহনির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বাড়িতে বাড়িতে জলের কল বসিয়ে পাইপ লাইনের সাহায্যে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ, ঢাকা ড্রেন ও নর্দমাসহ সমস্ত রকম আবহাওয়ায় উপযোগী চলাচলের রাস্তা, মূল রাস্তা বা সড়ক বরাবর যে কোনও ধরনের আবহাওয়ার উপযোগী চলাচলের পথ নির্মাণ, সব কটি গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ, সৌরবিদ্যুৎসহ অন্যান্য উৎস থেকে গ্রামের রাস্তা আলোকিত করা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ও গ্রন্থাগারের জন্য স্থায়ী পাকা পরিকাঠামোও গড়ে তোলা ইত্যাদি। কম্যুনিটি হল, স্বনির্ভর সংস্থাগুলির ঘরবাড়ি, খেলার মাঠ, সমাধিস্থান ও শ্মশান—সর্বত্র থাকবে নাগরিক পরিকাঠামোর ব্যবস্থা। গ্রামের হাটবাজার, সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা কেন্দ্র, ছোট ছোট ব্যাংক, ডাকঘর ও এটিএম-এরও ব্যবস্থা থাকবে গ্রামবাসীদের জন্য এবং তা সাজিয়ে তোলা হবে যথোপযুক্ত পরিকাঠামোর সাহায্যে। আর থাকবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র, টেলি যোগাযোগ এবং জনসাধারণকে প্রয়োজনে যাতায়াত করতে হয় এমন সব কটি স্থানে ক্লোজসার্কিট টিভির (CCTV) ব্যবস্থা।

এরপর রয়েছে সুপ্রশাসনের বিষয়টি। এই কর্মসূচির আওতায় শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সক্রিয় তথা তৎপর ও কর্মদক্ষ গ্রামসভা গড়ে তোলা হবে। ব্যবস্থা থাকবে প্রত্যেকের জন্য অভিন্ন পরিচয় পত্রের (UIDAI কার্ড)। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নাগরিক পরিষেবা চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা প্রদান, প্রতিটি গ্রামসভার পূর্বে মহিলা গ্রামসভার বৈঠক, বছরে অন্তত চারবার গ্রামসভার বৈঠক আহ্বান, তিন মাস অন্তর বাল্যসভার আয়োজন ইত্যাদির ওপরও এই কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হবে। সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসূচি রূপায়ণের হালহকিকত জনসাধারণকে জানানোর ব্যবস্থা থাকবে সরকারি ওয়েবসাইট, দেওয়াল লিখন ও নোটিশ বোর্ডে স্থানীয় ভাষায় দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, উপকৃতদের নামের তালিকা, নির্দিষ্ট কর্মসূচি ভিত্তিক বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব এবং তথ্য সরবরাহকারী গ্রাম পঞ্চায়েতের হদিশও পাওয়া যাবে ওই সমস্ত তথ্যে। জনসাধারণের পেশ করা অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তিরও ব্যবস্থা থাকবে সুপ্রশাসন কর্মসূচির আওতায়। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে দায়ের করা অভিযোগগুলির প্রাপ্তি স্বীকারও করা হবে দিন তারিখের উল্লেখসহ। তিন সপ্তাহের মধ্যে ওই অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে এবং লিখিতভাবে তা জানানোও হবে। জনসাধারণ যাতে খোলাখুলি তাদের অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার পেতে পারেন সেজন্য, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে ব্যবস্থা থাকবে ৬ মাস অন্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসূচি রূপায়ণ সম্পর্কিত সামাজিক হিসেবনিকেশের (সোশ্যাল অডিট)। বলা বাহুল্য এই কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে গ্রামসভাগুলিও।❑

‘ভারতেই তৈরি করুন’—একটি নীতিগত উদ্যোগ

নতুন উদ্যোগ

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ অর্থাৎ ‘ভারতেই তৈরি করুন’—এই উদ্যোগটির সূচনা করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-তে।

এদেশে বিনিয়োগকে আরও সহজ করে তুলতে, উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহিত করতে, মেধাসম্পদ রক্ষা করতে এবং সব থেকে সেরা উৎপাদন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ‘ভারতেই তৈরি করুন’—এই উদ্যোগের আওতায় বেশ কিছু নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার বিষয়টিকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। শিল্প লাইসেন্স এবং ২৪ ঘণ্টার শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কিত আবেদনের জন্য ‘ই-বিজ পোর্টাল’ নামে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, শিল্প লাইসেন্স-এর মেয়াদ বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়েছে, ‘বয়লারস অ্যাক্ট’-এর আওতায় আবেদনকারীদের নিজেদেরই শংসাপত্র অথবা তৃতীয় পক্ষের শংসাপত্র চালু করতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারগুলিকে; শিল্প লাইসেন্সের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষা উৎপাদনের প্রধান প্রধান সাজসরঞ্জামগুলিকে; সামরিক এবং অসামরিক—এই দুটি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় এমন ধরনের প্রতিরক্ষা সাজসরঞ্জামকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে; কেন্দ্রীয় সরকারের সব কটি মন্ত্রক ও দপ্তরকে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ‘ই-বিজ পোর্টাল’-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে; পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়া যাবে অনলাইনেই; বিধিনিয়ম সম্পর্কিত বাতাবরণ আরও সরল ও বাস্তবমুখী করে তুলতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সমস্ত কেন্দ্রীয় দপ্তর ও রাজ্য সরকারগুলিকে; অভিন্ন একটিমাত্র ফর্ম-এ সমস্ত রিটার্ন দাখিল করা যাবে অনলাইনে; যা যা করণীয় তার তালিকা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা দপ্তরের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে; ব্যবসার কাজে যে সমস্ত খাতাপত্র ব্যবহার করা হয় তার পরিবর্তন ঘটিয়ে একটিমাত্র ইলেকট্রনিক রেজিস্টারে তা নথিভুক্ত করা যাবে; সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানের অনুমতি ছাড়া পরিদর্শনের কোনও কাজ করা যাবে না এবং ঝুঁকি বা জটিলতাবিহীন ব্যবসার কাজে শংসাপত্র নিজে থেকেই দাখিল করার ব্যবস্থা চালু করা হবে।

নতুন নতুন পরিকাঠামো

নতুন স্মার্ট নগরী গড়ে তোলা এবং বেশ কিছু শিল্প একই জায়গায় স্থাপন করার জন্য নতুন পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যোগাযোগের সুযোগসুবিধা রয়েছে এমন শিল্প করিডোরগুলিতে এই সমস্ত শিল্প গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। ভারতকে উৎপাদন তথা নির্মাণ শিল্প কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নতুন কর্মসূচি রূপায়ণ ও সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কর্মক্ষম যুবকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের বিশেষ দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই কাজে সমন্বয়সাধনের জন্য একটি নতুন ‘জাতীয় শিল্প করিডোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ’ গঠন করা হয়েছে। সব কটি শিল্প করিডোরের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি রক্ষার কাজ করে যাবে এই বিশেষ সংস্থাটি। এছাড়াও, শিল্প করিডোরগুলির কাজকর্ম দেখভাল ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও বর্তাবে এই সংস্থাটির ওপর। দিল্লি-মুম্বই শিল্প করিডোরে ধোলেরা, সেন্দ্রা-বিদকি, গ্রেটার নয়ডা, উজ্জয়িনী এবং গুরগাঁও-তে পাঁচটি স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার কাজ চলছে। অন্যদিকে চেন্নাই-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডোর বরাবর পোন্নেরি (তামিলনাড়ু), কৃষ্ণপতনম (অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং টুমকুরে (কর্ণাটক) চলছে আরও তিনটি স্মার্ট নগরী গড়ে তোলার কাজ। জাপান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে দেশের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিকে অন্যান্য শিল্প করিডোরগুলির সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। নির্মাণ তথা উৎপাদন শিল্পের কাজকর্মকে আগে থেকেই উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন কিছু কিছু শিল্পগুচ্ছ গঠন করার কাজও চলছে। সংশোধিত শিল্প পরিকাঠামো উন্নীতকরণ কর্মসূচির আওতায় একুশটি শিল্প সংক্রান্ত প্রকল্পে ইতিমধ্যেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ‘জিরো লিকুইড ডিসচার্জিং’ পদ্ধতিতে এবং ‘কেন্দ্রীয় নিকাশি জল পরিশোধন’ প্রকল্পের সাহায্যে পরিশোধিত ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের ব্যবহারের ওপর এই প্রকল্পগুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে। সতেরোটি জাতীয় বিনিয়োগ ও নির্মাণ সংক্রান্ত জোন বা অঞ্চল গঠন করার কাজেও সম্মতি দেওয়া হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি সুযোগ-সুবিধার আরও প্রসার ঘটিয়ে মেধাসম্পদকে শক্তিশালী করে তোলা হবে। এজন্য বিশ্বমান ও অনলাইন পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আমেদাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন (NID)-কে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিতে আইন প্রণয়নের কথাও বলা হয়েছে। এর ফলে ডিজাইন এডুকেশন-এর ক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে NID ডিগ্রি প্রদান করতে পারবে এবং গবেষণার কাজকে উৎসাহ দিতে পারবে। এই ধরনের চারটি NID গড়ে তোলা হচ্ছে। ভারতীয় চর্মশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। হায়দরাবাদ, পাটনা, বানুর (পাঞ্জাব) ও আঙ্কেলেশ্বরে ফুটওয়্যার ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের চারটি নতুন শাখা স্থাপন করা হবে।

নতুন নতুন ক্ষেত্র

বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরও শিথিল করায় প্রতিরক্ষা, নির্মাণ ও রেলের মতো ভারতের উচ্চমানের শিল্পক্ষেত্র এখন বিশ্ববাজারের বিনিয়োগকারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতিরক্ষা নীতি আরও উদার করা হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রটিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪৯ শতাংশ। প্রতিরক্ষায় পোর্টফোলিও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অত্যাধুনিক ও সর্বোচ্চ মানের প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। রেলের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পরিকাঠামো প্রকল্পে নির্মাণ, কাজকর্ম এবং রক্ষণাবেক্ষণে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। এই সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলি হল সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতায় শহরতলির করিডোর প্রকল্প, উচ্চ-গতিসম্পন্ন ট্রেন চালু করার প্রকল্প, সুনির্দিষ্ট পণ্য চলাচল লাইন, রেলের কোচ ও ইঞ্জিন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা-সহ যাবতীয় রোলিং স্টক, রেল বৈদ্যুতিকরণ, সিগন্যাল ব্যবস্থা, পণ্য মাশুল টার্মিনাল, যাত্রী টার্মিনাল, রেলপথ ও সাইডিং সম্পর্কিত শিল্প পার্ক পরিকাঠামো, মূল রেলপথ ও মাস র‍্যাপিড ট্র্যান্সপোর্ট সিস্টেম (এমআরটিপি)-এর সঙ্গে সংযোগকারী বিভিন্ন প্রকল্প ইত্যাদি। নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নেও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিধিনিয়ম অনেক শিথিল করা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা 'ভারতেই তৈরি করুন' কর্মসূচিটি বিনিয়োগকারীদের প্রতি ভারতের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করে। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন শুধুমাত্র লাইসেন্স প্রদানকারী একটি দেশ হিসেবেই নয় বরং বাণিজ্যের একজন প্রকৃত অংশীদার হিসেবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশেষভাবে গড়ে তোলা একটি টিম প্রথমেই যাঁরা বিনিয়োগ করতে এদেশে আসবেন, শুরু থেকেই তাঁদের পথপ্রদর্শকের কাজে নিযুক্ত থাকবে এবং সমস্ত রকম সহায়তার জোগান দিয়ে যাবে। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির একটি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

নির্মাণ শিল্প সংক্রান্ত নীতি

ভারতীয় নির্মাণ শিল্পকে বিশ্ববাজারে আরও বেশি করে প্রতিযোগিতামুখী করে তোলা দেশের দীর্ঘমেয়াদি নিরন্তর বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, জাতীয় নির্মাণ সম্পর্কিত নীতিটি হল সরকার গৃহীত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সুসংবদ্ধ একটি পদক্ষেপ। বিধিনিয়ম, পরিকাঠামো, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, আর্থিক জোগান-সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সবকটি দিকেরই হদিশ রয়েছে এই নীতিটিতে। মাঝারি মেয়াদে নির্মাণ শিল্পে বছরে ১২ থেকে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এই নীতিতে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষেত্রে নির্মাণ শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পাবে ১৬ থেকে ২৫ শতাংশের মতো। নির্মাণ শিল্পে অতিরিক্ত ১০ কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ২০২২ সালের মধ্যেই। একইসঙ্গে গ্রাম থেকে যাঁরা শহরে আসবেন তাঁদের এবং শহরের দরিদ্র মানুষদের যথাযথভাবে দক্ষতা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে এই নীতিতে। এছাড়াও, দেশের নির্মাণ শিল্পে মূল্য সংযোজন এবং প্রযুক্তিগত বিকাশেরও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে ভারতীয় নির্মাণ শিল্পের প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে। তাতে পরিবেশগত দিক থেকে বিকাশের গতিও থাকবে নিরন্তর ও অপ্রতিহত।

নির্মাণ শিল্প সম্পর্কিত নীতিটিতে যে যে বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—

★ পোশাক ও বস্ত্রশিল্প, চামড়া ও চর্মজাত জুতো ইত্যাদি, রত্ন ও অলংকার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মতো কর্মসংস্থানমুখী শিল্পসমূহ।

★ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তথা যন্ত্রপাতি, ভারী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, ভারী ও বৃহদাকারের পরিবহণ, মাটিতে খনন কাজ এবং খনিতে ব্যবহার্য সাজসরঞ্জাম সম্পর্কিত মূলধনি পণ্য।

★ মহাকাশ পরিবহণ, জাহাজ শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি হার্ডওয়্যার ও বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম, প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম ও সৌর জ্বালানির মতো বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র।

★ যানশিল্প, ওষুধ শিল্প এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম-সহ যে যে ক্ষেত্রে ভারত প্রতিযোগিতার দিক থেকে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে সেই সমস্ত উদ্যোগ।

★ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প।

★ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ।

কমপক্ষে পাঁচ হাজার হেক্টর অর্থাৎ ৫০ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে জাতীয় বিনিয়োগ ও নির্মাণ শিল্পাঞ্চল (NIMZ) গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্তত ৩০ শতাংশ জায়গা জুড়ে প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবে। বিশ্বমানের নির্মাণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বড় আকারের পরিবেশবান্ধব এক নগরী গড়ে তোলা হবে। এজন্য মূল পরিকল্পনা তৈরি। রেল-সড়ক-নৌবন্দর-বিমানবন্দর-টেলি-যোগাযোগ সংক্রান্ত বাইরের কাঠামোগত পরিকাঠামো-গুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন উৎপাদনশীলতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরি-কাঠামো গড়ে তোলা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ দিতে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। জমি চিহ্নিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জলের জোগান, বিদ্যুৎ সংযোগ, আঙ্গিক পরিকাঠামো, উপযোগিতা খতিয়ে দেখার কাজ, পরিবেশের ওপর প্রভাব সম্পর্কিত সমীক্ষা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অধিগৃহীত জমির মালিকদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি।

বিধি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি যত দূর সম্ভব শিথিল ও উদার করার কথাও বলা হয়েছে। সমস্ত ছাড়পত্র দেওয়ার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হবে। কয়েকটি শর্তপূরণ সাপেক্ষে শ্রম, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন থেকে ছাড় দেওয়ার কথা বিবেচনা করবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। সরকারি পরিদর্শন ও খতিয়ে দেখার কাজে কোনও সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকবে বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্র ও রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি ওয়েবসাইট মারফত সম্পূর্ণ করা হবে। একটি স্ব-সম্পূর্ণ আবেদনপত্র এবং একটি সাধারণ হিসাবনিকাশের রেজিস্টারও তৈরি করার ব্যবস্থাও থাকবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। একটিমাত্র সরল মাসিক বা ত্রৈমাসিক রিটার্ন দাখিল করলেই চলবে। বিভিন্ন দপ্তরের জন্য আলাদা আলাদাভাবে রিটার্ন দাখিল করার প্রথার অবসান ঘটানো হবে বলে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। সিঙ্গল 'উইন্ডো' ব্যবস্থায় পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন দেওয়ার কাজ চালু হচ্ছে।

এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল যে সমস্ত সরকারি প্রকল্প ও সুযোগসুবিধা চালু রয়েছে সেগুলির মধ্যে ভারসাম্য এনে এক ধরনের সমন্বয় গড়ে তোলা। যথোপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং একটি উন্নয়ন তহবিল গড়ে তোলারও প্রস্তাব করা হয়েছে। দূষণ রোধ এবং জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে যে সমস্ত সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন তা এ দেশেই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ শুরু করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি স্বশাসিত পেটেন্ট পুল এবং লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কিত এজেন্সির কাজেও এই তহবিল কাজে লাগানো হবে। যারা পেটেন্ট বা স্বত্বের অধিকারী তাদের কাছ থেকে মেধাসম্পদ কিনে নেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে ওই নীতিতে। যদি কোনও শিল্প সংস্থা উৎপাদন ও উন্নয়নের কাজে মেধাসম্পদ ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে ওই সংস্থা রয়্যালটি প্রদানের মাধ্যমে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারবে।

নির্মাণ ও উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্প সংস্থাগুলিকে কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। তা হল—

★ **সম্পদ হস্তান্তর :** কোনও শিল্প সংস্থাকে যদি রুগ্‌ণ ঘোষণা করা হয় তাহলে NIMZ-এর সাহায্যে তা করা যাবে। NIMZ-এর মধ্যে অবস্থিত কোনও শিল্প তাদের প্রকল্প ও যন্ত্রপাতি বিক্রি করে তাহলে মূলধনি লাভের ওপর প্রদেয় কর থেকে ছাড় পাওয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল বিক্রির ৩ বছরের মধ্যে ওই NIMZ বা অন্যত্র অবস্থিত কোনও NIMZ-এ নতুন প্রকল্প চালু করে ওই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

★ **পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার :** দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি সাশ্রয় এবং জল সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম-এর উৎপাদনে বিনিয়োগের অর্থ ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে সুদে ৫ শতাংশ এবং মূলধনি ভরতুকি বা সহায়তার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশের মতো সুবিধা দেওয়া হবে।

★ **প্রযুক্তি উন্নয়ন :** দূষণ রোধ, জ্বালানি সাশ্রয় এবং জল সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও পদ্ধতির উৎপাদন ও উৎপাদনে সুযোগসুবিধা দানের প্রস্তাব রয়েছে। ছোট ও মাঝারি আকারের শিল্প সংস্থাগুলিকে উৎপাদিত সামগ্রীর পেটেন্ট বা স্বত্ব লাভের জন্য এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্ভব করে তুলতে ব্যয়ের আংশিক পূরণ করে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। পাঁচ বছর পর্যন্ত ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

★ **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ সুবিধা :** দীর্ঘমেয়াদি মূলধনি লভ্যাংশের ওপর করের ক্ষেত্রে ছাড়ের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ পুনর্বিনিয়োগের কাজে লাগানো হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির স্বার্থে ব্যাংক যদি মূলধনি তহবিলে বিনিয়োগ করে তবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের বিধিনিয়ম ব্যাংকগুলির অনুকূলে শিথিল করা হতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শীর্ষ ব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমেই তা করে থাকে। IRDA-র নীতি নির্দেশিকা শিথিল করা হবে যদি বিমা সংস্থাগুলি বিনিয়োগের কাজে এগিয়ে আসে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির অনুকূলে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবেও সম্মতি জানানো হয়েছে। ব্যাংকের যথোপযুক্ত ঋণদান পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা লাভের সুযোগও পাওয়া যাবে। এই ধরনের শিল্প সংস্থাগুলির জন্য গঠন করা হবে একটি স্টক এক্সচেঞ্জও। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তাদান সম্পর্কিত এ পরিষেবার সম্প্রসারণ করা হবে।

★ **সরকারি সংগ্রহ :** সংশ্লিষ্ট নীতিতে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তি সংগ্রহের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সৌর জ্বালানির সাজসরঞ্জাম, বৈদ্যুতিন হার্ডওয়্যার, জ্বালানি সাশ্রয়কারী পরিবহণের যন্ত্রাংশ ও উপকরণ, তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সড়ক ও মহাসড়ক, রেল, বিমান পরিবহণ ও বন্দরের ক্ষেত্র সরকারিভাবে এই তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিষেবা সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

★ **শিল্পে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা :** দক্ষতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বহু স্তরবিশিষ্ট একটি কাঠামো গড়ে তোলা হবে। সামান্যতম শিক্ষা রয়েছে এ ধরনের কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বাড়ানো হবে এই ব্যবস্থায়। ITI-এর মাধ্যমে এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণের (PPP) মধ্যে দিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

★ প্রতিটি NIMZ-এ পলিটেকনিক স্থাপন এবং প্রশিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কেন্দ্র গঠন করা হবে।

★ **নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা :** কোনও শিল্প সংস্থায় কাজের অভাব হলে বা প্রয়োজনীয় তহবিল অপ্রতুল হয়ে পড়লে একটি বিকল্প নিষ্ক্রমণের পথও খোলা থাকবে।❑

মানুষকে দিয়ে মলবহন

রাজনৈতিক সদিচ্ছা দু' বছরে এই প্রথার বিলোপ ঘটাতে পারে

মলবহন ও নোংরা অপসারণের কাজে কর্মী নিয়োগ মানবিকতার লজ্জা। সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই প্রথা ভারতের উন্নয়নের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছে। কেন এই প্রথা এখনও সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং তার সুষ্ঠু রূপায়ণ ও সাফাইকর্মীদের পুনর্বাসনে একগুচ্ছ সুপারিশ **ড. অমৃত প্যাটেল***-এর লেখা এই নিবন্ধে।*

নতুন সরকার স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রার্থনা করেছে। পাঁচ বছর মেয়াদের এই অভিযান শুরু হয়েছে এ বছরের ২ অক্টোবর। কিন্তু সব থেকে আগে প্রয়োজন মানুষকে দিয়ে মলবহন করানোর শতাব্দীপ্রাচীন অমানবিক প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন। বর্তমান আইনের কঠোর প্রয়োগ, এমনকী প্রয়োজনে আইনের সংশোধন করে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দু' বছরের মধ্যেই এই প্রথা রদ করা সম্ভব। স্বচ্ছ ভারত অভিযানেরও উচিত কেবল সাফাই ও নিকাশি ব্যবস্থার মধ্যে আটকে না থেকে এই বিষয়টিতে মনোযোগ দেওয়া। কেননা, এর সঙ্গে মানুষের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। মানুষকে দিয়ে মলবহন, ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর এক কালো দাগ। একবিংশ শতাব্দীতে, স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও যে হাজার হাজার পরিবারকে সমাজের নীচুতলায় এমন অমানবিক জীবন কাটাতে হয়, তা ভারতের জাতীয় লজ্জা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন ধরে এঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অসম্মানের অবসানের চেষ্টা করে গেছেন।

মানুষকে দিয়ে মলবহন

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত এই শতকের প্রথম দশকে অসাধারণ অর্থনৈতিক বিকাশ হার অর্জন করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ভারত হয়ে উঠেছে সম্ভাবনার এক দেশ, বিদেশি বিনিয়োগের গন্তব্যস্থল। তবুও এখনও সেখানে বহু মানুষ সমাজের সর্বস্তরে বহু গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের শিকার। বহু শতাব্দীর অসম্মানের ভার এঁদের শিরে। মলবহনের মতো অমানবিক কাজ করানো হয় এঁদের দিয়ে। আবার মলবহনের কাজ করেন বলে অন্য কোনও সম্মানজনক কাজও তাঁদের করতে দেওয়া হয় না। হাজার হাজার বছর ধরে তাই তাঁরা বংশানুক্রমে একই কাজ করে চলেছেন। আইন রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির নির্বিকার ঔদাসীন্য এবং বর্তমান আইনের ফাঁক এর জন্য দায়ী। বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন, এই প্রথা অমানবিক এবং অস্পৃশ্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন। ভারতের সংবিধানে সব নাগরিককে সমমর্যাদা দানের কথা বলা হয়েছে। তবুও এই জঘন্য প্রথা এখানে এখনও চলে আসছে। সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি মলবাহকদের তাঁদের পেশার কারণে নানা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। শ্রী নারায়ণন সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে যে জনস্বার্থমূলক আবেদন দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে, মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা, কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যা, অস্টিও আর্থারাইটিসের মতো মাংসপেশি ও মেরুদণ্ডের রোগ, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক হারনিয়েশন এবং হেপাটাইটিস, লেপটোস্পাইরোসিস ও হেলিকোব্যাকটরের মতো সংক্রমণ, ত্বকের সমস্যা, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা প্রভৃতি এই পেশার সঙ্গে জড়িত।

১৯৯৩ সালের আইন

মানুষকে দিয়ে মলবহন করানো দীর্ঘদিন ধরেই সভ্যসমাজে অমানবিক এক অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সবরমতী আশ্রমের বাসিন্দারা নিজেরাই নিজেদের শৌচালয় পরিষ্কার করতে শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে মহারাষ্ট্র হরিজীবন সেবক সংঘ মলবহন প্রথার বিরোধিতা করে অবিলম্বে এটি রদ করার দাবি জানায়। ১৯৪৯ সালে বারভে কমিটি সাফাইকর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নত করার সুপারিশ করে। ১৯৫৭ সালে এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি মাথায় করে মলবহনের কুপ্রথা বিলোপের সুপারিশ করে। ১৯৬৮ সালে জাতীয় শ্রম কমিশন 'ঝাড়ুদার ও মলবাহকদের' কাজের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি নিয়োগ করে। সবকটি কমিটিই মলবহন প্রথা লোপ করে নিকাশি বা সাফাই কর্মচারীদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের সুপারিশ করেছিল। এই সুপারিশ আংশিক গ্রহণ করে ১৯৯৩ সালে 'মলবাহকদের নিয়োগ এবং জলবিহীন শৌচালয় নির্মাণ (নিষিদ্ধকরণ) আইন' প্রণয়ন করা হয়। এতে (i) মলবাহক নিয়োগ এবং যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা ছাড়াই জলবিহীন শৌচালয় নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। (ii) এই আইন ভাঙলে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং/অথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান থাকে। তবে ২০০৩ সালের সিএজি রিপোর্টে প্রকাশ, মাত্র ১৬টি রাজ্য এই আইন গ্রহণ করেছে এবং কোথাওই তা কার্যকর হয়নি। শ্রম-মন্ত্রকের কর্মী ক্ষতিপূরণ আইনের রূপায়ণ করেছে মাত্র ৬টি রাজ্য। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০২-০৭) মলবহন প্রথার বিলোপসাধনকে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা একটি আবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় রেলে এখনও নোংরা পরিষ্কারের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হয়। ২,৪০,০০০ কোটি টাকার সংযুক্ত রেল আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হলেও এর বিলোপসাধনের লক্ষ্যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

লক্ষ করেছে। ২০০৩ সালে সাফাই কর্মচারী আন্দোলন ও অন্য ১৩টি সংস্থার দায়ের করা আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট দেখে, ভারতে মলবাহকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারগুলিকে এ বিষয়ে হলফনামা পেশের নির্দেশ দেয়। কোনও পদস্থ আধিকারিককে ব্যক্তিগত দায়িত্বে এ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে ৬ মাসের মধ্যে এই হলফনামা পেশ করতে হবে বলে সুপ্রিম কোর্ট জানায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে এই প্রথা এখনও রয়েছে কি না এবং থাকলে তার বিলোপসাধন ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পুনর্বাসনের সময় নির্দিষ্ট কর্মসূচি হলফনামায় উল্লেখ করতে হবে বলে সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়।

কার্যকর না হওয়া আইন

সাফাইকর্মীদের বিষয়টি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেখার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে 'মলবাহক নিয়োগ এবং জলবিহীন শৌচালয় প্রস্তুত (নিষিদ্ধকরণ) আইন' পাশ হয়। অথচ ১৮ বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও সরকার এর রূপায়ণে ব্যর্থ। এখনও হাজার হাজার মানুষ এই পেশায় নিযুক্ত। এঁদের অধিকাংশই তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত হওয়ায় ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানায়, এঁদের দিয়ে মলবহন ও জঞ্জাল অপসারণ করানো হলে তা 'তপশিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন' লঙ্ঘনের আওতায় পড়বে। তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একজনকেও ১৯৯৩ সালের আইনের আওতায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। ২০১২ সালে 'ভারতে পানীয় জল ও শৌচালয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে দলিতদের প্রান্তিকতা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রসংঘে পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে ভারতে মলবাহক ও সাফাই-কর্মীদের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত পরিস্থিতির বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

নতুন আইন

২০১১ সালের ১৭ জুন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, মানুষকে দিয়ে মলবহন ও জঞ্জাল অপসারণকে 'ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর কালো দাগ' আখ্যা দিয়ে ৬ মাসের মধ্যে এই প্রথা অবলোপের কথা বলেন। মলবহন, নর্দমা পরিষ্কার, সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের মতো যাবতীয় কাজ বন্ধ করার লক্ষ্যে সরকার নতুন একটি সার্বিক আইন প্রণয়নের কথা ভাবতে শুরু করে। ২০১১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ু বিধানসভায় গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হয়, পুরনো আইনটি অত্যন্ত দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। সময় এসেছে নতুন একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের, যা সব রাজ্য মানতে বাধ্য হবে এবং যেখানে মানুষকে দিয়ে নোংরা অপসারণের বৃহত্তর সংজ্ঞা ও পরিধি, রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষের নিয়োগ, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে তার হাতে দেওয়া ক্ষমতা প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকবে। ২০১২ সালের ১২ মার্চ, দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল সংসদে দেওয়া ভাষণে বলেন, "তাঁর সরকার মানুষকে দিয়ে মলবহন ও নোংরা অপসারণের প্রথা বিলোপ করতে সংসদে একটি নতুন বিল আনবে। এতে সাফাইকর্মীদের যথাযথ পুনর্বাসন ও বিকল্প জীবিকারও সংস্থান থাকবে, যাতে তাঁরা সম্মানের সঙ্গে জীবন কাটাতে পারেন।" চার দিন পরে সুপ্রিম কোর্টকেও সরকার একই প্রতিশ্রুতি দেয়। বিলটি সংসদের বাদল অধিবেশনে পেশ করার কথা হয়। তবে তার আগেই সুপ্রিম কোর্টে মাদ্রাজ হাইকোর্টের দেওয়া একটি রায় আসে। সেখানে বলা হয়েছিল, কেন্দ্র এখনও ১৯৯৩ সালের আইন সংশোধন না করলে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ের উচ্চপদস্থ কাউকে আদালতে ব্যক্তিগত হাজিরা দিতে হতে পারে। নতুন বিলের প্রস্তাবনায় বলা হয়, 'সাফাইকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে যে ঐতিহাসিক অন্যায় ও অসম্মানের শিকার হয়ে আসছেন, তার অবসান ঘটিয়ে সম্মান ও মর্যাদার জীবনে তাঁদের পুনর্বাসন ঘটানো প্রয়োজন।' ১৯৯৩ সালের আইনের আওতায় শুধুমাত্র মল-বাহকদেরই আনা হয়েছিল। ২০১২ সালের নতুন বিলে এই সংজ্ঞা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে যাঁরা জলহীন শৌচালয়, খোলা নর্দমা, গর্ত বা রেললাইনে মল পরিষ্কারের কাজ করেন তাঁদেরও আওতাভুক্ত করা হল।

পুনর্বাসন প্রকল্প

১৯৯৩ সালে সাফাই কর্মচারী জাতীয় কমিশন আইন অনুসারে কমিশন গঠিত হয়। ওই বছরেরই মার্চে সাফাই কর্মচারী ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে জাতীয় প্রকল্পের সূচনা হয়। রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রককে। ৬০০ কোটি টাকার ওপর খরচ হলেও এই প্রকল্প যে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ, সিএজি রিপোর্টে তা স্পষ্ট। রিপোর্টের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "এই প্রকল্পের সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত হলেও জটিল সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে জীবিকার সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সহজেই গড়ে ওঠে, সেখানে এর প্রয়োগ আদৌ বাস্তবোচিত নয়। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, এই প্রকল্প তার সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ। দশ বছর ধরে ধারাবাহিক প্রয়াস চালানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে আত্মবিশ্বাস ছিল না। নীতি রূপায়ণের সঙ্গে বর্তমান আইনের সুবিধার সমন্বয়সাধন করে সুসংহত কোনও নির্দেশিকা প্রণয়নে এই উদ্যোগ ব্যর্থ। প্রথার বিলোপসাধন ও পুনর্বাসনের বিষয়টিকে পৃথকভাবে দেখায় এই প্রকল্পের মূল ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। এলোমেলো, সমন্বয়হীন কিছু কাজের সমাহার হয়ে ওঠে এই প্রকল্প। জীবিকার পরিবর্তনের জন্য যা সব থেকে জরুরি, অর্থাৎ সুফলপ্রাপকদের দক্ষতার উন্নয়ন—সেই কাজটিই ঠিকমতো করা হয়নি। এই কারণেই বংশানুক্রমিক পেশা থেকে দক্ষতানির্ভর বিকল্প জীবিকায় রূপান্তরের কাজও এগোতে পারেনি। প্রকল্পের মাপকাঠি নির্ধারণে অসামঞ্জস্য, এর রূপায়ণে সদিচ্ছার অভাব একে দিশাহীন করে তোলে।" রাজ্য সরকার ও সহযোগী সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতার অভাবের জন্যই এই প্রকল্প সন্তোষজনক পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি বলে জাতীয় সাফাই কর্মচারী কমিশন মনে করে। বহু রাজ্য সরকার তো মলবহন ও নোংরা সাফাইয়ে কর্মীদের নিযুক্ত থাকার ঘটনাই অস্বীকার করে। অথচ এখনও বহু সরকারি কার্যালয়ে জলবিহীন শৌচালয় রয়েছে এবং পুরসভা সেগুলি পরিষ্কারের জন্য সাফাইকর্মী পাঠিয়ে চলেছে। সিএজি রিপোর্টে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকেরও সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, তপশিলি জাতি উন্নয়ন আর্থিক নিগমগুলিকে (যারা পুনর্বাসনের কাজ করে) মন্ত্রক সময় মতো টাকা পাঠায়নি। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে মন্ত্রক, রাজ্য বা জেলা স্তরে নজরদারি কোনও ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। জীবিকা পরিবর্তনের সুস্পষ্ট কোনও সংজ্ঞা না থাকায় নিগম ও ব্যাংকগুলি তাদের কাজ করতে পারেনি। মহারাষ্ট্রে এ সংক্রান্ত

ঋণের আবেদনের ৪৭ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে ৭৪ শতাংশই খারিজ করে দেওয়া হয় বলে সিএজি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, "একজন নিরক্ষর দরিদ্র সাফাইকর্মী বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ পাবার জন্য জটিল যাবতীয় পদ্ধতি পালন করতে পারবেন বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মধ্যে দূরদৃষ্টি ও বাস্তবতা ছিটেফোঁটাও নেই।" সিএজি আরও বলেছেন, "কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলি এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ ঘটিয়ে শক্তি অর্জন করবে, এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। অথচ কার্যক্ষেত্রে আইনের ব্যবহার হয়নি বললেই চলে।"

এর আগে সাফাইকর্মীদের পুনর্বাসনের কর্মসূচি ব্যর্থ হয়েছিল। এর কারণ হল, ৯৫ শতাংশ সাফাইকর্মী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও পুনর্বাসন প্রকল্পটি ছিল পুরুষদের জন্য। দেখা গিয়েছিল, অধিকাংশ সাফাইকর্মীই বয়স্কা মহিলা, ব্যাংক ঋণ ও ভরতুকি পেতে স্বচ্ছতার অভাব, দুর্নীতি, দেরি, অনিশ্চয়তা ও হেনস্থার কথা ছেড়ে দিলেও এমন প্রকল্প তাঁদের কোনও কাজেই আসবে না। অভিজ্ঞতা বলছে, এঁদের জন্য গৃহীত প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে অনুদান-নির্ভর হতে হবে। ব্যক্তিগত উপার্জন সৃষ্টির কর্মসূচির সহায়ক হিসাবে রাখতে হবে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান পরিষেবাকে।

বিতর্কিত সংখ্যা

১৯৯৩ সালের নিষেধাজ্ঞামূলক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দেশে এখনও ১৩ লক্ষ মানুষ মলবহন ও নোংরা সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্যগুলি এই পেশায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার মানুষের নিযুক্তির কথা জানিয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল পাবার যোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৮০ হাজার জনকে। কর্ণাটকে সাতের দশক থেকে এই প্রথা নিষিদ্ধ। অথচ এখনও সে রাজ্যে ৮ হাজার মানুষ এই পেশায় রয়েছেন বলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে। ২০১১ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালে শুরু হওয়া সাফাইকর্মীদের পুনর্বাসন ও স্বনির্ভর প্রকল্পে এ পর্যন্ত ১,১৮,৪৭৪ জন সাফাইকর্মী অথবা তাঁদের ওপর নির্ভরশীলকে চিহ্নিত করা গেছে। ২০১১ সালের জনগণনায় প্রকাশ, এখনও ২৬ লক্ষেরও বেশি পরিবারে অস্থায়ী শৌচালয় রয়েছে। সাফাইকর্মীরা এগুলি পরিষ্কার করেন। প্রতিদিন ১৩ লক্ষ মানুষ মলবহনে বাধ্য হন। এঁদের ৮০ শতাংশই দলিত মহিলা। এই পেশায় নিযুক্ত মানুষের সঠিক সংখ্যা জেনে, সমস্যার সার্বিক চিত্র নিরূপণের মাধ্যমে প্রকল্পগুলির সুফল সঠিক হাতে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে নতুন করে একটি সমীক্ষা হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি জানিয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা

মলবহন ও তার সাফাইয়ের কাজে কর্মী নিয়োগের প্রথা বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত নতুন বিল সংসদে পেশ হতে চলেছে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা এবং আইন রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষের দক্ষতা নিয়ে যাতে কোনও সংশয়ের সৃষ্টি না হয় সেজন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এর মধ্যে যে বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা উচিত, তা হল—

(i) সরকারি আধিকারিক এবং গোষ্ঠী সদস্যদের নিয়ে যৌথ দল গঠন করে সংশ্লিষ্ট সাফাইকর্মী ও অস্থায়ী শৌচালয়গুলি চিহ্নিত করা দরকার, যাতে পরবর্তীকালে সরকার তা অস্বীকার না করতে পারে।

(ii) কর্মীদের যাতে মল ও নোংরার সরাসরি সংস্পর্শে আসতে না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

(iii) কোনও পরিবার যাতে অস্থায়ী শৌচালয় ব্যবহার ও তা পরিষ্কারের কাজে সাফাইকর্মী নিয়োগ করতে না পারে, তার জন্য নতুন আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত, শহরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জেলাশাসককে দায়বদ্ধ করা।

(iv) গ্রামীণ ভারতে জলহীন অস্থায়ী শৌচাগার পরিষ্কার করতে সাফাইকর্মীদের নিয়োগ করা হয়। শহরেও অনেক জায়গায় সুসমন্বিত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকলে স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ এজন্য কর্মী নিয়োগ করে। তাই শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলে এই প্রথা অবলুপ্ত হবে।

(v) এই কর্মীরা যদি পুরসভা, সরকার, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থার কর্মী হন তাহলে তাঁদের চাকরির সুরক্ষা বিধান একান্ত আবশ্যক। নতুন আইনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া উচিত যে, কোনও-ভাবেই এঁদের কর্মচ্যুত করা যাবে না। এমন কাজে এঁদের নিযুক্ত করতে হবে যা মলবহন বা নোংরা পরিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত নয়।

(vi) জলহীন শৌচালয়ের পরিবর্তে ফ্লাশ করা শৌচালয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানো, সাফাইকর্মীদের পুনর্বাসন ও তাঁদের সন্তানের শিক্ষার কাজ স্থানীয় সংস্থা ও অসরকারি সংগঠনগুলির হাতে তুলে দেওয়া উচিত। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে দায়বদ্ধ করা উচিত প্রশাসনিক আধিকারিক ও জন-প্রতিনিধিদের। সাফাইকর্মীদের সন্তানের জন্য কলেজস্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

(vii) শতাব্দীপ্রাচীন এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সংগ্রামের জন্য সাফাইকর্মীদের ক্ষমতায়নও প্রয়োজন।

(viii) রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রদর্শনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন বিল সংসদে পাশ করানো উচিত, তিন মাসের মধ্যে যাতে এটি আইনে পরিণত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ যাতে কোনওরকম বিলম্ব না করে এর রূপায়ণে মনোযোগী হয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তা দেখতে হবে।

(ix) মলবাহকদের চিহ্নিত করতে গ্রামস্তরে পঞ্চায়েতকে এবং শহরে পুর কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে। এঁদের উন্নয়নে প্রণয়ন করতে হবে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা।

(x) ব্লক স্তরে এই কাজের ওপর নজরদারি চালাতে কমিটি গঠন করতে হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। প্রতি মাসে এই কমিটি কাজের পর্যালোচনা করবে।

(xi) জেলাস্তরে কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন জেলাশাসক। তিন মাস অন্তর কাজের পর্যালোচনা করা হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য জেলাশাসক সরাসরি দায়বদ্ধ থাকবেন।

(xii) রাজ্যস্তরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি ৬ মাস অন্তর জেলাওয়াড়ি কাজের সমীক্ষা করবে।

(xiii) জাতীয়স্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি সারা দেশে এ সংক্রান্ত কাজের বাৎসরিক পর্যালোচনা করে সংসদে রিপোর্ট জমা দেবে।❑

[লেখক "গ্রামীণ ঋণ ও মাইক্রো-ফাইনান্স" বিষয়ে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা।
email : dramritpatel@yahoo.com]

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীবাণু

বৈদ্যুতিন পণ্যের ব্যবহার যে দ্রুত হারে বাড়ছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বেড়ে চলেছে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ। ব্যবহার বাড়লে, বর্জ্যও বাড়বে—এটাই স্বাভাবিক এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের মতই তা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারকও বটে। কিন্তু এই ই-ওয়েস্ট নিষ্কাশনের কোনও চট্‌জলদি উপায় পাওয়া মুশকিল। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হলেও নতুন সমাধানসূত্রের খোজ মিলেছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় জীবাণু কীভাবে মুশকিল আসান করতে পারে, সে কথাই তুলে ধরেছেন **ড. এম.এইচ. ফুলেকার** ও **ড. ভাবনা পাঠক।**

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বর্তমান সমাজকে এক সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে এর মোকাবিলায় সমবেত প্রচেষ্টা জরুরি। বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক সামগ্রীর দেদার ব্যবহারের ফলে যোগাযোগ এখন অনেক অনায়াসসাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য মদত পেয়েছে। বেড়েছে রুজিরোজগারের সুযোগসম্ভাবনা। উপকারের লম্বা তালিকার পাশাপাশি অবশ্য অনেক চ্যালেঞ্জও মাথাচাড়া দিয়েছে। যেমন, বৈদ্যুতিন বর্জ্যের (ই-ওয়েস্ট) ক্রমবর্ধমান সমস্যা। এই হ্যাপা সামলাতে সমাজকে জোরালো ব্যবস্থা নিতে হবে। সংকট এখন যথেষ্ট তীব্র। বৈদ্যুতিন বর্জ্য সাফাইয়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় তৎপর না হলে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা।

ভারত ২০০৫ সালের পরিবেশ সুস্থিরতা সূচকে ১০১ নম্বর স্থান পেয়েছে। আর পরিবেশ শাসনে তার ঠাঁই ৬৬ নম্বরে।

বৈদ্যুতিন বর্জ্যে কী থাকে?

সব বৈদ্যুতিন পণ্য একই ধরনের জিনিসপত্তর দিয়ে তৈরি নয়। এক এক পণ্যে বিভিন্ন ধরনের উপাদান থাকতে পারে। দিনকে দিন নতুন নতুন সফ্‌টওয়্যার ও প্রযুক্তি বেরোনোয় তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ঘটছে। পাল্লা দিয়ে বৈদ্যুতিন পণ্যে উপাদানও যাচ্ছে পালটে। বৈদ্যুতিন ছাঁটে (স্ক্র্যাপ) ধাতু, প্লাসটিক ও তাপরোধক অক্সাইডের অনুপাত মোটামুটি ৪০ : ৩০ : ৩০ (১৯৯১ সাল)। ধাতুর মধ্যে তামা (২০ শতাংশ), লোহা (৮ শতাংশ), টিন (৪ শতাংশ), নিকেল (২ শতাংশ), সিসে (২ শতাংশ) ও দস্তা (১ শতাংশ)। আর যৎকিঞ্চিৎ রুপো (০.২ শতাংশ), সোনা (০.১ শতাংশ) এবং প্যালাডিয়াম (০.০০৫ শতাংশ)।

ই-ওয়েস্ট-এ থাকে বহুরকম ব্যবহৃত, পুরনো এবং বাতিল বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন পণ্য, সাজসরঞ্জাম। কম্পিউটার, সেলফোন, স্টিরিও, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার এবং আরও হরেক জিনিসপত্র। এসব বর্জ্য থেকে কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। কিছু ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। বাদবাকি অংশ জঞ্জাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ই-ওয়েস্টের শেষ ঠাঁই অসংগঠিত ছোটখাট কারবারির গোলায়। সেখানে খালি হাতে চলে ভাঙাভাঙি। ঝাড়াইবাছাই। এক বিষাক্ত পরিবেশে। বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জামে থাকে নানা কিসিমের রাসায়নিক মৌল ও যৌগ। এক সেলফোনেই আছে ৪০ রকমের বেশি মৌল। বৈদ্যুতিন বর্জ্যে ধাতুর মধ্যে সচরাচর মেলে লোহা-ইস্পাত, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, সিসে, দস্তা, নিকেল। আর অতি সামান্য হলেও সোনা, রুপো, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ইনডিয়াম, রুথিনিয়াম, সেলিনিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম (চেন ও অন্যান্যরা, ২০১১)।

ভারতে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ

বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন বর্জ্যের বহর ফি বছর ভয়ানক বেড়ে চলেছে। বিশেষত বাতিল কম্পিউটার এবং টেলিভিশনের পরিমাণ। আইএইআর (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইলেকট্রনিকস রিসাইকলারস) ২০০৬ সালে জানায় ২০১০ সালে বরবাদ বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সামগ্রীর সংখ্যা ৩০০ কোটি ছুঁয়ে যাবে। গোটা বিশ্বে ফি বছর প্রায় ২-৫ কোটি টন বৈদ্যুতিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ শহরগুলির কঠিন বর্জ্যের ৫ শতাংশ। ভারতে বর্জ্যের পরিমাণ ও তার কতটা সাফ করা হয়, এ নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সরকারি তথ্য অমিল। তবে সরকারি বা অসরকারি কিছু সংস্থা এ নিয়ে হিসেবনিকেশ করে বইকি।

ক্যাগের (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) প্রতিবেদন অনুযায়ী ফি বছর দেশে বিপজ্জনক শিল্প বর্জ্যের পরিমাণ ৭২ লক্ষ টনের বেশি। বৈদ্যুতিন বর্জ্য ৪ লক্ষ টন। প্লাসটিক ১.৫ লক্ষ টন। চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য ১.৭ লক্ষ টন। পুর অঞ্চলে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টন বর্জ্য জমে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর হিসেবে ২০১২ সালে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ ৮ লক্ষ টন ছাড়িয়ে যাবে।

মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিপদাশঙ্কা

শক্তি ও জ্বালানি উৎপাদন, ইলেকট্রোপ্লেটিং, বর্জ্য জল পরিশোধন এবং খনি ও কৃষিকাজের দরুন পরিবেশে ভারী ধাতু ছড়ায়। এটা অন্যতম মস্ত পরিবেশ সমস্যা। নগণ্য পরিমাণে পাওয়া যায় এমন বহু সংখ্যক মৌলকে ভারী ধাতু বলা হয়। শিল্প ও জীবন প্রক্রিয়ার পক্ষে এসব মৌল খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে এসব ধাতু স্বাভাবিকভাবে মাটিতে মিশে থাকে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের ফলে পরিবেশে এদের উপস্থিতি যাচ্ছে বেড়ে। সিসে, দস্তা, ক্রোমিয়াম, তামা, ক্যাডমিয়াম, পারদের মতো ভারী ধাতু ছড়িয়ে পড়ছে। দেশবিশেষ নয়, এ সমস্যা বিশ্বজুড়ে।

বৈদ্যুতিন বর্জ্যে ভারী ধাতুর মাত্রা বিপজ্জনক। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এসব ধাতু ক্ষতিকর। অরক্ষিত অবস্থায় ক্যাডমিয়ামের ছোঁয়াছুঁয়ি লাগলে টিএসএইচ

ও এফটি ফোর লেভেলে বিরূপ প্রভাব পড়ে। সিসে, পারদ, ক্যাডমিয়াম থেকে জীবজন্তুর শরীরে ট্রান্সথাইরিটিন লেভেলে বিঘ্ন ঘটার সমূহ আশঙ্কা। বৈদ্যুতিন বর্জ্য থেকে ছড়ানো দূষণ মানুষের দেহে বিষক্রিয়াজনিত (টক্সিক) প্রভাব ফেলে। ডিএনএ-র পক্ষেও তা ক্ষতিকর (জেনোটক্সিক) হতে পারে। শুধুমাত্র শ্রমিক নয়, আশপাশের বাসিন্দা এবং ভাবী প্রজন্মের পক্ষেও তা বিপজ্জনক (লিউ ও অন্যান্যরা, ২০০৯)। জন্মগত খুঁত, শিশুমৃত্যু, যক্ষ্মা, রক্তের আধিব্যাধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হানি, কিডনি ও শ্বাস ব্যবস্থার স্বাভাবিক কাজে অসামর্থ্য ও ফুসফুস ক্যান্সার বাড়ে। শিশুদের মগজ ঠিকমতো গঠিত হয় না এবং ক্ষতি হয় স্নায়ু ও রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার (প্রকাশ ও ম্যানহারট, ২০১০)।

নিকারাগুয়ার মানাগুয়াতে পুরসভার ভাগাড়ে জঞ্জাল হাঁটকানো ১১-১৫ বছর বয়েসি ৬৪টি ছেলেমেয়ের সিরামে পলিব্রোমিনেটেড ডাইইথাইল ইথারের মাত্রা নিয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়। এখানে ঘরগেরস্থালি ও শিল্পের বর্জ্য ফেলা হত। ছেলেমেয়েগুলির সিরামে ওই মাত্রা ছিল অত্যধিক। এত বেশি এর আগে কখনও কোথাও দেখা যায়নি। এতদিন মনে করা হত দূষিত খাবার এর কারণ। সমীক্ষা এ ধারণা নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে অত্যধিক ধুলোর কণা বাচ্চাদের দেহে ঢোকায় এই বিপত্তি। এসব ছেলেমেয়ের দেহে ভারী ধাতুর পরিমাণও বেশি। ভাগাড়ের আশপাশে বাস ও জঞ্জাল থেকে জিনিস কুড়িয়ে বিক্রি করা বাচ্চাদের রক্তে দেখা গেছে অন্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় সিসে বেশি। সেন্টার ফর ডিজিজ কনট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন অনুমোদিত লিটার প্রতি ১০০ মাইক্রোগ্রামের, চেয়ে ২৮ শতাংশ বেশি। এসব শিশুর রক্তে পারদ এবং ক্যাডমিয়ামও বেশি অন্য বাচ্চাদের তুলনায়, তবে তা বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে নিচুতে।

বৈদ্যুতিন বর্জ্যে বিষাক্ত পদার্থ

সার্কিট বোর্ড, ব্যাটারি, প্লাস্টিক এবং এলসিডি-তে দূষণকারী বা বিষাক্ত পদার্থ সবচেয়ে বেশি থাকে। সারণি-১-এ বিভিন্ন বর্জ্য বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জামে প্রধান বিষাক্ত পদার্থের নাম দেওয়া হল।

সারণি-১ : বৈদ্যুতিন বর্জ্যেবিষাক্ত পদার্থ

বিষাক্ত পদার্থ	কোথায় থাকে
আর্সেনিক	সেমিকনডাকটর, ডায়োড, মাইক্রোয়েভ, এলইডি, সৌরকোষ।
বেরিয়াম	ইলেকট্রন টিউব, প্লাস্টিক ও রবারের ফিলার, লুব্রিকান্ট অ্যাডিটিভ।
ব্রমিনেটেড ফ্লেমপ্রুফিং এজেন্ট	সার্কিট বোর্ড (প্লাস্টিক), কেবল, পিভিসি কেবল।
ক্যাডমিয়াম	ব্যাটারি, রঞ্জক, রাং, মিশ্র ধাতু, সার্কিট বোর্ড, কম্পিউটারের ব্যাটারি, মনিটর ক্যাথোড রে টিউব।
ক্রোমিয়াম	রং/রঞ্জক, সুইচ।
কোবাল্ট	ইনসিউলেটর।
তামা	কপার রিবন, কয়েল, রঞ্জক।
সিসে	লেড রিচার্জেবল ব্যাটারি, ট্রানজিসটার, লিথিয়াম ব্যাটারি, পিভিসি স্টেবিলাইজার, লেজার, এলইডি, সার্কিট বোর্ড।
তরল স্ফটিক	ডিসপ্লে।
লিথিয়াম	মোবাইল টেলিফোন, ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম, ভিডিও (ব্যাটারি)।
পারদ	ঘড়ি ও পকেট ক্যালকুলেটরের ব্যাটারি, সুইচ, এলসিডি।
নিকেল	মিশ্র ধাতু, ব্যাটারি, সেমিকনডাক্টর, রঞ্জক।
পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইলস	ট্রান্সফর্মার, ক্যাপাসিটর।
সেলেনিয়াম	ফোটোইলেকট্রিক সেল, রঞ্জক, ফোটোকপির যন্ত্র, ফ্যাক্স যন্ত্র।
রুপো	ক্যাপাসিটর, সুইচ (কন্ট্যাক্ট), ব্যাটারি, রেজিস্টর।
দস্তা	ইস্পাত, পিতল, মিশ্র ধাতু, ডিজপোজেবল ও রিচার্জেবল ব্যাটারি।

বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ভারতে সংবিধানের ১২নং তপশিল ও অনুচ্ছেদ ২৪৩-র কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব দিয়েছে পুরসভাকে। সংবিধান অনুসারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিধিনিয়ম তৈরির ক্ষমতা প্রাদেশিক আইনসভার হাতে। পুরসভার কঠিন বর্জ্য সাফাই সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশিকায় (গাইডলাইন) বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা নেওয়া, বস্তি, হোটেল, রেস্তোরাঁ, অফিসকাছারি ও বাণিজ্যিক এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা, বর্জ্য পৃথক করা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে জুতসই প্রযুক্তি গ্রহণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

বৈদ্যুতিন বর্জ্য নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগে সাড়া দিয়ে ভারত সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে। পর্ষদের পক্ষ থেকে ২০০৮ সালের মার্চে প্রকাশিত হয় পরিবেশের পক্ষে সুষ্ঠু বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিনির্দেশিকা।

বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ট্রিটমেন্ট

বৈদ্যুতিন বর্জ্যে থাকে হরেক বিপজ্জনক ভারী ধাতু এবং প্লাস্টিক। পলিব্রোমিনেটেড ডাইইথাইল ইথার, ব্রোমিনেটেড ফ্লেম রিটারডেন্ট-এর মতো অন্যান্য পদার্থ। মানুষ ও জীবজন্তুর পক্ষে এসব পদার্থ ভয়ানক বিপদবিশেষ। পরিবেশে মেশার আগে তাই এ বর্জ্য থেকে ক্ষতি দূর বা কমানোর প্রক্রিয়া (ট্রিটমেন্ট) করা জরুরি। এহেন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্যতম রিসাইক্লিং (যান্ত্রিক/রাসায়নিক পদ্ধতিতে ফের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা), পুড়িয়ে ফেলা ও মাটি চাপা দেওয়া।

রিসাইক্লিং কিছু পরিমাণ দূষণকারী পদার্থ দূর করতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ বর্জ্যের ঠাঁই হয় মাটির গর্ত বা রিসাইক্লিং কেন্দ্রে। মানুষের স্বাস্থ্য বা পরিবেশের ক্ষতি করে চলে। বৈদ্যুতিন বর্জ্যে প্রতি বছর ৮ লক্ষ টনের বেশি থাকে তামা। রিসাইক্লিং সত্ত্বেও বছরে ৫ হাজার টন তামা নির্গত হয় পরিবেশে (বার্ট্রাম ও অন্যান্যরা, ২০০২)। বাতিল রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার মাটিতে পড়ে থেকে ওজোন ধ্বংসকারী সিএফসি গ্যাস ছড়ায়।

বৈদ্যুতিন বর্জ্য প্রায়ই পুড়িয়ে ফেলা হয়। পোড়ানোর সময় নির্গত গ্যাস এবং দহন শেষের ছাই অনেক সময় বিষাক্ত থাকে। পলিব্রোমিনেটেড ডাইফিনাইল ইথার প্লাস্টিকের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত নয় বলে পরিবেশে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে (দেঙ ও অন্যান্যরা, ২০০৭)।

রিসাইক্লিং

রিসাইক্লিংয়ের সময় বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলি খুলে ফেলা এবং ভাঙাভাঙি করা হয়। রিসাইক্লিং করে কম্পিউটার থেকে ৯৫ শতাংশ বের করা হয় দরকারি জিনিস। আর ক্যাথোড রে টিউব মনিটরের ৪৫ শতাংশ জিনিসপত্তর। জাপানের মতো উন্নত দেশে উচ্চ প্রযুক্তির রিসাইক্লিং-এর দরুন পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে যৎসামান্য (আইজাওয়া ও অন্যান্যরা, ২০০৮)।

অত্যাধুনিক কারিগরির মাধ্যমে ফেলে দেওয়া ক্যাথোড রে টিউব-এর হাইলেড (সিসে) গ্লাস খুলে নেওয়া যায়। অথচ এতে পরিবেশের ক্ষতি অতি নগণ্য (আঁদ্রেওলা ও অন্যান্যরা, ২০০৭)।

বৈদ্যুতিন সরঞ্জামে বিপজ্জনক পদার্থ বিশেষ আধারে সুরক্ষিত থাকে। বর্জ্য সংগ্রহের সময় হঠাৎ ভেঙে গিয়ে তা থেকে বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যেতে পারে। এছাড়া ভাঙাভাঙির সময় বিপজ্জনক পদার্থ মেশা নোংরা ধুলো থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির না হলে রিসাই-ক্লিংয়ের দরুন দূষণ সৃষ্টি হয়। নির্গত বিষাক্ত ভারী ধাতু স্থানীয় লোকজনের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদ ডেকে আনতে পারে। উন্নত বিশ্ব থেকে বর্জ্য নিয়ে জাহাজের অধিকাংশ পাড়ি জমায় চীনে। সেখানকার তাইঝাউ অঞ্চলে এসব জাহাজ থেকে খালাস করা বর্জ্য রিসাইক্লিং চলছে সেই সাতের দশক থেকে।

পোড়ানো

বিশেষভাবে বানানো চুল্লিতে উচ্চ তাপে (৯০০-১০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) বর্জ্য পদার্থ পুড়িয়ে ফেলা হয়। বর্জ্য পদার্থ গর্তে চাপা দিতে গেলে অনেক জায়গা লাগে। পোড়ালে ছাই তুলনায় অনেক কম হয়। বাঁচে জায়গা। এছাড়া পোড়ানোর ফলে পরিবেশের পক্ষে

চিত্র-১ : ইলেকট্রনিক ছাটের উপাদান

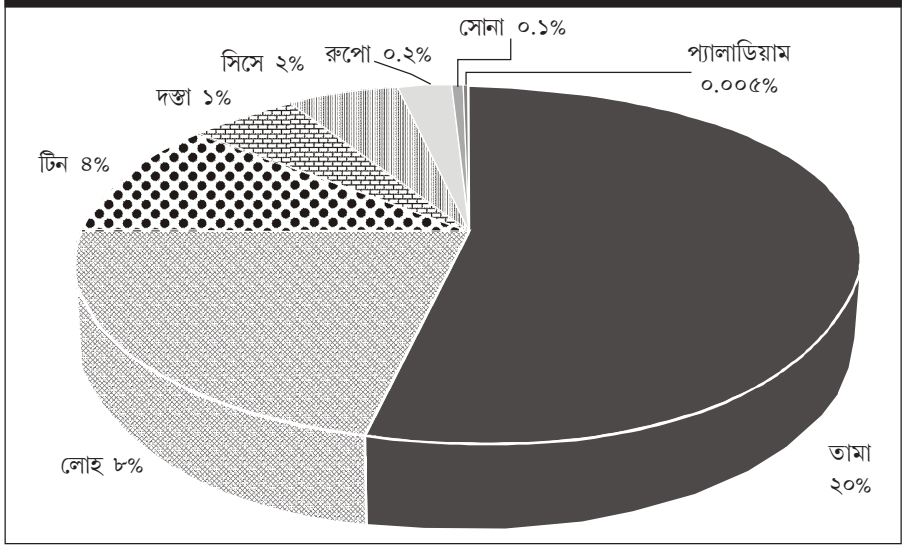

সূত্র : সোধি ও অন্যান্যরা (২০০১)।

ক্ষতিকর কিছু মৌল কম ক্ষতিকারক যৌগে পরিবর্তিত হয়।

তবে এর সবটা ভালো নয়। বর্জ্য পদার্থ পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। পোড়ানোর পর দূষণ ছড়াতে পারে ছাই থেকে। এসব ইস্যু এখন যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মাটিতে গর্ত খুঁড়ে চাপা দেওয়া

বৈদ্যুতিন বর্জ্যের অনেকটা অংশই এখন মাটির নীচে চাপা দেওয়া হয়। এজন্য জমিতে লম্বা গর্ত কেটে বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ভরাট করে তার উপর ঢালা হয় অনেক মাটি। এটা অবশ্য সাবেকি ধারা। আধুনিক পদ্ধতিতে তরল চোঁয়ানো রুখতে গর্তের চারপাশে প্লাস্টিক শিট বসানো হয়। এছাড়া তরল এক জায়গায় জড়ো করে তা পাঠানো হয় ট্রিটমেন্ট প্লান্টে।

বর্জ্য পদার্থ মাটির গর্তে চাপা দিলে নোংরা তরল চোঁয়ানো ও বিপজ্জনক গ্যাস বেরিয়ে যাবার কিছু ঝুঁকি কিন্তু আটকানো যায় না।

ব্যাকটিরিয়াকে কাজে লাগানো (বায়োরেমিডিয়েশন)

দূষিত মাটি ও ভূগর্ভস্থ জল শোধনে মাইক্রোব ব্যবহার করাকে বলে বায়োরেমিডিয়েশন। ব্যাকটিরিয়ার মতো জীবাণুকে মাইক্রোব বলা হয়। দূষণকারী পদার্থ কিছু মাইক্রোবের খাদ্য। এদের শক্তির উৎসও বটে। বায়োরেমিডিয়েশনের মাধ্যমে এসব মাইক্রোবের সংখ্যা বাড়ানো হয়। তেল ও অন্যান্য পেট্রো পদার্থ, দ্রাবক (সলভেন্ট) ও কীটনাশক পদার্থ খেয়ে ফেলে ব্যাকটিরিয়া এসবের দূষণ থেকে পরিবেশ বাঁচায়। মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না এসব ব্যাকটিরিয়া থেকে। এরা ধাতু ধ্বংস করতে পারে না বটে। তবে এক তাজ্জব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতুর রাসায়নিক ধর্ম বদলে দিতে পারে এসব অতি সূক্ষ্ম জীবাণু। বায়োরেমিডিয়েশনের সময় ধাতু ও মাইক্রোবের পারস্পরিক ক্রিয়ার (ইনটারঅ্যাকশন) বিভিন্ন পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

এখন গবেষণায় বৈদ্যুতিন বর্জ্য দূষিত মাটিতে ভারী ধাতু জমার পরিমাণ, সেই মাটির ভৌত রাসায়নিক গঠন ও দূষিত মাটি শোধনে সক্ষম জীবাণুর শ্রেণিবিভাগের দিকে নজর পড়েছে। দূষিত জমি শোধনের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়েছে 16 S rDNA পদ্ধতি। নিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভারী ধাতু মিশ্রিত মাটি ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে দূষণ-মুক্ত করা হয়েছে। ইনকিউবেটর (জীবাণু বৃদ্ধিকারী যন্ত্র) শেকারে বিভিন্ন মাইক্রোবকে সিসে, তামা, ক্যাডমিয়াম ও দস্তার মতো ভারী ধাতুর মধ্যে রেখে পরীক্ষা চলে। 16 S rDNA টেকনিক ব্লাস্ট অ্যান্ড ফাইলোজেনেটিক অ্যানালিসেসের সাহায্যে এসব ধাতুর মাঝেও দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকা মাইক্রোঅর্গানিজমগুলিকে চিহ্নিত করা

হয়েছে। শনাক্ত করা গেছে বৈদ্যুতিন বর্জ্য শোধনে করিতকর্মা স্থানীয় জীবাণুগুলিকে (ইনডিজিনাস মাইক্রোঅরগানিজম)।

পরিবেশে ভারী ধাতু সেঁধালে জীবাণু ও তাদের ক্রিয়াকর্মে যথেষ্ট রদবদল হতে পারে (ডয়েলম্যান ও অন্যান্য, ১৯৯৪; হিরোকি, ১৯৯৪)। আবশ্যক ধাতব আয়ন সরিয়ে দিয়ে বা জৈব মৌলের গঠনে হেরফের করে ভারী ধাতু সাধারণত জীবাণুদের পক্ষে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে (ডয়েলম্যান ও অন্যান্য, ১৯৯৪; গ্যাড ও গ্রিফিথস, ১৯৭৮; উড এবং ওয়াং, ১৯৮৩)। তবে কোবাল্ট, তামা, দস্তা ও নিকেলের মতো কিছু ভারী ধাতু সামান্য মাত্রায় থাকাটা জীবাণুর পক্ষে আবশ্যক।

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে সামুদ্রিক আগাছা (অ্যালগা) ও ব্যাকটিরিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিমাণ ধনাত্মক ধাতব আয়নকে রাসায়নিক কমপ্লেক্সে পরিণত করে (স্ট্রান্ডবার্গ ও অন্যান্য, ১৯৮১)। পরিশোষণ আন্তঃক্রিয়ার পাশাপাশি জীবাণুসমাজ ধাতব আয়ন বাড়াতে সমর্থ (সিলভার, ১৯৯৬)। ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, সামুদ্রিক আগাছা ও অ্যাকটিনোমাইসিটিজ-এর মতো মাইক্রোব ভারী ধাতু অপসারণ করতে খুব কাজের।

কৃত্রিম উপায়ে দূষিত মাটি থেকে ক্যাডমিয়াম, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, তামা, ম্যাঙ্গানিজ ও নিকেল ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। মাটির খনিজ পদার্থ থেকে নিষ্কাশিত ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ ও নিকেল বের করা গিয়েছিল খুব অল্প। লোহা, ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজ উপাদানও নিষ্কাশিত করা হয়। এত সব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মাটির ভর কমে মাত্র দশ শতাংশ। শিল্প-বর্জ্য দূষিত মাটি নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা চলে। প্রধান তিন বিষাক্ত ধাতু তামা, ম্যাঙ্গানিজ ও নিকেলের মোটামুটি ৬৯ শতাংশ ১৭৫ দিনে অপসারণ করা সম্ভব হয়।

বৈদ্যুতিন বর্জ্য দূর করতে গাছপালা (ফাইটোরেমিডিয়েশন)

ফাইটোরেমিডিয়েশন হচ্ছে মাটি, জল, তলানি ঠাঁইনাড়া না করে তাদের স্বস্থানেই

চিত্র-২ : ওয়েস্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস ইকুইপমেন্ট (ডাবলিউ ই ই ই)-এর করা বৈদ্যুতিন বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ

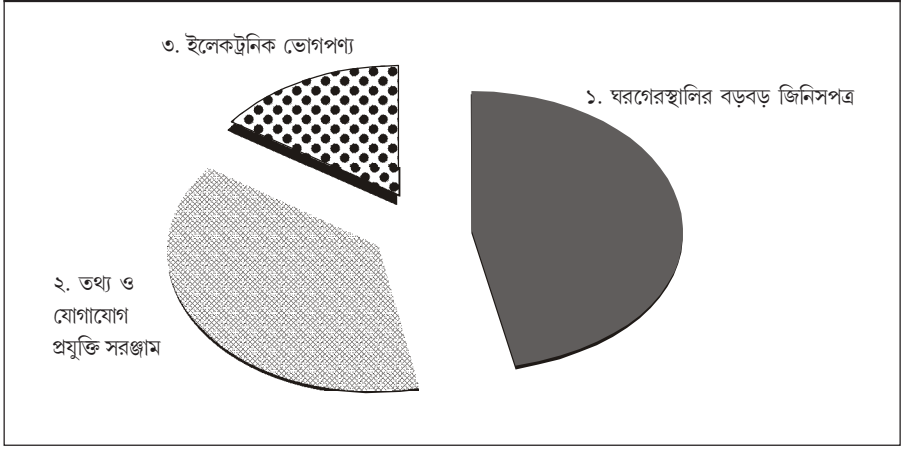

সূত্র : পিণ্টো এন ভি (২০১২)।

চিত্র-৩ : বায়োরেমিডিয়েশন প্রক্রিয়ায় ধাতু-জীবাণু মিথস্ক্রিয়া

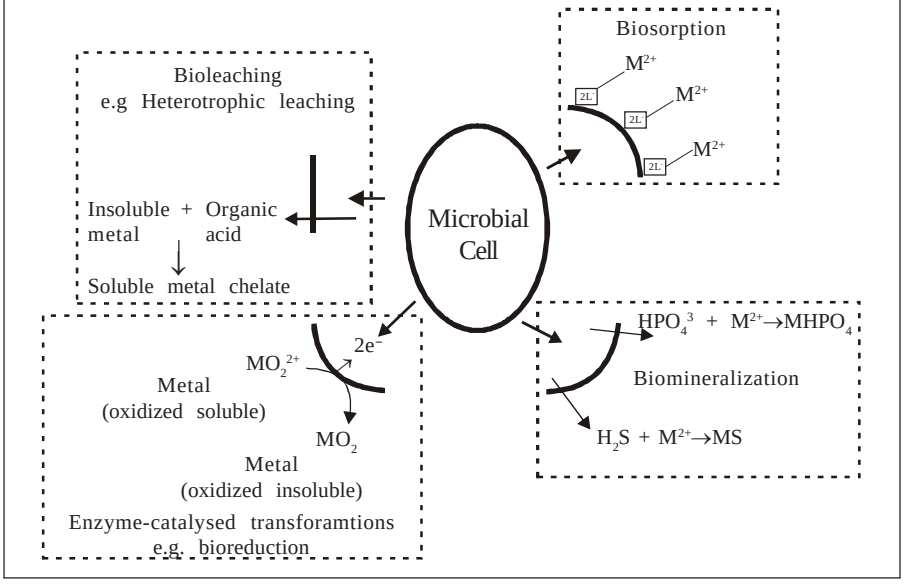

সূত্র : লয়েড (২০০২) ও গাব্রিলেস্কু (২০০৪)।

দূষণ মুক্ত করতে গাছপালা কাজে লাগানো। ইঞ্জিনিয়ারিংভিত্তিক পদ্ধতির পরিপূরক এই প্রক্রিয়ায় খরচপাতি কম। ফাইবার গ্লাসে তৈরি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ও অন্যান্য জৈব দূষক দূর করতে এই প্রযুক্তি সফলভাবে প্রয়োগ করা গেছে।

উপসংহার

বৈদ্যুতিন বর্জ্যজনিত সমস্যা সামলানো নিঃসন্দেহে চাট্টিখানি কথা নয়। তবে হাল ছাড়লে চলবে না। বর্জ্য পরিশোধনের কয়েকটি প্রযুক্তি আমাদের হাতে আছে। এ বিষয়ে সামাজিক চেতনার অভাব ও বর্তমান প্রযুক্তির কিছু ঝুটঝামেলার দরুন পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই বর্জ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর সমাধানে এখন দরকার পরিবেশ-প্রযুক্তির (ইকো-টেকনলজির) শরণ নেওয়া। বৈদ্যুতিন বর্জ্য থেকে ভারী ধাতু নিষ্কাশনের জন্য জীবাণুদের কাজে লাগানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে।❑

[গুজরাতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব এনভায়রণমেন্ট অ্যাণ্ড সাস্টেনেবেল ডেভেলপমেন্ট'-এ ড. ফুলেকার ডীন এবং ড. পাঠক সহকারী অধ্যপক।
email : mhfulekar@yahoo.com
email : bhawana.pathak@cug.ac.in]

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

মঙ্গলযাত্রায় মঙ্গলযান

আমরা মাঝে মধ্যেই খবরের কাগজে "স্যাটেলাইট লঞ্চ" করার খবর পড়ি, মাঝে মাঝে উৎক্ষেপণের সাফল্য কিংবা অসাফল্যের কথা একনজরে দেখে নিই; এইভাবেই শ্রীহরিকোটার নামটাও আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে— কিন্তু ব্যাস, ওই পর্যন্তই। গড়পড়তা পাঠক এর বেশি জানেন না, জানার চেষ্টা করেন না কিংবা হয়তো বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করেন না কারণ বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের অনেকেরই অনীহা। কিন্তু ওই বিজ্ঞানকেই উপাদেয় করে উপস্থাপন করতে পারলে কি আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব? এই তো সেদিন মঙ্গলযানকে নিয়ে পাতা জোড়া ছবি, প্রধানমন্ত্রীর কত প্রশংসা, কত শুভেচ্ছা ইস্‌রো-র বিজ্ঞানীদের জন্য; তারও কিছুদিন আগে মঙ্গলযানকে ঘিরে খবর হয়েছিল.....কেন? আমাদের মধ্যে ক'জন জানেন সবটা? এই নিবন্ধে আমাদের জন্য আমাদের মতো করে জানাবার চেষ্টা করেছেন **ড. দীপঙ্কর ঘোষ।**

টিভির পর্দা থেকে চোখ যেন আর সরতে চাইছিল না। অবাক হয়ে দেখছিলাম, শ্রীহরিকোটার আকাশ PSLV- XL-C25 নির্গত জলন্ত গ্যাসের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। অপরাহ্ণের সূর্যও যেন হার মেনেছে সেই আলোর কাছে। ৫ নভেম্বর ২০১৩-র ঘটনা। সেদিনই দুপুর ২টো বেজে ৩৮ মিনিটে শ্রীহরিকোটার উৎক্ষেপণ-প্যাড থেকে রওনা হয়েছিল PSLV-XL-C25—ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইস্‌রো-র বিজ্ঞানীদের বহু পরিশ্রমের ফসল, ভারতবাসীর গর্ব, আবার হয়তো কারও কারও কটাক্ষ উদ্রেককারী, মঙ্গলগামী, "মঙ্গলযান"। এরই সঙ্গে সূচনা হয়েছিল ভারতের 'মঙ্গল পরিক্রমাকারী অভিযান' (Mars Orbiter Mission—MOM)-এর যাত্রার সেই শুরু।

এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে মনের মধ্যে তোলপাড়। উঠে আসছিল অনেক নাম, অনেক তথ্য, এমনকী পদার্থবিদ্যার কয়েকটা সূত্রও। এসব একটু শান্ত হলে শেষমেশ, কেন জানি, একটাই নাম থিতু হয়ে রয়ে গেল। "ব্রজরাজ কারফর্মা"। এই নামটার সঙ্গে হয়তো অনেকেই পরিচিত। যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন বা হয়তো প্রথমবার পড়ছেন, তাঁদের জন্য বলি, "ব্রজরাজ কারফর্মা" বা "ব্রজদা" হল সাংবাদিক, সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের এক অসাধারণ সৃষ্টি। ব্রজদার মুখে শোনা তার জীবনের নানা ঘটনার বিবরণও এতটাই অবিশ্বাস্য যে তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এগুলিকে পুরোপুরি "গল্প" বলতে দ্বিধা বোধ করেছেন। "গুল্প" (গুল+গল্প=গুল্প) নামটাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তাদের। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দান, মঙ্গলযানের সফল উৎক্ষেপণ দেখতে দেখতে ''গুল্প'' উৎপাদনকারী এমন এক ব্রজদার নাম মাথায় আসার কী কারণ হতে পারে?

"ব্রজদার গুল্পসমগ্র"-এ গুল্প নং-৭ হল ব্রজদার খেলা এক ঐতিহাসিক ক্রিকেট ম্যাচের ঘটনা নিয়ে। যদিও কোনও ইতিহাসে এই ম্যাচের উল্লেখ নেই, তবুও এই ম্যাচের একটি ঘটনা নাকি ক্রিকেটের নিয়মাবলির বইয়ে আজও "Brajada's Puzzle" নামে রয়ে গেছে, অন্তত ব্রজদা তাই বলে গেছেন। এই ম্যাচে, ''বডিলাইন'' সিরিজ-কুখ্যাত ডগ্‌লাস জার্ডিন একাদশের বিরুদ্ধে ব্রজদা যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন, এইসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, দলের অবস্থা খুবই খারাপ, রানের খাতায় প্রায় কিছুই জমা হয়নি, খরচ হয়ে গেছে বেশকিছু উইকেট। ব্যাট হাতে ব্রজদা যে কী ধুন্ধুমার কাণ্ডটাই করেছিলেন সেদিন তার বিস্তারিত বিবরণে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না, শুধু একটা প্রাসঙ্গিক "ছয়"-এর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। প্রতিপক্ষের এক দুরন্ত বোলারের ছোঁড়া বলটির ওপর ব্রজদা অবলীলায় ব্যাটটি চালিয়েছিলেন, বলটি আকাশপানে ছুটে গিয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল। প্রায় দশ মিনিট পরেও যখন বলটির কোনও হদিশ পাওয়া গেল না, উপরন্তু আকাশ থেকে একটি ক্ষীণ "বিপ্ বিপ্" শব্দ ভেসে আসতে লাগল, সকলে মেনে নিলেন যে বলটির আর ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই, রান হল ছয় আর ক্রিকেটের বইয়ে এমন ঘটনা "ব্রজদা'স পাজ্‌ল" নামে অভিহিত রয়ে গেল। জোরে মারা একটি ক্রিকেট বল প্রায় বিনা প্রযুক্তিতে, অতি সহজেই পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণকারী কক্ষে স্থাপন করা সম্ভব হল।

ইস্‌রোর বিজ্ঞানীদের কপালে ব্রজদা বা তার ব্যাট কোনওটাই জোটেনি। সেই ১৯৭৫-এ ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, "আর্যভট্ট"-কে নিয়ে যাত্রা শুরু। তারপর একের পর এক আরও অনেক কৃত্রিম উপগ্রহের উৎক্ষেপণ ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফলতার সঙ্গে, পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী পূর্বনির্ধারিত কক্ষে সেগুলিকে স্থাপন; বছর কয়েক আগের 'চন্দ্রযান'-এর সফল চন্দ্রাভিযান এবং সম্প্রতি, মঙ্গল পরিক্রমাকারী অভিযানের সাফল্যের এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের পেছনে ছিল অন্য দুটি ব্যাপার। এক, শতসহস্র বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা মানবজাতির বিজ্ঞান-ভাণ্ডার আর দুই, ধীরে ধীরে গড়ে তোলা, দেশীয় প্রযুক্তি।

মঙ্গলযানের সাফল্যে, আজ আমরা অনেকেই খুশি এবং একই সঙ্গে গর্বিতও। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন এই বিপুল অর্থের বিনিময়ে এমন একটি অভিযানের

প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। এই সব প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর হয়তো এখনও পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সত্যি যদি এই সাফল্যের গুরুত্ব বা গুরুত্বহীনতা বিচার করতে হয়, তাহলে বোধ হয় কিছুটা হলেও বুঝে নেওয়া দরকার, এই ধরনের অভিযানে কী কী বাধা বিপত্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা কীভাবে করা হয় সেগুলির মোকাবিলা? ব্রজদার ব্যাট থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা গুল্প ৭-এর সেই মহাকাশচারী বল দিয়েই তবে শুরু করা যাক!

ছুঁড়ে দেওয়া কোনও বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবিত গতিপ্রকৃতি

প্রথমে ধরা যাক, বলটা ব্যাটের ধাক্কায় অনুভূমিক দিশায় এগিয়ে চলল। সাধারণত, এমন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ পৃথিবীর তলে দাঁড়িয়ে যেকোনও বস্তুকে অনুভূমিক দিশায় ছুঁড়ে দিলে তা যে এক মুহূর্তও আর অনুভূমিক দিশায় এগিয়ে যায় না, তা আমরা জানি। তাই এক্ষেত্রেও, অন্য সব বস্তুর মতো বলটাও অবিলম্বে বাঁকা পথ নেবে আর একটু পরেই, কিছু দূর এগিয়ে, মাটিতে পড়ে যাবে (চিত্র-১ দেখুন)। এমন কেন হয় তাও আমরা জানি। এক কথায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণই এই ঘটনার জন্য দায়ী। অভিজ্ঞতা থেকে এও বলা যায় যে বলটা যতটা জোরে ছোঁড়া হবে, মাটি ছোঁয়ার আগে ততটাই দূরত্ব সে অতিক্রম করবে কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, বলটা ছোঁড়বার মুহূর্ত থেকে মাটি ছোঁয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের কোনও হেরফের ঘটবে না। অর্থাৎ আগের বার কম দূরত্ব অতিক্রম করলেও, মাটি ছুঁতে যা সময় লেগেছিল এবারও সময় লাগবে ঠিক তাই। পৃথিবীর তলের সাপেক্ষে উল্লম্বভাবে নীচে নামিয়ে আনার সময়টুকুই কেবল নির্ধারিত হয় মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা। সেই একই সময়ের মধ্যে, ছুঁড়ে দেওয়া কোনও বস্তু কত দূরে গিয়ে পড়বে বা অন্যভাবে বললে, তার পাল্লা কতটা হবে, তা কিন্তু নির্ধারণ করে অনুভূমিক দিশায় বস্তুটির প্রারম্ভিক গতির মান। এদিকে পৃথিবী প্রায় গোলাকৃতি, তাই তার পৃষ্ঠতল বাঁকা। সাধারণভাবে বলা যায় যে পৃথিবীর

চিত্র-১ : পৃথিবী পৃষ্ঠের একটা বল ছুঁড়ে দেওয়ার সময়, জোর বাড়ানোর সঙ্গে পাল্লা বৃদ্ধি পাওয়া

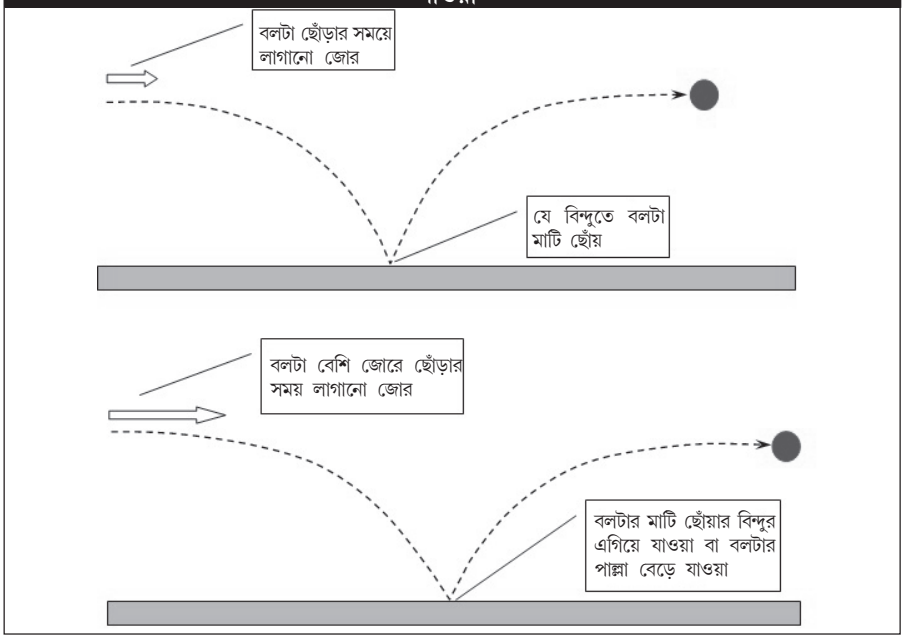

চিত্র-২ : ক) পৃথিবী পৃষ্ঠের বক্রতা। যান্ত্রিক কোনও উপায়ে ছুঁড়ে দেওয়া গোলাকার একটি বস্তু ও তার সম্ভাব্য আবক্রপথগুলি

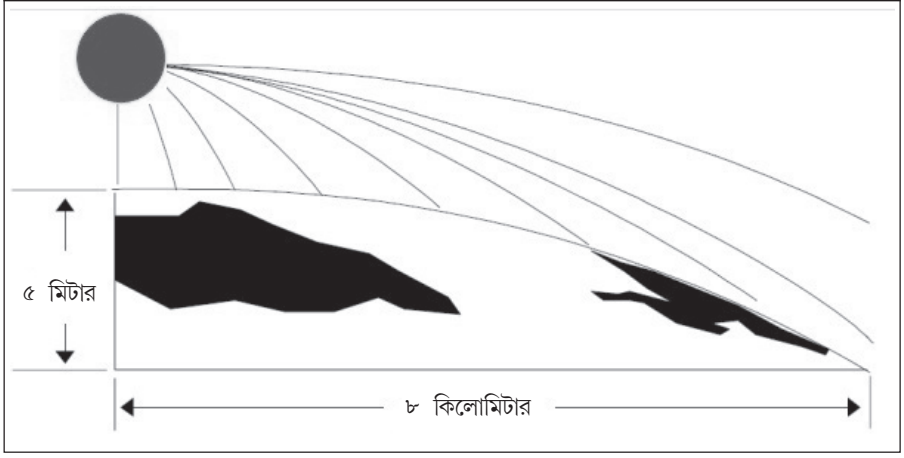

তল প্রতি ৮ কিলোমিটারে ৫ মিটার করে বেঁকে যায়।

সাধারণত, মানুষের (ব্রজদার মতো অতি-মানুষকে এখানে ধরলাম না) ছোঁড়া কোনও বস্তুর পাল্লা নির্ধারণে পৃথিবীর তলের বক্রতা হিসাবের মধ্যে না আনলেও চলে। খেলার দুনিয়া থেকে দুই একটি উদাহরণ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে, তা কেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দীর্ঘতম "ছয়" ১৫৮ মিটারের, কৃতিত্বটি পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদির। জ্যাভলিন ছোড়ার বিশ্বরেকর্ডের মালিক সম্ভবত চেক্ প্রজাতন্ত্রের ইয়ান জেলেজ্নি, ৯৮.৪৮ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে তিনি এই বিশ্বরেকর্ড করেন। হ্যামার থ্রো-এর বিশ্বরেকর্ডটি প্রায় ৮৭ মিটারের, থ্রোয়ার তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি সেদিচ্। তাহলে এটুকু আন্দাজ করা যায় যে মানুষের ছোঁড়া কোনও বস্তুর পাল্লা কখনওই ১ কিলোমিটারের বা তার কাছাকাছি কোনও মানও অতিক্রম করতে পারে না। তাই পৃথিবীর তলের বক্রতা এক্ষেত্রে না ধরলেও চলে। কিন্তু দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের সময় পৃথিবীর বক্রতার হিসাব রাখা একরকম অনিবার্য কারণ সেক্ষেত্রে বস্তুটির নিক্ষেপ গতিবেগ যান্ত্রিক বা অন্য কোনও কৃত্রিম উপায়ে অনেকটা বাড়ানো হচ্ছে এবং তার

পাল্লাও সমান ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আর বস্তুটি নীচে নেমে মাটি স্পর্শ করতে আগের মতো একই সময় নিলেও, বেড়ে যাওয়া অনুভূমিক গতিবেগের ফলে, তার নেমে আসার আবক্র পথ (trajectory)-এর বক্রতা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। এভাবে গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে যদি এক সময়ে আবক্র পথটির এবং পৃথিবীর তলের বক্রতা সমান হয়ে যায় তখন বেশ মজার এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রতি ৮ কিলোমিটার অনুভূমিক দিশায় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটি যদি উল্লম্বভাবে কেবল ৫ মিটারই নেমে আসে তাহলে সেটা শুধু পৃথিবীর দিকে পড়তেই থাকে, কিছুতেই আর মাটি অবধি পৌঁছতে পারে না এবং বৃত্তাকার এক কক্ষপথে ক্রমাগত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেই যেতে থাকে (চিত্র-২ক)। পৃথিবী পৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি এই শর্ত মানতে হলে, হিসাব করে দেখা যায় যে, বস্তুটির গতিবেগ হওয়া দরকার ৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। গল্প-৭-এর ক্রিকেট বলটি, তাহলে হয়তো, ব্রজদার ব্যাটের আঘাতে, এমনই এক গতিবেগ পেয়ে থাকবে! অবশ্য কোনও বস্তুকে যে কেবলমাত্র বৃত্তাকার কক্ষপথেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করানো যেতে পারে তা কিন্তু নয়। গতিবেগ আরও বাড়ানো হলে কক্ষপথটি আর বৃত্তাকার থাকবে না সেটা হবে উপবৃত্তাকার (elliptical) (বস্তুটির প্রারম্ভিক অবস্থান পৃথিবী পৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি হলে, উপবৃত্তাকার কক্ষপথের জন্য প্রয়োজনীয় গতিবেগ হবে ৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড-এর বেশি)। গতিবেগ আরও বাড়াতে থাকলে ক্রমে উপবৃত্তটি আরও লম্বাটে ও বড় আকার নেবে, এবং এক নির্দিষ্ট গতিবেগ অতিক্রম করলে, আর পৃথিবী আবর্তন নয়, অধিবৃত্তাকার (parabolic) এক আবক্রপথে বস্তুটি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবে, পাড়ি দেবে মহাশূন্যে। কোনও বস্তুকে এমন একটি আবক্রপথে মুক্ত করতে যে গতিবেগের প্রয়োজন সেই গতিবেগকে বলা হয় "মুক্তিবেগ" (escape velocity)। বস্তুটির প্রারম্ভিক উচ্চতার ওপরে যেমন নির্ভর করে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সৃষ্টির উপযুক্ত গতিবেগ, তেমনি মুক্তিবেগও হয় বস্তুটির প্রারম্ভিক উচ্চতা নির্ভর।

চিত্র-২ : খ) পৃথিবী পৃষ্ঠের থেকে ৬৩৭৮ কিমি উচ্চতায় কোনও গোলাকার বস্তুর বিভিন্ন গতিবেগ ও সংশ্লিষ্ট কক্ষপথগুলি

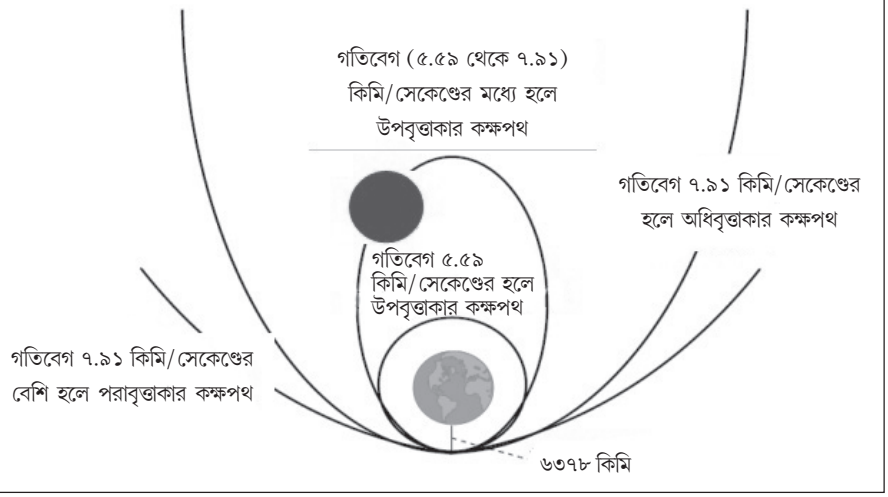

চিত্র-৩ । সূর্য প্রদক্ষিণকারী একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এবং তার বিভিন্ন অংশ

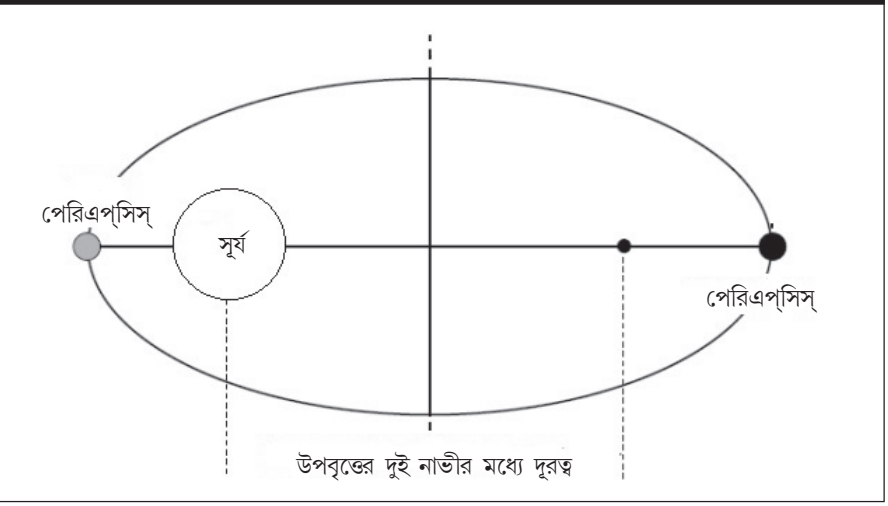

কেপ্‌লার, নিউটন সূত্রাবলী এবং মহাকর্ষ বলক্ষেত্রের প্রভাব

কেবলমাত্র পৃথিবী আর পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহের মতো যেকোনও বস্তুর ক্ষেত্রেই যে গতিবেগের তারতম্যে এমন বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এবং অধিবৃত্তাকার আবক্রপথের সৃষ্টি হতে পারে, তা নয়। সৌরমণ্ডলেও এই একই ঘটনা ঘটে চলেছে। সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকা গ্রহগুলির কক্ষপথও কিন্তু উপবৃত্তাকার। আবার ধূমকেতুর মতো এমন কিছু কিছু মহাজাগতিক বস্তুও আছে যেগুলি অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার (hyperbolic) আবক্রপথে সূর্যের কাছাকাছি এসে ঘুরে চলে যায়। বিভিন্ন গ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের আকার হয় ভিন্ন, গড় গতিবেগ এবং তারই সঙ্গে প্রদক্ষিণকালও হয় আলাদা। এমন যে হয় তা প্রথম লক্ষ করেন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়োহান্‌স কেপ্‌লার (Johannes Kepler)। তিনি, সৌরমণ্ডলের এমন গতিপ্রকৃতি, তাঁর তিনটি সূত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। এই তিনটি সূত্রের সারমর্ম হল এই যে, সূর্যকে গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই কক্ষপথের বিভিন্ন অংশের গতিবেগ ভিন্ন। উপবৃত্তাকার কক্ষপথের নাভি (focus) দুটি, তার একটিতে থাকে সূর্য। প্রদক্ষিণকারী গ্রহটি কক্ষপথের যে বিন্দুতে সূর্যের সব থেকে কাছে থাকে, তাকে বলে পেরিএপ্‌সিস (periapsis) আর

যে বিন্দুতে তার দূরত্ব হয় সূর্যের থেকে সবচেয়ে বেশি তাকে বলে এপোএপ্‌সিস (apoapsis) (চিত্র-৩)। আবর্তনকালে গ্রহটি সূর্যের যত কাছে আসে, তার গতিবেগ তত বেড়ে যায়। তাই পেরিএপ্সিসে গ্রহটির গতিবেগ হয় সর্বাধিক এবং এপোএপ্সিসে সর্বনিম্ন। শুধু তাই নয়, কক্ষপথের প্রতিটি বিন্দুতে গ্রহটির সংশ্লিষ্ট একটি গতিবেগ থাকে। বড় উপবৃত্তাকার কক্ষপথ অতিক্রম করতে সময় লাগে বেশি।

সৌরমণ্ডলে বৃত্তাকার কক্ষপথও কিন্তু সম্ভব। জ্যামিতিক দৃষ্টিতে বৃত্তও এক বিশেষ ধরনের উপবৃত্ত যার দুটি নাভিই এক হয়ে একটি বৃত্তকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সৌরমণ্ডলের কোনও সম্ভাব্য বৃত্তাকার কক্ষপথের প্রতিটি বিন্দু তার কেন্দ্রে থাকা সূর্যের থেকে সমান দূরত্বে থাকবে, তাই এমন কক্ষপথে কোনও বস্তু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করলে তার গতিবেগেও সর্বত্র এক থাকবে। সৌরজগতের এমন কাণ্ডকারখানা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় মহাকর্ষ বা অভিকর্ষের আবিষ্কারে। আইজ্যাক নিউটন তাঁর তিনটি গতিসূত্রের মাধ্যমে বল (force) -এর প্রকৃতির ধারণা দিয়েছিলেন। আবার তাঁরই মহাকর্ষীয় সূত্র থেকে জানা যায় যে কেবল সূর্য, পৃথিবী এবং তাদের মাধ্যাকর্ষণের ফাঁদে প্রদক্ষিণকারী কোনও গ্রহ উপগ্রহই নয়, ভর বিশিষ্ট যেকোনও বস্তুই ভর বিশিষ্ট অন্য কোনও বস্তুকে মহাকর্ষজ বল দ্বারা প্রভাবিত করে। নিউটনের এই বলবিদ্যার সাহায্যে বোঝা যায়, মহাকর্ষজ বলে আবদ্ধ দুটি বস্তুর একটি অপরকে প্রদক্ষিণ করলে, কেন, প্রদক্ষিণরত বস্তুটির কক্ষপথের প্রতিটি নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য, একটি নির্দিষ্ট গতিবেগই বাঁধা থাকে। তাই প্রদক্ষিণকালে, কক্ষপথের কোথাও, বল প্রয়োগে গতিবেগ পরিবর্তন করলে আগের কক্ষপথ আর বজায় রাখা যায় না কারণ বর্ধিত গতিবেগ অনুযায়ী প্রদক্ষিণকারীর প্রতিটি অবস্থানই তখন পরিবর্তিত হয়ে যায়, তৈরি হয় নতুন এক কক্ষপথ। এই তথ্য খুব কাজে লাগে কক্ষপথের মাপ বা আকার পরিবর্তন করতে অথবা কোনও কক্ষপথে আবর্তনশীল বস্তুকে মুক্ত করতে। পরে এমন পরিবর্তনের উপায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র-৪ ক। অনুকূল ধাক্কা সহকারে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের মাপ বড় করা

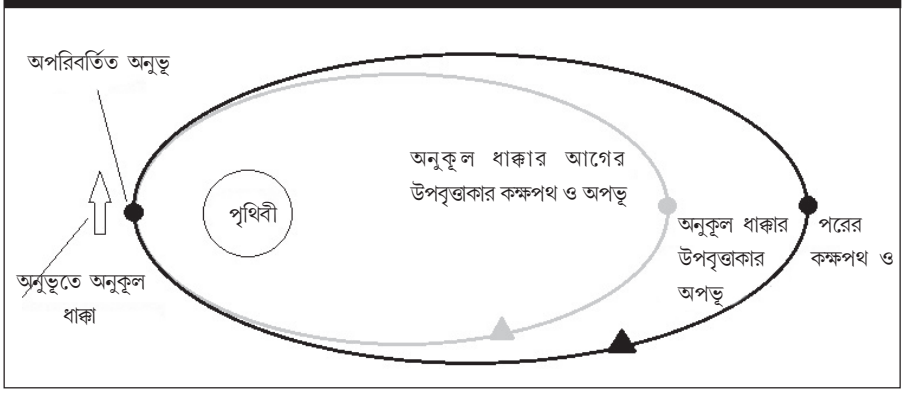

অভিকর্ষজ বলে আবদ্ধ যেকোনও বস্তুর গতিপ্রকৃতি কেমন হয়, কেপ্‌লার এবং নিউটনের সূত্রের সাহায্যে, তার কিছুটা ধারণা করা গেল। এবার এই ধারণার ভিত্তিতে আলোচনা করা যাক কীভাবে পৃথিবী থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় নির্দিষ্ট কক্ষপথে, কী করেই বা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে পাঠানো যায় মহাকাশযান? এই অভিযানগুলির সীমাবদ্ধতাগুলিও জেনে নেওয়া যাক।

কক্ষপথের রকমফের, বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ এবং তার উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা

আগেই বলা হয়েছে যে নির্দিষ্ট উচ্চতার কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হলে কৃত্রিম উপগ্রহটির চাই উপযুক্ত প্রারম্ভিক গতিবেগ। বৃত্তাকার কক্ষপথ হলে প্রারম্ভিক গতিবেগই হবে কৃত্রিম উপগ্রহটির স্থায়ী গতিবেগ। উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক গতিবেগই নির্দিষ্ট কক্ষপথটির সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবস্থানেই উপগ্রহটি পৃথিবীর সব থেকে কাছে থাকবে। এমন অবস্থানের বিন্দুটিকেই সাধারণত বলা হয় পেরিএপ্‌সিস। (পৃথিবীর ক্ষেত্রে বিন্দুটিকে বলা হবে পেরিজি (perigee) বা অনুভূ। আবার এপোএপ্‌সিসের মতোই পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এমন একটি বিন্দু থাকবে যেখানে উপগ্রহটি থাকবে পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে এবং গতিবেগও হবে সবেচেয়ে কম। এমন বিন্দুকে বলা হবে এপোজি (apogee) বা অপভূ।)

উপবৃত্তাকার কোনও নির্দিষ্ট কক্ষপথে উপগ্রহটিকে পাঠানোর একটা উপায় হল উৎক্ষেপণী (launch vehicle)-র মাথায় বসিয়ে, সেটাকে ঠেলে, নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত ধাক্কা (thrust) বা বল প্রয়োগের দ্বারা প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক গতিবেগ প্রদান করা এবং কক্ষপথটি শুরু করে দেওয়া। যত ভারী উপগ্রহ হবে, সেটাকে ঠেলে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলতে তেমনি বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা এবং প্রারম্ভিক গতিদানের উপযুক্ত বল দরকার হবে। এবার শেষ ধাক্কা খাওয়ার বিন্দুটিতে যদি উপগ্রহটির গতিবেগের দিশা অনুভূমিক হয় তাহলে সেই বিন্দুটিই হবে সর্বোচ্চ গতিবেগের বিন্দু। উপগ্রহের এমন কক্ষপথ রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। অনুভূর উচ্চতা ঠিক করে, উপগ্রহটির ভার অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক বা অনুভূ-গতিবেগের মান কষে বার করে নিলেই হল, তারপর শুধু বাকি থাকে জোরদার এক উৎক্ষেপণীর সাহায্যে ঠিক করা উচ্চতায়, কষে বার করা অনুভূ-গতিবেগ প্রদান। ব্যাস, পছন্দের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করবে উপগ্রহটি। এখানে একটা বিষয় বলা দরকার। ধরে নেওয়া হয়েছে যে অনুভূতে একবার উপগ্রহটি নির্দিষ্ট গতিবেগে পৌঁছতে পারলেই হল, আর কোনও কিছুর পরিবর্তন না হলে, কক্ষপথটি চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কার্যক্ষেত্রে যেকোনও উচ্চতায় এমন কক্ষপথ রচনা করা যায় না। যেখানে বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা সেরকম উচ্চতাই বেছে নেওয়া হয়। কারণ তা না হলে ঘন বায়ুমণ্ডলের প্রবল ঘর্ষণে উপগ্রহটির গতিবেগ ক্রমশ কমতে থাকে, গতিবেগ-

উচ্চতার হিসাবে হয় গণ্ডগোল। কক্ষপথটি আর বজায় রাখা যায় না। উপগ্রহটি ক্রমে নেমে আসে পৃথিবীর উপরে। বায়ুমণ্ডলের পাতলা অংশেও কিন্তু, মাত্র একবারের জন্য অনুভূ-গতি-প্রদান কক্ষপথটিকে চিরতরে নিশ্চিত করতে পারে না। পাতলা অংশে, খুব কম হলেও, ঘর্ষণজনিত গতিবেগ হ্রাস হবেই, তাই নির্দিষ্ট কক্ষপথটি বজায় রাখতে, মাঝে মাঝেই, অল্প অল্প করে কক্ষপথ—সংশোধনী ধাক্কা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কক্ষপথগুলিকে সাধারণভাবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম, দুইটি। ১. মেরুবর্তী কক্ষপথ (polar orbit): যে কক্ষপথ মেরুর উপর দিয়ে যায়। এমন উপগ্রহের আবর্তনকাল নানা রকমের হতে পারে। ২. ভূসমলয় কক্ষপথ (geosynchronous orbit): যে কক্ষপথ উপবৃত্তাকার বা বৃত্তাকার এবং সেই কক্ষপথ ধরে বিচরণশীল কোনও উপগ্রহর গতিবেগ হবে পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগের সমান। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে বিচরণশীল উপগ্রহের গতিবেগ কখনওই এক মানে স্থির নয়। মহাকর্ষ নির্দিষ্ট উচ্চতা—গতিবেগের নিয়ম মেনে, অনুভূতে গতিবেগ সর্বোচ্চ আর অপভূতে সর্বনিম্ন। কোনও ভূসমলয় কক্ষপথ যদি হয় বৃত্তাকার এবং কক্ষপথের তল আর নিরক্ষীয় তল যদি এক হয়ে যায় তাহলে মনে হবে যেন উপগ্রহটি, পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্থানের উপরে এক নির্দিষ্ট উচ্চতায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন উপগ্রহকে একটা বিশেষ নাম দেওয়া যায়, ভূস্থিত উপগ্রহ (geostationary satellite)। এই দুরকমের কক্ষপথে আবর্তনশীল উপগ্রহ আলাদা কারণে প্রয়োজন। মেরুবর্তী উপগ্রহ সমগ্র পৃথিবীর উপরে ঘুরতে থাকে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা স্থানের উপর দিয়েই কোনও না কোনও সময় উপগ্রহটি যায়। তাই নজরদারির জন্য এমন উপগ্রহ অপরিহার্য। একটি ভূস্থিত উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর কোনও নির্দিষ্ট স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা যায়। এমন উপগ্রহের সাহায্যে আমাদের ঘরে ঘরে আজ পৌঁছে যাচ্ছে টিভির বিবিধ অনুষ্ঠান। এমন উপগ্রহের সমষ্টি ব্যবহার করে সমগ্র পৃথিবীকে যোগাযোগের জালে বেঁধে ফেলা গেছে। এছাড়াও উপগ্রহগুলির অন্যান্য অনেক ব্যবহার আছে, যার মধ্যে অন্যতম হল উন্নততর আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, দেশের বিভিন্ন স্থানের খনিজ সন্ধান এবং জিপিএস (Global Positioning System, GPS)-এর সাহায্যে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া।

চিত্র-৪ খ। প্রতিকূল ধাক্কা সহকারে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের মাপ ছোট করা

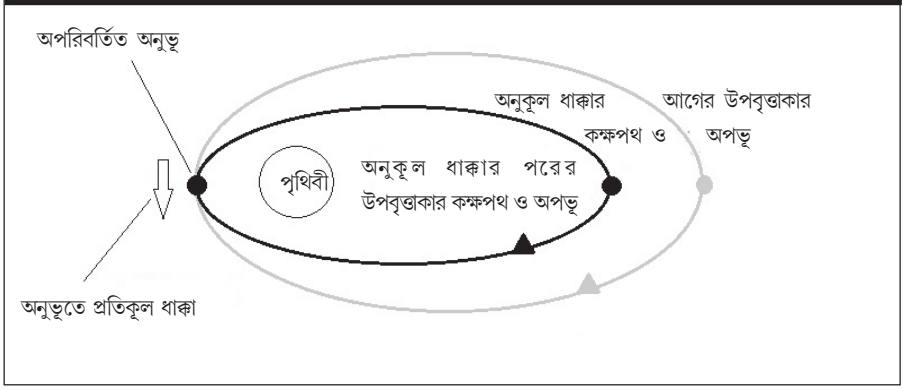

কক্ষপথ পরিবর্তনের উপায়

ধরা যাক, একটি উপগ্রহ এক নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এবার যদি কক্ষপথটি আগের থেকে মাপ (size)-এর বড় করে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ রচনা করতে হয়, তাহলে সব থেকে সহজ উপায় কী? কিছুই না, উপগ্রহটি যেই মুহূর্তে কক্ষপথটির অনুভূ বিন্দুতে পৌঁছাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে হিসেবমতো এমন ধাক্কা দিতে হবে যাতে উপগ্রহটির অনুভূ-গতিবেগ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে ধাক্কাটি দিতে হবে অনুভূ-গতিবেগের দিশাতেই। এমন ধাক্কাকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'অনুকূল ধাক্কা' বা প্রগ্রেড থ্রাস্ট। যদি কক্ষপথটিকে মাপে ছোট করতে হয় তাহলে ওই একই ভাবে ধাক্কা দিতে হবে, তবে এবার ধাক্কার অভিমুখ হবে অনুভূ-গতিবেগের দিশার বিপরীতে। এমন ধাক্কাকে বলা যায় প্রতিকূল ধাক্কা বা রেট্রোগ্রেড থ্রাস্ট। এবার যদি এমন কক্ষপথ বাছতে হয় যার মাপই শুধু নয়, তার আকৃতিও আগের থেকে আলাদা, তাহলে শুধু অনুভূ নয়, ধাক্কা দিতে হবে অনুভূ এবং অপভূ এই দুই জায়গাতেই। ধরা যাক, উপবৃত্তাকার কক্ষপথের আকার বদলে বড় একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সৃষ্টি করতে হবে, যার অনুভূ এবং অপভূ কোনওটাই আর আগের কক্ষপথের সঙ্গে মেলে না। তখন, প্রথমে অনুভূ বিন্দুতে দিতে হবে অনুকূল ধাক্কা, আর মাপ পরিবর্তন পদ্ধতির মতোই, মহাকাশযানটি এগিয়ে যাবে দূরে সরে যাওয়া অপভূর উদ্দেশ্যে। এবং যে মুহূর্তে মহাকাশযানটি অপভূতে পৌঁছাবে, দিতে হবে দ্বিতীয় অনুকূল ধাক্কা। এই দ্বিতীয় ধাক্কা, আবারও কক্ষপথের অন্যান্য বিন্দুগুলির সঙ্গেই, এবার দূরে সরিয়ে দেবে অনুভূকে। ছোট আকারের কক্ষপথ তৈরি করতে হলে অনুভূ ও অপভূ দুই জায়গাতেই দিতে হবে প্রতিকূল ধাক্কা (চিত্র-৪ ক, খ এবং গ দেখুন)

পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কক্ষপথের মাপ ও আকার পরিবর্তনের পন্থা নিয়ে আলোচনা হল। কিন্তু যদি মহাকাশযানকে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাঠাতে হয় তাহলে অন্য এক কক্ষপথ রচনা করা ছাড়াও আর একটা জরুরি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সেটা হল প্রথম কক্ষপথে থেকে অনুকূল বা প্রতিকূল ধাক্কা নিয়ে হ্যোমান্ কক্ষপথ সূচনার সঠিক মুহূর্ত নির্ণয়। যেহেতু লক্ষ্য হচ্ছে, একটি গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে মহাকাশযানটিকে পাঠানো, শুধুমাত্র প্রথম গ্রহের কক্ষপথ থেকে অন্য গ্রহটির কক্ষপথে পাঠানো নয়, তাই যেকোনও এক মুহূর্তে অনুকূল বা প্রতিকূল ধাক্কা দিলেই চলবে না। যেমন তেমন করে মুহূর্তটি বাছাই করলে হয়তো প্রথম গ্রহটির আওতা থেকে বেরিয়ে অন্য গ্রহটির কক্ষপথে মহাকাশযানটি পৌঁছাবে এবং যথারীতি, প্রতিকূল এক ধাক্কায়, সেই কক্ষপথে ঢুকেও পড়বে, কিন্তু সেখানে সেই মুহূর্তে তখন গন্তব্যের গ্রহটি মজুত নাও

থাকতে পারে। তাহলে কিন্তু মুশকিল। কোনওদিনই আর মহাকাশযানটি গন্তব্যের গ্রহে পৌঁছতে পারবে না, শুধু গ্রহটির কক্ষপথেই ঘুরপাক খাবে, এক অনন্ত ছোঁয়া-ছুঁয়ি খেলায় মাতবে গ্রহটির সঙ্গে। গ্রহান্তরে পাঠানোর এই কি একমাত্র উপায়? না তা নয়, আরও উপায় আছে তবে কম জ্বালানি খরচে এমন আন্তরগ্রহ অভিযানের এটাই এখনও পর্যন্ত সব থেকে কার্যকরী উপায় (চিত্র-৪ঘ।) শুধুমাত্র হিসেব মতো, সঠিক মুহূর্তে দুটি ধাক্কা, ব্যাস! কাজ হাসিল।

চিত্র-৪গ। অনুভূ এবং অপভুতে পর্যায়ক্রমে দুটি অনুকূল ধাক্কা লাগিয়ে হোমান্ পরিবর্তনকারী কক্ষপথের মাধ্যমে কক্ষপথের মাপ এবং আকার দুটিকেই পরিবর্তন করা

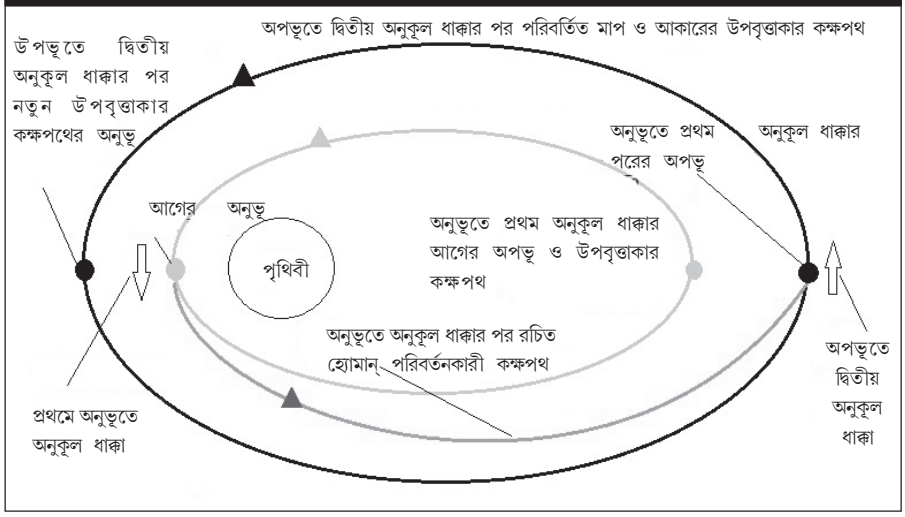

"ধাক্কা" লাগানোর ব্যবস্থা নিয়ে দুই এক কথা

অনেকক্ষণ ধরে "ধাক্কা" দেওয়ার কথা বলছি। কিন্তু কক্ষপথে আবর্তনশীল কোনও কৃত্রিম উপগ্রহকে কীভাবে দেওয়া হয় ধাক্কা? আবার উপগ্রহটিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঠেলে তোলবার সময় পৃথিবীর জোরালো মহাকর্ষজ বলের মোকাবিলাই বা কী করে করা হবে? মহাকর্ষজ বলের মোকাবিলাটুকু না হয় করবে উৎক্ষেপণী। কিন্তু এই উৎক্ষেপণীটি ঠিক কী? কী বা তার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যার সাহায্যে সেটা মহাকর্ষজ বলের মোকাবিলা করতে পারে? ইস্‌রো আজ অবধি ভারতের মাটি থেকে দেশীয় প্রযুক্তি সাহায্যে উপগ্রহ বা মহাকাশযান পাঠাবার যা যা অভিযান চালিয়েছে, তার সবকটিতেই উৎক্ষেপণী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 'রকেট প্রযুক্তি'। রকেটের কার্যপ্রাণালী এমনিতে আমাদের চেনা। বাজি পোড়ানোর সময় দুই-একটি হাউই আমরা প্রত্যেকেই জ্বালিয়েছি বা জ্বালাতে দেখেছি। তাই হাউইয়ের কার্যপ্রাণালী সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই কমবেশি একটা ধারণা আছে। হাউইয়ের সলতেয় আগুন দিলে সেই আগুন অল্পক্ষণেই, ফাঁপা চোঙের মতো খোলের মধ্যে থাকা হাউইয়ের মশলায় পৌঁছে যায়। বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে সেই মশলা আর অনেকটা গরম গ্যাস তৈরি হয়। (অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এমন জ্বলে ওঠাকে 'দহন' বলে)। গরম গ্যাস, তার নীচের ধর্ম অনুযায়ী, প্রসারিত হতে চায়। চোঙাকার খোলটির উপরদিকটা থাকে আটকানো। গরম হয়ে থাকা গ্যাস তাই নীচের দিক দিয়ে জোর গতিবেগে বেরিয়ে আসে আর এই বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া হাউইয়ের বাকি অংশে ধাক্কা লাগায় বা বল প্রয়োগ করতে থাকে। এমন বলে ধাক্কায় হাউইয়ের বাকি অংশটি উপরদিকে উঠে যায়। মহাকাশযান পাঠাবার রকেটেরও বুনিয়াদি কার্যপ্রণালী এমনই। তবে ঠেলে তোলবার জন্য বস্তুটির ভার এখানে অনেক বেশি (শুধু 'মঙ্গলযান'-এর ভারই প্রায় ১৩৪০ কিলোগ্রাম; আবার মঙ্গলযানের উৎক্ষেপণী, PSLV-XL-C25-এর উৎক্ষেপণকালীন ভারও অনেক, ৩২০,০০০ কিলোগ্রামের কাছাকাছি, এবং ঠেলে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় বলের মান বার করার সময় মঙ্গলযান এবং তার উৎক্ষেপণী এই দুইয়ের ভারের যোগফলটিই হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়)। প্রদত্ত গতিবেগের মান এবং যানটি যে উচ্চতায় পৌঁছে দিতে হবে, তাও অনেক বেশি। তাই রকেটের জ্বালানিকেও হতে হবে শক্তিশালী, জোরদার। এই জ্বালানি সাধারণত দুইরকমের হয়। কঠিন ও তরল। দুই ক্ষেত্রেই তা তৈরি হয় নানা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দিয়ে। PSLV-XL-C25 উৎক্ষেপণের সময় শুরুতেই জ্বলে ওঠে কঠিন জ্বালানি। এই জ্বালানির রাসায়নিকটি হাইড্রক্সিল টার্মিনেটেড পলিব্যুটাডাইয়িন্ (Hydroxyl Terminated Polybutadiene, সংক্ষেপে, (HTPB)। কঠিন জ্বালানি একবার জ্বলতে শুরু করলে তাকে থামানোর কোনও উপায় নেই। জ্বলতে জ্বলতে একেবারে জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে তবেই এই জ্বলার শেষ। তরল জ্বালানি কিন্তু প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যায়। দহনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বা অন্য উপায়ের মাধ্যমে তরল জ্বালানির দহন চালু বা বন্ধ করা যায়। বায়ুমণ্ডল যেখানে খুব পাতলা, সেখানে অক্সিজেন অপর্যাপ্ত। তাই তরল জ্বালানির সঙ্গে মজুত রাখতে হয় সেই জ্বালানি দহনের অক্সিজেন সরবরাহকারী কোনও জারক রাসায়নিক। PSLV-XL-C25-এ তরল জ্বালানির সঙ্গে জারক রাসায়নিক হিসেবে থাকে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড। তরল জ্বালানি চালিত উৎক্ষেপণী বা উৎক্ষেপণী-অংশকে বলা হয় 'ইঞ্জিন' আর কঠিন জ্বালানি চালিত উৎক্ষেপণী-অংশকে বলা হয় 'মোটর'।

এছাড়াও খুব কম তাপমাত্রার সাহায্যে তলরীকৃত, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি বা ক্রাইয়োজেনিক জ্বালানিও (cryogenic fuel) ব্যবহার করা হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। ভারতে তৈরি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জিওসিনক্রোনাস স্যাটালাইট লঞ্চ ভেহিকল (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, বা GSLV)-এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই ক্রাইয়োজেনিক জ্বালানি নির্ভর। GSLV-এর ক্রাইয়োজেনিক অংশে ব্যবহৃত জ্বালানি আসলে তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেন। আধুনিক রকেটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠিন ও তরল এই দুই ধরনের জ্বালানিই ব্যবহার করা হয়। নানা পর্যায়ে ভাগ করে বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন জ্বালানি ভরে একটি রকেটকে তৈরি করা

হয়। এমন পর্যায়করণ বা স্টেজিং (staging)-এর একটা বড় সুবিধা আছে। রকেটের সঙ্গে জুড়ে পাঠানো হয় উপগ্রহ বা মহাকাশযানটি। মহাকাশযানের ভার বা ওজনটুকু অপরিহার্য, তাকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর জন্যই একটি অভিযান। তাই রকেট প্রযুক্তিতে এই বিশেষ ভারটুকুকে এক বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। নামটি হল পেলোড্ (Payload)। তাই কক্ষে পৌঁছানো অবধি পেলোডের ভারটুকু উৎক্ষেপণীকে বইতেই হবে (পেলোডের ভারের ব্যাপারেও মহাকাশবিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা কিন্তু খুব খুঁতখুঁতে, অনেক হিসেব করে তাঁরা এই ভার যতটা পারেন কম করার চেষ্টা করেন)। জ্বালানিও অপরিহার্য, তবে জ্বালানি এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বা উপকরণের ওজন নেহাত কম নয়, যথেচ্ছ জ্বালানিও তাই নেওয়া যাবে না। উপরন্তু কোনও এক পর্যায়ের জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই পর্যায়ের ফাঁকা খোল এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশের ওজন মিছি মিছি বয়ে বেড়ানোরও কোনও মানে হয় না। তাই সেটা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক PSLV-XL-C25 -এরই কথা। PSLV-XL-C25-এর বৃহত্তম স্তরটির ওজন, জ্বালানি বাদ দিয়েই ৩০,২০০ কিলোগ্রাম। মিছি মিছি এই ৩০,২০০ কিলোগ্রাম ঠেলে তুলতে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ করাটা কখনওই বাস্তবসম্মত নয়। তাই এই খরচ হয়ে যাওয়া স্তর পরিত্যাগ করার ব্যবস্থা। তাছাড়া একটি স্তর পরিত্যাগ করার পর অন্য স্তরগুলি ঠেলে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়, তাই আগের চেয়ে অনেক কম বল প্রয়োগে গতিবেগ অনেকটা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এই জন্যই উৎক্ষেপণীর স্তরীকরণ।

কীভাবে মঙ্গলে গেল "মঙ্গলযান"?

ভারতের মঙ্গল পরিক্রমাকারী অভিযান তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, ভূ-কেন্দ্রিক (Geo Centric Phase) ভাগ। এইভাগে উৎক্ষেপণী PSLV-XL-C25-এর মাথায় বসিয়ে মঙ্গলযানটিকে প্রথমে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়া হয় ৫ নভেম্বর, ২০১৩-তে। তারপর, বিভিন্ন দিনে, পর্যায়ক্রমে পাঁচবার, কক্ষপথটির অনুভূতে অনুকূল-ধাক্কা লাগিয়ে কক্ষপথটিকে পাঁচ ধাপে, ক্রমাগত লম্বাটে করে বা অপভূকে দূরে সরিয়ে দেয় 'মঙ্গলযান'। তারপর ছয় নম্বর ধাক্কায় মঙ্গলযান এমন এক অনুভূ-গতিবেগ পায়, যা কিনা মুক্তিবেগের শামিল। ব্যাস! হিসেব কষে সঠিক মুহূর্তে, এই মুক্তিবেগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এক পরাবৃত্তাকার কক্ষপথে মঙ্গলযান পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। সম্পন্ন হয় যাত্রার প্রথমভাগ। কক্ষপথ লম্বাটে করার প্রত্যেকটা কৌশল যে পূর্বনির্ধারিতভাবে সম্পন্ন করা গিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। একবার 'মঙ্গলযান'-এর ইঞ্জিনের যান্ত্রিক গোলাযোগে, ধাক্কার জোর কম পড়ে যায়, ফলে কক্ষপথের মাপ বদলানো আশানুরূপভাবে হয়ে ওঠে না। পরবর্তী কক্ষপথ-মাপ-পরিবর্তন কৌশলে তাই মাপ পরিবর্তনের এই ঘাটতি পূরণ করা হয়। এরপর যাত্রার দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ সূর্য-কেন্দ্রিক ভাগের সূচনা, পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে সূর্যের অভিকর্ষের প্রভাবে একটি হ্যোমান কক্ষপথ বরাবর মঙ্গলে রওনা। একদম সঠিক মুহূর্তে, এই পৃথিবীর 'মায়া ত্যাগ' এবং সূর্যের 'মায়ার খেলায়' প্রবেশ, কারণ তা না হলে, আগে যা বলা হয়েছে, মঙ্গল আর মঙ্গলযানের সেই 'অনন্ত ছোঁয়াছুঁয়ি'-র সম্ভাবনা। তারপর মঙ্গল অভিমুখে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় মঙ্গলযান। এরপর তৃতীয় ভাগ। মঙ্গল-কেন্দ্রিক ভাগ। এই ভাগের সূচনা হয় মঙ্গলযানের, সময়মতো এবং জায়গা মতো, মঙ্গলের কক্ষপথে পদার্পণে, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪-এ। প্রায় ২৪ মিনিট ধরে, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিকূল ধাক্কা লাগিয়ে, গতিবেগ প্রায় ১০৯৯ মিটার প্রতি সেকেন্ড কমিয়ে ফেলে, শেষমেশ মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করে মঙ্গলযান। রচিত কক্ষপথটি, পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক, পরিবৃত্তাকার, পেরিএপ্সিস-এর দূরত্ব ৪২১.৭ কিলোমিটার এবং এপোএপ্সিস-এর দূরত্ব ৭৬,৯৯৩.৬ কিলোমিটার, নতি ১৫০ ডিগ্রি। তারপর বেশ কিছুদিন হল পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু করেছে মঙ্গলযান। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলার কথা প্রায় ১৬০ দিন ধরে। (চিত্র ৪ঘ দেখুন)।

চিত্র-৪ঘ। মঙ্গলযানের যাত্রাপথ

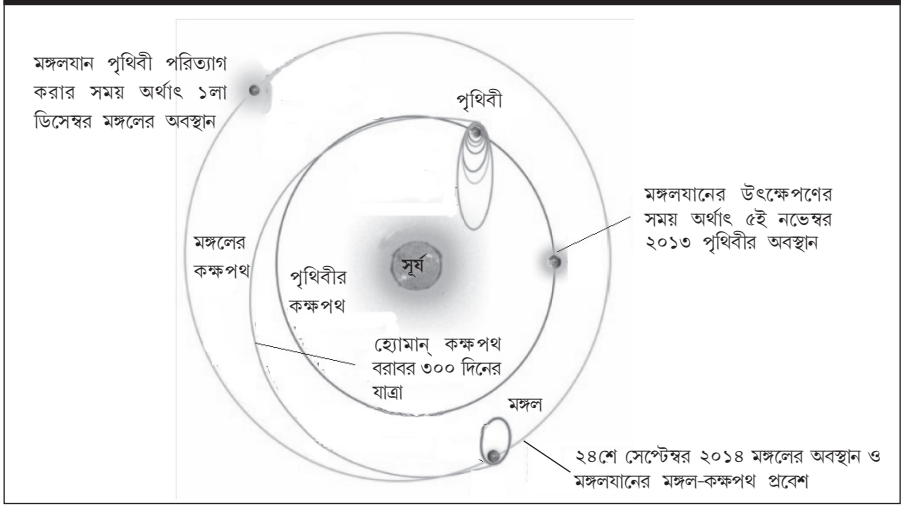

উৎক্ষেপণী হিসাবে PSLV-XL-C25-এর সুবিধা ও অসুবিধা

PSLV ইস্রোর বহুদিনের বহু অভিযানের আশা ভরসা। PSLV-এর মানে পোলার স্যাটালাইট লঞ্চ ভেহিকল। অর্থাৎ মেরুবর্তী উপগ্রহ নির্ধারিত কক্ষপথে পাঠানোই এর অন্যতম কাজ। এছাড়া, অন্যান্য কক্ষপথে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের উপগ্রহও এই উৎক্ষেপণীর দ্বারা পাঠানো যেতে পারে। এই উৎক্ষেপণীটি আবার তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। ১) সাধারণ বা রেগুলার, ২) 'বেশি বড়' বা এক্সট্রা লার্জ সংক্ষেপে XL এবং ৩) 'বিনা-সহায়ক' বা কোর ওনলি। PSLV চার স্তরী এক উৎক্ষেপণী। সব থেকে নীচের স্তরটি (PS-1) কঠিন জ্বালানি ভরা। প্রথম দুটি শ্রেণিতেই, একদম নীচের এই কঠিন-জ্বালানি ভরা স্তরটির সঙ্গে লাগানো থাকে ৬টি অতিরিক্ত, কঠিন জ্বালানি ভরা, সহায়ক রকেট

বা সহায়ক মোটর। এদের পোশাকি নাম স্ট্র্যাপ অন বুস্টার বা স্ট্র্যাপ অন মোটর সংক্ষেপে, (SOM)। নাম থেকেই পরিষ্কার যে তৃতীয় শ্রেণির PSLV-টি এই SOM রহিত। আবার দ্বিতীয় XL শ্রেণির PSLV উৎক্ষেপণীতে ব্যবহৃত বুস্টার রকেটগুলি লম্বায় অনেক বড়, জ্বালানির পরিমাণ বেশি, তাই জ্বলে থাকার সময়টুকুও বেশি। PSLV-এর উপরের বাকি তিনটি স্তর পর্যায়ক্রমে তরল, কঠিন এবং তরল জ্বালানি ভরা। মঙ্গল পরিক্রমাকারী অভিযানে, সর্বোচ্চ এই PS-4 স্তরটির উপর 'মঙ্গলযান' ছিল বিযুক্ত অবস্থায়। এই দুই অংশ একটি মসৃণ ঢাকনা বা ফেয়ারিং-এ একদম উপরে ঢাকা অবস্থায় রাখা ছিল PSLV-XL-C25, 'মঙ্গলযান'-এর নিজেরও আছে একটি ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের মাধ্যমে PSLV-XL-C25-এর অনুপস্থিতিতে গতিবেগ ও কক্ষপথ বদলানোর নানা রকম কৌশল সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে মঙ্গলযান। চিত্র-৫-এ দেখানো হল মঙ্গলযান সমেত PSLV-XL-C25-এর কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চিত্র-৫। PSLV-XL-C25 এবং তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

অনেক হিসাব কষে উৎক্ষেপণের পরও কার্যক্ষেত্রে এমন কিছু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ই যা হিসাবের বাইরের। এই ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতি, অনেক সময় উৎক্ষেপণীটিকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তাই প্রতিটি স্তরেই, তা সে মোটরই হোক বা ইঞ্জিন, কিছু দিশা সংশোধনী ব্যবস্থা রাখতেই হয়। PSLV-এর ক্ষেত্রে, মোটর অংশগুলির দিশা সংশোধনের জন্য যে ব্যবস্থা থাকে, তার নাম সাইড ইঞ্জেক্টেড থ্রাস্ট ভেক্টর কন্ট্রোল (Side Injected Thrust Vector Control, সংক্ষেপে SITVC)। SITVC ব্যবস্থায়, এক উচ্চগতিবেগ সম্পন্ন গ্যাস স্রোত পাশ থেকে ঢুকিয়ে দিয়ে, মোটর নির্গত মূল গ্যাসের স্রোতের দিশা বদলে দেওয়া হয়। উৎক্ষেপণীর এগিয়ে যাওয়ার দিশা যেহেতু মূল উত্তপ্ত গ্যাস স্রোতের ঠিক বিপরীতে, এই গ্যাস স্রোতের দিশার পরিবর্তনে তাই হয় উৎক্ষেপণীটিরও দিশা পরিবর্তন। ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে দিশা পরিবর্তনের ব্যবস্থাটিকে বলে গিম্বালিং (Gimbaling)। গিম্বালিং মানে এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোনও বস্তুকে উল্লম্ব বা অনুভূমিকভাবে রেখে দেওয়া যায়। বস্তুটির পারিপার্শ্বিক যদি দোলে বা নড়েও, গিম্বালিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বস্তুটি কিন্তু তার অবস্থা আগের মতোই রাখতে পারে। জাহাজে ব্যবহৃত দিকনির্ণয়কারী কম্পাসটি গিম্বালিং-এর সাহায্যে, অনুভূমিকাভাবে রাখা সম্ভব হয়। সমুদ্রের ঢেউ জাহাজকে ওলটপালট করলেও, গিম্বালিং ব্যবস্থা মূলত মাধ্যাকর্ষণের ব্যবহারে, কম্পাসটিকে ঠিক অনুভূমিক ভাবে রেখে দেয়, দিক নির্ণয়ে কোনও অসুবিধা হয় না। ইঞ্জিনের প্রায় শঙ্কু আকৃতির, নির্গমন পথ বা নজল্ (Nozzle) এই গিম্বালিং-এর সাহায্যেই এমনভাবে থাকে, যাতে উৎক্ষেপণীর সামান্য দিশা পরিবর্তন হলেও উত্তপ্ত গ্যাস সবসময় উল্লম্বভাবে নীচের দিকেই নির্গত হয়। ফলে ক্ষণিকের জন্য দিশা পরিবর্তন হলেও, উৎক্ষেপণীটি আবার সঠিক দিশায় ফিরে আসে। PSLV-এর কঠিন জ্বালানির স্তরটি, আজ অবধি, পৃথিবীতে যত কঠিন জ্বালানির স্তর ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে বড়। মঙ্গলযানকে মাথায় করে PSLV-র এটি ২৫তম অভিযান। তাই C25। আসলে যেই উচ্চতায় তুলে মঙ্গলযানকে মুক্তিবেগ সরবরাহ করা

হয় তা যে PSLV-এর একার পক্ষে তোলা সম্ভব নয়, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়, মঙ্গলযানের পরিবৃত্তাকার কক্ষপথ, ৫-ধাপে, পর্যায়ক্রমে, লম্বা করার কৌশল অবলম্বন করা থেকে। এত জটিল কৌশল অবলম্বন না করে যদি একটি ধাক্কায় ভূস্থিত কক্ষপথে মঙ্গলযানকে বসিয়ে দেওয়া যেত, তাহলেই তো সুবিধা হত—এমনটা করা হল না কেন? তার কারণ সেক্ষেত্রে পেলোডের ওজন আরও কম করতে হত অথবা ব্যবহার করতে হত অনেক জোরদার এক উৎক্ষেপণী। বেশি শক্তিশালী উৎক্ষেপণী হিসাবে উপযুক্ত ছিল ভারতের GSLV বা (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) বা ভূসমলয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণী। আসলে, ৫ নভেম্বরের আগে পর্যন্ত GSLV-এর মাধ্যমে যে কটা অভিযান চালানো হয়েছিল, তার কোনওটাই সফল হয়নি। কারণ, GSLV-এর অপরিহার্য, শক্তিশালী ক্রাইয়োজেনিক স্তরটির আশানুরূপ কাজ না করতে পারা।

মঙ্গল অভিযানের উদ্দেশ্য এবং মঙ্গলযানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চালানোর যন্ত্রপাতি

GSLV সময়মতো তৈরি না হওয়ায় মঙ্গলযান পেলোড মাত্র ১৩৪০ কিলোগ্রামের মধ্যে রাখতে হয়েছিল। তাই মঙ্গলযানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর যন্ত্রপাতি রাখতে হয়েছে খুব কম। ইস্‌রোর বিজ্ঞানীরা তাই এই মঙ্গল পরিক্রমাকারী অভিযানকে দেখতে চেয়েছেন এক পরীক্ষামূলক অভিযান হিসেবে। কী কী পরীক্ষিত হল এই অভিযানে? ১) একদম স্বদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি মঙ্গল পরিক্রমাকারী মঙ্গলযানের যাত্রার পরিকল্পনাটি। অর্থাৎ পৃথিবী প্রদক্ষিণকালীন কক্ষপথের আকার পরিবর্তনের কৌশল, ৩০০ দিনের পৃথিবী—মঙ্গল যাত্রার পন্থা এবং সব শেষে মঙ্গলের আবেশে ঢুকে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি। ২) পৃথিবী থেকে সুদূর মহাশূন্যে একটি মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং যানটিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে ব্যবস্থা অর্থাৎ, ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক (Deep Space Network) তৈরিতে ভারত কতটা সফল, পরীক্ষা হল তাও। ৩) সব শেষে, এও পরীক্ষিত হল যে পৃথিবী থেকে কোনও নির্দেশ না পাঠিয়ে মহাকাশযানটির নিজস্ব ব্যবস্থার সাহায্যেই আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলা সম্ভব।

এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল থেকে যে দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা ইস্‌রো অর্জন করেছে বা করছে তার সাহায্যে আরও বড় মাপের এক মঙ্গল অভিযান হয়তো ইস্‌রোর পরবর্তী লক্ষ্য। মঙ্গলযানের এখনও পর্যন্ত যা সাফল্য তার থেকে এটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে ভারতের বৃহত্তর মঙ্গল অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এবার আসা যাক মঙ্গলযানস্থিত সামান্য সংখ্যক যন্ত্রপাতিগুলির কথা। এই যন্ত্রপাতিগুলি হল ১) লিমান আলফা ফটোমিটার (LAP), ২) মিথেন সেন্সর ফর মার্স (MSM), ৩) মার্স এক্সস্ফেরিক নিউট্রাল কম্পজিশন এনালাইসার (MEA), ৪) মার্স কালার ক্যামেরা (MCC) এবং ৫) থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজিং স্পেক্ট্রোমিটার (TIS)। LAP-এর সাহায্যে নির্ণয় করা যাবে মঙ্গলের বহির্বায়ুমণ্ডলের হাইড্রোজেন এবং তার আইসোটোপ ডয়টেরিয়ামের অনুপাত। এই অনুপাতের নির্ণয়ে বোঝা যেতে পারে মঙ্গলের উপর থেকে জল হারিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের মিথেন অনুসন্ধান ও তার পরিমাণ নির্ণয় করতে সক্ষম MSM। মিথেনের অস্তিত্ব বলতে পারে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। MEA মঙ্গল পৃষ্ঠের গঠন সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে। MCC পাঠাবে মঙ্গলের নানা স্থানের নানা চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ ছবি। আর TIS দেবে মঙ্গলের নানা খনিজের হদিশ। যদিও সংখ্যায় সামান্য, তবু কে বলতে পারে, এই সামান্য যন্ত্রের সাহায্যেই হয়তো মঙ্গল সম্বন্ধে এমন নতুন তথ্যের হদিশ পাওয়া যেতে পারে যা খুলে দিতে পারে গবেষণার নতুন দিগন্ত।

মঙ্গলযান অভিযানের প্রয়োজনীয়তা

এই নিবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে মঙ্গলযান অনেক ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। একইসঙ্গে এও বলা হয়েছে যে মঙ্গলযান আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কটাক্ষ উদ্রেককারীও বটে। মঙ্গলযান নিয়ে এমন দ্বিমতের কারণ মূলত এর পেছনে খরচ হওয়া বিশাল অর্থের পরিমাণ ৪৫০ কোটি টাকা। অন্যান্য দেশে, এমন একটি মহাকাশ অভিযানে যা অর্থ খরচ করা হয় তার তুলনায় এই অর্থের পরিমাণ নেহাতই নগণ্য। উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, সাম্প্রতিক মঙ্গল অভিযানকারী, 'মাভেন' (Maven) মহাকাশযানের কথা। মাভেন-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে। পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য মাভেন বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ হলেও, তার অভিযান পরিকল্পনা প্রায় মঙ্গলযানের মতোই। কিন্তু এই অভিযান চালাতে খরচ হয়ে গেছে মঙ্গলযানের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ অর্থ। এই তথ্যের দিকে নজর রেখেই হয়তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে হলিউডের একটি সিনেমা "গ্রাভিটি" বানাতে যা খরচ হয়েছে, মঙ্গলযানের পেছনে খরচ প্রায় সেই অর্থটুকুই।

কৃতিত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও ভারতের সফল মঙ্গলযান অভিযান কোনও অংশে কম নয়। এখনও পর্যন্ত কোনও দেশ প্রথম প্রচেষ্টাতেই মঙ্গল অভিযানে সফল হতে পারেনি, আজ্ঞে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই কৃতিত্বের অধিকারী নয়। এশিয়ায়, ভারতই প্রথম সফল মঙ্গল অভিযান করতে পেরেছে। রাশিয়ার সহায়তায় চীনের মঙ্গলাভিযান প্রচেষ্টা এবং মৌলিকভাবে জাপানের প্রচেষ্টা বহু আগেই চালানো হলেও, এই দুটিই শুরুর দিকেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

সেই ১৯৬৯-এ 'নাসা' (National Aeronautics and Space Administration, NASA)-র অ্যাপোলো-১১-এর মাধ্যমে নীল আর্মস্ট্রং-এর সফল চন্দ্রাবতরণ থেকে আমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমাদের অনেকের মতেই, মানুষ না পাঠাতে পারলে কোনও মহাকাশ অভিযানে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করা যায় না। এই ধারণাটি কিন্তু ঠিক নয়। 'চাঁদে বা মঙ্গলে পৌঁছাল মানুষ', খবরের কাগজে এমন একটা শিরোনাম সত্যিই খুব রোমাঞ্চকর, তবে ওইটুকুই। বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তির উন্নতি মানুষকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে এমন এক ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে প্রথমেই মানুষ পাঠিয়ে দেওয়া এখন নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র যন্ত্রের সাহায্যেই অনেক জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন সেরে ফেলা যায়, তাই প্রথমেই, কোনও অভিযানে মানুষ পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো নিষ্প্রয়োজন। তাই এইদিক দিয়ে দেখলেও মঙ্গলযানের সাফল্য কিছু কম নয়।

কৃতিত্ব নিশ্চয়ই কিন্তু অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে, শুধুমাত্র কৃতিত্ব অর্জনে, ৪৫০ কোটি টাকা খরচ করে ফেলা বাড়াবাড়ি। ভারতের দারিদ্র এমন দৃষ্টিকোণ নেওয়ায় আমাদের বাধ্য করে। একথা হয়তো আমাদের অনেকেরই মনে হয় যে এই ৪৫০ কোটি টাকা হয়তো লাগানো যেতে পারত দারিদ্র দূরীকরণের মতো বা সব ভারতবাসীকে পানীয় জল সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে? ২০১৩-১৪ সাধারণ বাজেটে বরাদ্দ করা হয় ১৬,৬৫,২৯৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ জনপ্রতি ১৪,৫০০ টাকা। চাষবাসের খাতে জনপ্রতি বরাদ্দ করা হয় প্রায় ২৩৫ টাকা করে। MGNREGA ('মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা')-এর মতো গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়, জনপ্রতি প্রায় ২৮০ টাকা করে। এই বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও, কার্যক্ষেত্রে এইসব খাতে খরচ হয় বরাদ্দ অর্থের বেশ কিছুটা কম। আসলে বরাদ্দ আর খরচ হওয়া অর্থের মধ্যে ফারাক হওয়ায় তার কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে গাফিলতি এবং চূড়ান্ত দুর্নীতি এবং অন্যান্য কারণে এই ধরনের গাফিলতি এক বিরাট সমস্যার আকার নিয়েছে যা এখন সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান। এমন সমস্যার জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কখনওই দায়ী নয়, বরঞ্চ, এমন সমস্যা দূরীকরণে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে এক বড় ভূমিকা নিতে পারে। এদিকে জনপ্রতি হিসাবের নিরিখে মঙ্গল অভিযানের বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৪ টাকা। ২৮০ টাকা বা ২৩৫ টাকার সাপেক্ষে এই ৪ টাকা একেবারে ফেলনা না হলেও খুবই কম।

কেউ কেউ মনে করেন যেকোনও আর্থিক হিসাবই আসলে আপেক্ষিক, তাই হয়তো একেবারে সবদিক দিয়ে তা সঠিক নয়। এই অভিযোগও একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। মঙ্গলযানের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে, তাই, এই শেষ কথাকটি বলে এই নিবন্ধের ইতি টানব। ১৯৭৫-এর আগে অতি সামান্য ব্যবস্থাপনায়, বিক্রম সারাভাইয়ের তত্ত্বাবধানে যখন ভারতের মহাকাশ যাত্রা এবং সেই সংক্রান্ত গবেষণার তোড়জোড় শুরু, প্রায় তখন থেকেই, এই প্রচেষ্টা, ভারতে সামগ্রিকভাবে এবং সঠিক কারণে সাড়া জাগাতে হয়েছিল ব্যর্থ। ১৯৭৫-এ 'আর্যভট্ট'-এর সফল উৎক্ষেপণের সময়, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের প্রকল্পটিকে, বহুল অর্থের খরচে নেহাত ছেলেখেলা বলেই মনে হয়েছিল অনেকের। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকল্পের নানা সুফলে আমরা এখন এতটাই অভ্যস্ত যে এই ২০১৪-এ দাঁড়িয়ে সেই ১৯৭৫-এ এমন প্রকল্পকে ছেলেখেলা মনে করার ব্যাপারটাই এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত। এর কারণ আছে। ভারতবাসীর বেশিরভাগ আজও গ্রামের মানুষ। শুধু শহরবাসীর জীবন নয়, কৃত্রিম উপগ্রহ আমূল পালটে দিয়েছে তাদের জীবনও। এই উপগ্রহগুলির দ্বারা আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নতির কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্তমানে, বড় ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা জারি করা যাচ্ছে অনেক তাড়াতাড়ি। কেন্দ্র বা রাজ্য প্রশাসন, এমন ঝড় মোকাবিলায়, আরও সংগঠিত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হচ্ছে। বাঁচানো যাচ্ছে অনেক মানুষের প্রাণ। সঠিক সময় সতর্কবার্তা পেয়ে উপকূল অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা আগে থেকেই সমুদ্রে যাওয়া বন্ধ রাখছেন, মাঝ সমুদ্রে গিয়ে আর বিপদে পড়তে হচ্ছে না। আবহাওয়া যেদিন স্বাভাবিক থাকছে আবার এই উপগ্রহের সাহায্যেই তাঁরা জানতে পারছেন সমুদ্রের কোনও অংশে বেশি মাছ পাওয়া যাবে। এছাড়াও এমন উপগ্রহের সাহায্যে খনিজের সন্ধান করা যাচ্ছে অনেক সহজেই। এমনটা যে হতে পারে, মহাকাশ প্রকল্পের একেবারে গোড়ায়, তা বেশিরভাগ ভারতবাসীরই কাছে ছিল স্বপ্নাতীত। তবু এটাই এখন বাস্তব।

কোনও দেশ এমন মহাকাশ কর্মসূচি গ্রহণ করলে, সরাসরি এই কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নতি হবেই। কিন্তু প্রযুক্তিগত বৃদ্ধি এখানেই থেমে থাকে না। পরোক্ষভাবে আরও অনেক প্রযুক্তির উন্নতি হতে থাকে। এই উন্নতিগুলি মহাকাশ কর্মসূচি ছাপিয়ে মানুষের রোজকার জীবনেও কাজে আসে। এমন কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রযুক্তি ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের মহাকাশ কর্মসূচিতেও কাজে আসতে পারে, আমদানি হতে পারে বিদেশি মুদ্রা। মঙ্গলে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের অনেকদিনের কৌতূহল এই নিয়ে কত যে জল্পনা-কল্পনা, তার কোনও শেষ নেই। মঙ্গলে সত্যি সত্যি প্রাণের সাড়া পাওয়া গেলে একদিকে যেমন প্রমাণ পাওয়া যাবে যে এই বিশ্বসংসারে আমরা একা নই, এও বোঝা যাবে যে পৃথিবীর বুকে কীভাবে হয়েছিল প্রাণের সৃষ্টি। এখনই ভারতের মঙ্গল অভিযান নিয়ে কাটাছেঁড়া আসলে অযৌক্তিক। তার থেকে বরং একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা যাক। দেখাই যাক না এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা কী কী জানতে পারি? বলা যায় না, একদিন এই সব তথ্যই হয়তো বলে দিতে পারে দারিদ্র দূরীকরণের উপায়ও। আর তাই হয়তো শেষমেশ 'মঙ্গল-যাত্রাই' করেছে 'মঙ্গলযান'।❑

[লেখক শ্রীরামপুর কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

email : dipankarghosh74@gmail.com]

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৮ সেপ্টেম্বর—২০ অক্টোবর, ২০১৪)

বহির্বিশ্ব

● **অখণ্ড রয়ে গেল গ্রেট ব্রিটেন :**

আলাদা হচ্ছে না স্কটল্যান্ড। তিনশো সাত বছরের ঐতিহ্য বজায় রেখে গ্রেট ব্রিটেনে থাকার পক্ষেই রায় দিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ স্কটল্যান্ডবাসী। গ্রেট ব্রিটেন থেকে স্কটল্যান্ড আলাদা হয়ে যাবে কি না, তা ঠিক করতে ১৮ সেপ্টেম্বর ভোট দেন স্কটল্যান্ডের বাসিন্দারা। মোট ৪৩ লক্ষ ভোটারের ৫৫ শতাংশ ইউনিয়ন জ্যাকের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে যাওয়াই স্থির করেন। ৪৫ শতাংশ মানুষ পৃথক স্কটল্যান্ডের পক্ষে রায় দেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ও ব্রিটেনের মিত্র রাষ্ট্রগুলি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, স্কটল্যান্ড ঘিরে 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর লড়াইয়ে জাতিগত আবেগকে পরাস্ত করে বাস্তবতারই জয় হয়েছে। 'স্বাধীন' স্কটল্যান্ড মানেই অনিশ্চয়তা। শুধুমাত্র আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ডেকে আনতে রাজি হননি বেশিরভাগ স্কটিশ। কারণ পৃথক একটা দেশ মানেই নতুন নতুন সমস্যা। মোটামুটি সচ্ছল, সমৃদ্ধ স্কটিশরা সেই সব সমস্যার মুখোমুখি হতে চাননি। অন্যদিকে, স্বাধীন স্কটল্যান্ডের স্বপ্ন যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই তরুণ প্রজন্মের অথবা দেশের প্রান্তিক মানুষজন, যেমন চাষি বা মৎস্যজীবী। এঁরা নতুন রাষ্ট্র তৈরি হলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়ার আশা করেছিলেন।

● **কুর্দ শরণার্থীর স্রোত তুরস্কে :**

সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট বা আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর তৎপরতা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সেখানকার কুর্দ জনগোষ্ঠীর জীবনে চরম অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে। ২০১০-১১ সালে সরকার বিরোধী গণবিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে সিরিয়া থেকে কুর্দ জনতা নিজস্ব বাসভূমি ছেড়ে তুরস্কে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে স্রোতের মতো শরণার্থীরা সীমান্ত পার করে তুরস্কে ঢুকে পড়ছেন। এর ফলে তুরস্কের দুর্বল অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ পড়ছে। শরণার্থীর চাপ সামলাতে জেরবার তুরস্ক প্রশাসন শেষ পর্যন্ত সীমান্ত বন্ধের নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছে।

কুর্দদের নিজস্ব কোনও মাতৃভূমি নেই। ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরান-সহ উপসাগরীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কুর্দদের বসবাস। সর্বত্রই তাঁরা পরবাসী এবং নিপীড়িত।

● **পাকিস্তানে নতুন আইএসআই প্রধান :**

লেফটেন্যান্ট জেনারেল রিজওয়ান আখতার পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টালিজেন্স)-এর নতুন প্রধান নিযুক্ত হলেন। পাক সেনাপ্রধান জেনারেল রাহিল শরিফের সুপারিশ মেনে আখতার-এর নিয়োগে অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। ১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণ করেন রিজওয়ান আখতার। প্রসঙ্গত আইএসআই প্রধানকে পাক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেও, তাঁর কর্মপদ্ধতি ঠিক করেন সামরিক প্রধান।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রিজওয়ান আখতার এমন একটা সময় আইএসআই প্রধান হলেন যখন বিরোধী নেতা ইমরান খান এবং ধর্মীয় নেতা তাহির-উল-কাদরির আন্দোলনে জেরবার নওয়াজ শরিফ। এমনও শোনা গেছে যে, আগের গোয়েন্দা প্রধান জাহির-উল-ইসলাম বিরোধী আন্দোলনকে মদত দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শরিফ জাহির-উল-কে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাই তাঁর অপসারণে নওয়াজ প্রশাসন স্বস্তি ফিরে পেল।

● **জাপানে অগ্ন্যুৎপাত :**

গত ২৮ সেপ্টেম্বর জাপানের রাজধানী টোকিয়ো থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে থাকা ওনতাক পর্বতে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে ৪৫ জন প্রাণ হারালেন। এরা সকলেই পর্যটক। ৩,০৬৭ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট মাউন্ট ওনতাকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে বছরের এই সময়টায় হাজার হাজার পর্যটক হাজির হন ওই অঞ্চলে। কিন্তু তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন প্রকৃতির রুদ্র রূপ। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমের উনজেন পর্বতের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল গলিত লাভা, আগ্নেয় পাথর, পুরু আগ্নেয় ছাই ও ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ৪৩ জনের প্রাণ গিয়েছিল প্রকৃতির রোষে।

● **আফগানিস্তানে নতুন রাষ্ট্রপতি ও নিরাপত্তা চুক্তি :**

দীর্ঘ দিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন একদা দেশের অর্থমন্ত্রী আশরাফ গনি। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাইয়ের পর আফগানিস্তানে উন্নতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব বর্তাল তাঁর কাঁধেই। এই প্রথম আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এলেন কোনও রাষ্ট্রপতি। ক্ষমতা হাতে পেয়েই মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে একটি নতুন নিরাপত্তা চুক্তিতে সই করলেন। চুক্তির লক্ষ্য, ২০১৪ সালের পরেও যাতে আফগান ভূখণ্ডে মার্কিন বাহিনী থাকতে পারে। উল্লেখ্য, পূর্বতন রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন। যাই হোক, নতুন চুক্তি অনুযায়ী যা দাঁড়াল, তা হচ্ছে, ২০১৪-র শেষে 'বেশিরভাগ' (সম্পূর্ণভাবে নয়) মার্কিন সেনা আফগান ভূমি ছেড়ে চলে যাবে। ৯৮০০ জন সেনা তার পরেও থেকে যাবে।

● **হানাদারিতে বিধ্বস্ত গাজার পুনর্গঠনে সম্মিলিত উদ্যোগ :**

ইজরায়েলি সেনার নির্বিচার হানাদারিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখণ্ডের পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে গত ১২ অক্টোবর মিশরের রাজধানী কায়রোতে

বিশ্বের ১৩টি দেশ এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হন। মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাতাহ এল-সিসি-র সভাপতিত্বে ওই সম্মেলনে বলা হয়ে যে, বিধ্বস্ত গাজা ভূখণ্ডের পুনর্গঠনে ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার প্রয়োজন। সম্মেলনে উপস্থিত পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম ধনী দেশ কাতারের প্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ ১০০ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য দেশও সাধ্যমতো আর্থিক ও মানবিক সহায়তার আশ্বাস দেয়। এদিকে, মার্কিন প্রশাসন গাজা ভূখণ্ডের পুনর্গঠনে ২১২ কোটি ডলার সাহায্যের কথা ঘোষণা করে। যাই হোক, আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মিলিত উদ্যোগে গাজা ভূখণ্ডে ফের প্রাণ ফিরে আসুক, এটাই সকলের প্রার্থনা।

● **হংকং-এ গণতন্ত্রের দাবি ও চীনা প্রশাসনের ভূমিকা :**

চীন শাসিত হংকং-এ গণতন্ত্রের দাবিতে গণ আন্দোলন এই মুহূর্তে কার্যত নিয়তির বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। আন্দোলন দমনে কমিউনিস্ট প্রশাসন এবার কঠোর হতে শুরু করেছে আর তা ক্রমশ তিন দশক আগের তিয়েনানমেন স্কোয়ারের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে। ব্যাপক আশঙ্কা জাগিয়ে তুলছে। কিন্তু কেন এই জনবিক্ষোভ? সংবাদে প্রকাশ, ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনের হাত থেকে হংকং-এর শাসনভার চীনের হাতে চলে যাওয়ার পর থেকে এখানকার বাসিন্দারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছেন। সেই দাবি মতো ২০১৭ সালে হংকং-এ গণতান্ত্রিক নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু চীন প্রশাসন সেই নির্বাচনকে পুরোপুরি নিজেদের কবজায় রাখতে চায়। নির্বাচনে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সেটাও কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠী ঠিক করে দেবে। এই নিয়েই এখানকার আন্দোলন এবং প্রশাসন যেভাবে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, তা গভীর উদ্বেগের।

● **তৃতীয়বারের জন্য বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি হলেন মোরালেস :**

টানা তিনবার বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে বিরল নজির গড়লেন ইভো মোরালেস। আর প্রতিবারই তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা আগের বারের তুলনায় বাড়ছে। এতে প্রমাণ হয় যে মোরালেসের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে তাঁর অনুসৃত আর্থিক নীতির ওপর। মোরালেস বলিভিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজের বিপুল ভাণ্ডার রাষ্ট্রায়ত্ত করে তার ওপর বলিভিয়ার অর্থনৈতিক অধিকার ফের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

● **নেপালের পাহাড়ে বড় দুর্ঘটনা :**

পর্বতারোহীদের স্বর্গরাজ্য নেপালের পশ্চিমে অন্নপূর্ণা পর্বতশৃঙ্গের খোংরা গিরিপথে গত ১৫ অক্টোবর তুষারঝড়ে কমপক্ষে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা প্রায় সকলেই পর্বতারোহী বা পর্যটক এবং অধিকাংশই বিদেশি। প্রশাসন সূত্রে প্রকাশ, নেপালের পাহাড়ে এতবড় দুর্ঘটনা এর আগে হয়নি। উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিলে, মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানের সময় তুষারঝড়ে ১৬ জন শেরপা গাইডের মৃত্যু হয়।

● **গানের আসরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা :**

দক্ষিণ কোরিয়ার সিওৎনামে এক প্রেক্ষাগৃহে অতি জনপ্রিয় গানের ব্যান্ড 'ফোর্থ মিনিট'-এর অনুষ্ঠান চলাকালীন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ২০ জন মারা যান। সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ অক্টোবর গান শুনতে হাজির ছিলেন প্রায় ৭০০ শ্রোতা। বসার আসন না পেয়ে অতি উৎসাহী কয়েকজন শ্রোতা প্রেক্ষাগৃহের ভেন্টিলেশন গেটের ওপর দাঁড়িয়ে গান শুনছিলেন। অতিরিক্ত ভারে গেটটি ভেঙে যায়। গেটের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারান ২০ জন। আহত হন শতাধিক।

● **ঘূর্ণিঝড়ে তাণ্ডব বারমুডা দ্বীপপুঞ্জে :**

ঘূর্ণিঝড় 'গঞ্জালো'-র তাণ্ডবে কার্যত তছনছ হয়ে গেল অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ বারমুডা। ঝড়ের সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ১৭৫ কিলোমিটার। সঙ্গে ছেদহীন তুমুল বৃষ্টি। বারমুডা, বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। ঝড়ের ঝাপটায় সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে ঘূর্ণিঝড়ে 'ফেবিয়ান'-এর (যার ধাক্কায় বারমুডার আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল ৩০ লাখ ডলার) পর এমন বিধ্বংসী ঝড় দেখেননি বারমুডার ৭০ হাজার বাসিন্দা। সর্বশেষ খবর, ব্রিটেন-সহ আন্তর্জাতিক সহায়তায় বারমুডায় পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

এই দেশ

● **কয়লা খনি বণ্টনের সিদ্ধান্ত বাতিল শীর্ষ আদালতে :**

বেআইনিভাবে বিলি করা কয়লার ব্লক নিয়ে কঠোর ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নিল সুপ্রিম কোর্ট। ১৯৯৩ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিলি করা ২১৮টির মধ্যে ২১৪টি ব্লকের ছাড়পত্র (লাইসেন্স) বাতিল করে দিল সর্বোচ্চ আদালত। চারটি ব্লক-কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কারণ, এর মধ্যে দুটি ব্লক আলট্রা-মেগাবিদ্যুৎ প্রকল্পের (৪০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন) সঙ্গে যুক্ত এবং বাকি দুটি রয়েছে দুই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (NTPC ও SAIL) হাতে। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে আগামী দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলিকে বেশি দামে কয়লা কিনতে হবে এবং তার জেরে বিদ্যুতের দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট ওই কয়লাগুলি বেআইনিভাবে বণ্টন করা হয়েছে বলে রায় দেয় (যোজনা, অক্টোবর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

● **দুর্নীতি মামলায় জেল ও জামিন জয়ললিতার :**

হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় দোষী সাব্যস্ত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম জয়ললিতাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৪ বছরের কারাদণ্ড দিল বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালত। সঙ্গে ১০০ কোটি টাকা জরিমানা। শুধু জয়ললিতা নন। একই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে গেলেন জয়ললিতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শশীকলা, জে এলাভারাসি ও ভি এন সুধাকরণ। তাঁদেরও ৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে জরিমানা ১০ কোটি। এই রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই জয়ললিতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে হয়। এছাড়াও শীর্ষ আদালতের নির্দেশমতো, আগামী ১০ বছর তিনি ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না।

বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালতের বিচারপতি জন মাইকেল ডি'কুন্‌হা তাঁর রায়ে জানান, প্রায় ৬৬.৬৫ কোটি টাকার হিসাববহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী দোষী। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় বেতন নিতেন মাসে মাত্র এক টাকা।

সম্পত্তি ছিল ৩ কোটি টাকার। মেয়াদ শেষে (মাত্র ৫ বছরে) তা দাঁড়ায় ৬৬.৬৫ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে জয়ললিতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করেন জনতা পার্টির (বর্তমানে বিজেপি) নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। পরে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগম বা ডিএমকে সাধারণ সম্পাদক কে আনবাজাঘান তা চালিয়ে নিয়ে যান। ১৮ বছর অজস্র ওঠা-নামা, বিতর্ক ও টানাপোড়েনের পর অবশেষে রায় বেরোয়।

এদিকে, তামিলনাড়ুর অর্থমন্ত্রী পনিরসেলভাম মুখ্যমন্ত্রী পদে জয়ললিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

সর্বশেষ খবর, বেঙ্গালুরুর আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে কর্ণাটক উচ্চ আদালত, পরে সুপ্রিম কোর্টে যান জয়ললিতা। ১৭ অক্টোবর শীর্ষ আদালত শর্তাধীন জামিনে মুক্তি দেয়।

● **উত্তর-পূর্বে 'মিটার গেজ'-এর পরিবর্তে 'ব্রডগেজ' রেলপথ :**

উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, অসমের বারাক উপত্যকা ও পশ্চিম মণিপুর থেকে সরু মিটার গেজ (অর্থাৎ হাজার মিলিমিটার চওড়া) লাইন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেলের নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার শাখা। তার পরিবর্তে সেখানে ব্রডগেজ লাইন বসানোর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে কাজও শুরু হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমল থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিবহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে মিটার গেজ রেললাইন। কিন্তু এই মুহূর্তে তা স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

● **প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সারসংক্ষেপ :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চারদিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করে এলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি রওনা দেন। ২৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দেন। ভাষণে 'বিশ্বকে সন্ত্রাস মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ' হওয়ার ডাক দেন। পাশাপাশি আর্থিক বৃদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ওই দিনই নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে ভাষণ দেন। ২৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন মুলুকের ১১ জন শিল্প প্রতিনিধি (সিইও) ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে মিলিত হন। ৩০ সেপ্টেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। সন্ত্রাসবাদ, বাণিজ্য বিনিময়, পরমাণু শক্তি, ভিসা প্রথার সরলীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে দু'রাষ্ট্রনেতা মত বিনিময় করেন। ১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লি ফিরে আসেন।

● **ভারতে নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত :**

ভারতীয় বংশোদ্ভূত রিচার্ড রাহুল ভার্মা ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত মনোনীত হলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসাবে তিনিই হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মার্কিন বিদেশ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পেলেন। এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত, নিশা দেশাই বিসওয়াল। উল্লেখ্য, গত মার্চে 'প্রোটোকল' সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত পদত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৬ মাস পরে (সেপ্টেম্বরে) রাহুল ভার্মা নতুন রাষ্ট্রদূত হয়ে এলেন। আইনবিশেষজ্ঞ ভার্মা এতদিন প্রাক্তন মার্কিন বিদেশ সচিব ম্যাডেলিন অলব্রাইটের প্রতিষ্ঠান 'স্টোনব্রিজ গ্রুপ'-এর আইনি পরামর্শদাতার কাজ করছিলেন।

● **রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয় জানাতে ফের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের :**

ভোটের রাজনীতিতে অর্থশক্তির প্রভাব খর্ব করতে ফের নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন। ৬ অক্টোবর প্রকাশিত এক নির্দেশে, ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব পেশ করতে বলা হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি দলের দৈনন্দিন খরচ থেকে শুরু করে সভা-সমাবেশ-আপ্যায়ন ইত্যাদি খাতে আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান (রিটার্ন) নির্দিষ্ট বয়ানে প্রতি বছর ৩১ অক্টোবরের মধ্যে পেশ করতে হবে। 'স্বচ্ছতা ফেরানো'-র লক্ষ্যে জারি করা ওই নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বার্ষিক হিসাব পেশের সঙ্গে অর্থদাতাদের তালিকা (ডোনার লিস্ট) জমা দিতে হবে।

● **ঘূর্ণিঝড় 'হুদহুদ'-এর ধাক্কা দুই রাজ্যে :**

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতো ১২ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আছড়ে পড়ল অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'হুদহুদ'। ঘণ্টায় ১৭৫ কিলোমিটার গতিতে। এর উৎস আন্দামান সাগর। শুধু অন্ধ্রপ্রদেশ নয়, ঝড়ের জেরে তছনছ হয়ে যায় ওড়িশার একটি বড় অংশও। দুটি রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা বিধ্বস্ত। বিশাখাপত্তনম শহর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ঝড়ের দাপটে। মৃতের সংখ্যা ২৪। পরে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩।

আগে থেকে জানা গেলে এবং ঠিকমতো প্রস্তুতি নিলে যে ব্যাপক প্রাণহানি রোখা যায় আরও একবার তার প্রমাণ মিলল। আগে থেকে দুই রাজ্য মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষকে সরিয়ে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়ার ফলেই ব্যাপক প্রাণহানি কমানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা, দু'রাজ্যেরই শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে ঝড়ের আর্থিক ধাক্কাটা কিন্তু সেভাবে সামলানো যায়নি। ঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

● **হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপি :**

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে এই প্রথম ওই রাজ্যে সরকার গঠন করল। ৯০ আসনের বিধানসভায় বিজেপি ৪৭টি আসনে জয়ী হয়। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পায় ১৫টি আসন। অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় লোকদল (আইএনএলডি) ১৯টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। এছাড়াও হরিয়ানা জনহিত কংগ্রেস ২টি এবং নির্দল প্রার্থীরা ৫টি আসন দখল করেছেন।

● **মহারাষ্ট্রে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা :**

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে ওই রাজ্যে বিজেপি ও শিবসেনার ২৫ বছরের জোট এবং কংগ্রেস ও ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) ১৫ বছরের জোট ভেঙে যাওয়ায় ওই রাজ্যে চতুর্মুখী লড়াই হয়। মোট ২৮৮টি আসনের মধ্যে ১২২টি পেয়ে

বিজেপি শীর্ষে থাকলেও, সরকার গঠনের ম্যাজিক ফিগার ১৪৫ ছুঁতে ব্যর্থ হয়। পুরনো জোট সঙ্গী শিবসেনা পায় ৬৩টি আসন। কংগ্রেস ও এনসিপি যথাক্রমে ৪২ ও ৪১টি আসন।

● **স্বাস্থ্য বিমা ও 'আধার' :**

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা-কে (ন্যাশনাল হেল্‌থ অ্যাশিওরেন্স মিশন) দেশের নাগরিকদের আধার নম্বরের সঙ্গে যোগ করার সিদ্ধান্ত জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। অস্তিত্বহীন সুবিধাভোগী ও ভুঁয়ো দাবি (ক্লেম) নিয়ন্ত্রণ করতেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত। সরকার মনে করে, সর্বজনীন স্বাস্থ্য প্রকল্প বা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় আধার নম্বর যুক্ত করা হলে তা প্রকৃতপক্ষে উপযোগী হয়ে উঠবে।

এই রাজ্য

● **পাহাড়ে ফের 'টয় ট্রেন'-এর যাত্রা শুরু :**

বিস্তর টানাপোড়েনের পর দার্জিলিংয়ের পথে ফিরছে স্টিম ইঞ্জিনের টয় ট্রেন। উল্লেখ্য, প্রবল ধসে পাহাড়ে রেলপথের বেশ কিছু অংশ ভেঙে যাওয়ায় চার বছর ধরে বন্ধ ছিল শিলিগুড়ি জংশন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয় ট্রেনের চলাচল। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা 'ইউনেস্কো' দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনকে 'ঐতিহ্যবাহী' (হেরিটেজ) তকমা দেয়।

● **খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে জাতীয় তদন্ত সংস্থা :**

বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি বাড়িতে শক্তিশালী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘিরে রাজ্যে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ২ অক্টোবরের ওই ঘটনায় নিহত হন দুজন আর আহত তিন জন। কিন্তু হতাহতের প্রেক্ষিতে ঘটনাটি তেমন বিরল না হলেও, বিস্ফোরণের পিছনে সন্ত্রাসবাদী সংযোগের সম্ভাবনা থাকায় রাজ্য জুড়ে তুমুল হইচই শুরু হয়ে যায়।

রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ প্রথমে তদন্তে নামে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ-র হাতে তদন্তের ভার তুলে দেওয়া হয়।

● **'জয়েন্ট এন্ট্রান্সে' সর্বউপযোগী পাঠ্যক্রম :**

উচ্চ মাধ্যমিক, আইএসসি, সিবিএসই-সহ বিভিন্ন বোর্ডের পড়ুয়ারা জয়েন্ট এন্ট্রান্স দেন। তাই সমতা রক্ষার জন্য সব বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পাঠ্যক্রম বদলে ফেলা হল। ২০১৫ সালে নতুন পাঠ্যক্রমেই পরীক্ষা হবে। নতুন পাঠ্যক্রমে পরীক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। উল্লেখ্য, আগামী বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স হবে ১৮-১৯ এপ্রিল।

● **ক্ষুদ্র শিল্প পার্কের জন্য আর্থিক সহায়তা :**

শিল্পায়নের চাকা সচল রাখতে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারেই জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের পার্ক গড়তে বেসরকারি সংস্থাকে আহ্বান জানানো হল। আর্থিক সহায়তাও ঘোষণা করল রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তর। এই উৎসাহদান প্রকল্প ২০১৯ সাল পর্যন্ত চালু থাকবে। তবে এই সুবিধা পেতে হলে বেসরকারি সংস্থাকেই বাজার থেকে নিজেদের উদ্যোগে জমি সংগ্রহ করে শিল্প তালুক গড়তে হবে। রাজ্য সরকার জমির কোনও দায় নেবে না।

● **প্লাস্টিক নিষিদ্ধ পাহাড়ে :**

দার্জিলিং পাবর্ত্য অঞ্চলের তিন মহকুমায় (দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং) প্লাস্টিক নিষিদ্ধ ঘোষণা করল গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন (জিটিএ)। ১৯ অক্টোবর জারি করা এক বিবৃতিতে, পাহাড়ের প্রতিটি মানুষকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলা হয়, নচেৎ কঠোর জরিমানা। একইসঙ্গে নজরদারির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা জারির পরেও প্লাস্টিকের ব্যবহার চলছে কি না, তা নজরে রাখতে প্রতি মহকুমায় ৫০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অর্থনীতি

● **রুগ্‌ণতার বদনাম ঘুচল ইসিএল-এর :**

রুগ্‌ণ শিল্পের বদনাম ঘুচল কয়লা উত্তোলনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ডের (ইসিএল)। বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশনের রুগ্‌ণ শিল্পের তালিকা থেকে সংস্থাটিকে বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

● **নেপালের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিনিময় :**

গ্রিডের মাধ্যমে নেপালের সঙ্গে বিদ্যুৎ আদান-প্রদান করার চুক্তিতে সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। দুই দেশের মধ্যে যে বিদ্যুতের লাইন পাতার কাজ চলছে, তা শেষ হলে আগামী দু বছরে দ্বিগুণ বিদ্যুৎ আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, এই চুক্তির ফলে নেপালের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে ভারতীয় সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ পাওয়ার পরিকাঠামো তৈরি করাও সম্ভব হবে।

● **'আলিবাবা'-কে বেসরকারি ব্যাংক খোলার অনুমতি চীনে :**

চীনে বেসরকারি ব্যাংক খুলতে সায় পেল অনলাইন বাণিজ্যিক সংস্থা 'আলিবাবা'। ব্যাংকটিতে ৩০ শতাংশ অংশীদারি থাকবে তাদের। সম্প্রতি, কিছু বেসরকারি সংস্থাকে ব্যাংক চালুর অনুমতি দিয়েছে চীনের কমিউনিস্ট সরকার। গত জুলাইয়ে চীনের আর একটি অনলাইন সংস্থাকেও ব্যাংক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

● **মোটা টাকা কর ফেরত পেল জীবন বিমা নিগম :**

আয়কর দপ্তরের কাছ থেকে সাড়ে এগারো হাজার (১১,৫০০) কোটি টাকার অতিরিক্ত কর জমা ফেরত পেল ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (এলআইসি)। এর ফলে, নিগমের বিমা গ্রাহকেরা ওই টাকার ৯৫ শতাংশ অতিরিক্ত বোনাস হিসাবে পেতে পারেন। বাকি ৫ শতাংশ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে লভ্যাংশ হিসাবে দিতে হবে নিগমকে।

● **শেয়ার বাজারে নিষিদ্ধ ডিএলএফ :**

রিয়েল এস্টেট সংস্থা 'ডিএলএফ' ও সংস্থার চেয়ারম্যান কেপি সিংহ-সহ ৬ শীর্ষ আধিকারিকের ওপর। তিন বছরের জন্য শেয়ার বাজারে যাবতীয় লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা জারি করল শেয়ার বাজার

নিয়ামক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি)। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে মূলধন জোগাড়ের জন্য বাজারে শেয়ার ছাড়ে ডিএলএফ। শেয়ার ছাড়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করার অভিযোগ ওঠে সংস্থার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শেয়ার বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে সংস্থাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সেবি।

● **সেরা 'সেন্ট্রাল ব্যাংক গভর্নর' রাজন :**

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিষয়ক পত্রিকা 'ইউরোমানি'-র বিচারে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুরাম রাজন, এ বছরের 'বেস্ট সেন্ট্রাল ব্যাংক গভর্নর'। পত্রিকার মতে, রাজনের কড়া দাওয়াইয়ে ঘাটতির বোঝা কমিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি। এই কারণেই তাঁকে এই বিশেষ সম্মান।

● **নতুন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ :**

দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন অরবিন্দ সুব্রমনিয়ান। এতদিন তিনি ওয়াশিংটনের বিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সে কর্মরত ছিলেন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারেও (আইএমএফ) কাজ করেছেন।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **মঙ্গল অভিযানে ইতিহাস ভারতের :**

২৪ সেপ্টেম্বর নির্দিষ্ট সময় মেনেই লাল গ্রহের কক্ষপথে ঢুকে পড়ল ভারতের মঙ্গলযান। প্রথম চেষ্টাতেই নিজেদের দূতকে মঙ্গলের কক্ষপথে বসিয়ে দিতে পেরেছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন) বিজ্ঞানীরা। বিশ্বে আগে কেউ যা পারেনি। এদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকেও টপকে গেল ভারত।

প্রসঙ্গত, মঙ্গল অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ২০১২ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর ঘোষণার পর। ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর উৎক্ষেপণ করা হয় মার্স অরবিটার মিশন (মঙ্গলযান)। এর জন্য খরচ পড়ে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। মাত্র ২৫ মাসে মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে যেতে পারেনি কোনও দেশ। এছাড়াও, এর আগে ১৭টি দেশ মিলে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির 'মার্স এক্সপ্রেস' ২০০৩ সালে প্রথম অভিযানেই মঙ্গল পৌঁছলেও, একক দেশের খেতাব চিরকালীনভাবে দখলে নিল ভারত।

● **মঙ্গলের উপগ্রহ :**

মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে প্রবেশের ২০ দিন বাদে গত ১৪ অক্টোবর প্রথম মঙ্গলের সব থেকে বড় উপগ্রহ 'ফোবোস'-এর ছবি পাঠাল ভারতীয় মার্স অরবিটার মঙ্গলযান। ১৪ অক্টোবর ফেসবুকে ইসরো প্রোফাইলে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োয় 'ফোবোস'-কে মঙ্গল গ্রহের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সরে যেতে দেখা যায়, মঙ্গল গ্রহের মাটি থেকে ৬৬,২৭৫ কিলোমিটার দূরে থাকা মঙ্গলযানে লাগানো ক্যামেরায় ওই দৃশ্য ধরা পড়েছে।

● **সমুদ্রের গভীরে পাহাড়ের সন্ধান :**

ভারত মহাসাগরের তলদেশের মানচিত্র নির্মাণের কাজ হাতে নিল অস্ট্রেলিয়ার একদল সমুদ্রবিজ্ঞানী। ওই কাজে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের নজরে আসে সারিবদ্ধ পর্বতশৃঙ্গ। অনুসন্ধানের কাজে বিজ্ঞানীরা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির তৈরি শক্তিশালী উপগ্রহ 'ক্রায়োস্যাট'-এর সাহায্য নেন। সেই উপগ্রহেই ধরা পড়ে যে, সারা বিশ্বে সমুদ্রের তলায় ১৫০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কয়েক হাজার পাহাড় রয়েছে। উল্লেখ্য, 'ক্রায়োস্যাট' তৈরি হয়েছিল প্রধানত মেরু অঞ্চলের পুরু বরফের স্তরের নীচে কী আছে তা দেখার জন্য। কিন্তু ওই উপগ্রহ, সমুদ্রের গভীরে পাহাড়ের সন্ধান দেওয়ার পর বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করছেন যে, এবার সমুদ্রের ভূগোল নতুন করে লেখার সময় এসেছে।

● **নানা বর্ণে চিত্রিত পুরাতত্ত্বের সন্ধান :**

গ্রিসের অ্যামিফিপোলিস অঞ্চলে পুরাতত্ত্ববিদেরা খুঁজে পেলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের একটি সমাধিস্থল। সেখানকার মেঝেতে মিলল মোজাইকের ওপর বহুবর্ণের চিত্রাঙ্কন এবং অপরূপ কারুকার্য। তিন মিটার চওড়া ও সাড়ে চার মিটার লম্বা ওই সমাধিটি কার, তা জানতে জোরদার গবেষণা চালাচ্ছেন ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদেরা।

● **ফের 'ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন হকিং :**

মহাবিশ্ব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাতিয়ার করে 'ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব ফের অস্বীকার করলেন বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। তিনি বলেন, যতদিন মানুষ বিজ্ঞানের খবর রাখত না, ততদিন যে যে বিষয়ের উৎপত্তির কারণ বুঝতে পারত না, তার মূলেই ঈশ্বরের হাত রয়েছে বলে মনে করত। কিন্তু, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক রহস্যের কারণ ও তার ব্যাখ্যা জানতে পেরেছে। তাই, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসও ক্রমশ কমেছে। উল্লেখ্য, স্টিফেন হকিং-এর সাড়া জাগানো বই 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'-এ (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) একটি অধ্যায়ের শিরোনাম 'মাইন্ড অব গড' বা 'ঈশ্বরের মানসিকতা'। ওই অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছিলেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূলে কাজ করেছিল পদার্থবিদ্যার কয়েক সেট সূত্র। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ের পরিস্থিতি যদি ওই সূত্রগুলি সফল হওয়ার মতো না হত, তাহলে কোনওভাবেই তৈরি হত না মহাবিশ্ব। এই প্রথম নয়, অতীতেও একাধিকবার এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ঈশ্বর ও পরকালের বিষয়ে তাঁর কোনও আস্থা নেই বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

● **বয়সকালীন দৃষ্টি সমস্যার নতুন সমাধান :**

ক্যালিফোর্নিয়ার রি-ভিশন অপটিক্সের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি তিলের মতো ছোট একটি জিনিস (প্রযুক্তিগতভাবে যাকে বলা হচ্ছে রেইনড্রপ কর্নিয়াল ইনলে) আবিষ্কার করেছেন, যা কর্নিয়ায় বসিয়ে দিলেই বয়সকালীন দৃষ্টি সমস্যা উধাও হয়ে যাবে। ছোট বৃষ্টি বিন্দুর মতো জিনিসটি আসলে 'হাইড্রোজেল'। এর ৮০ শতাংশই জল। সাধারণ কনট্যাক্ট লেন্সেও হাইড্রোজেল ব্যবহার করা হয়।

● **'নির্ভয়'-এর সফল উৎক্ষেপণ :**

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম দূরপাল্লার প্রথম ক্রুজ মিসাইল 'নির্ভয়'-এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হল।

ওড়িশার চাঁদিপুরে ইন্টিগ্রেটেড মিসাইল টেস্ট রেঞ্জ-এ মোবাইল লঞ্চারের মাধ্যমে ১৭ অক্টোবর উৎক্ষেপণ হল 'নির্ভয়'-এর। ২০১৩ সালের মার্চে প্রথম বার পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয় 'নির্ভয়'-এর। কিন্তু মাঝপথে তা গতিভ্রষ্ট হয়। এবার অবশ্য কোনও ভুলচুক হয়নি। নিখুঁতভাবে ৭০ মিনিট নির্দিষ্ট গতিপথে ১০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করল 'নির্ভয়'।

খেলার জগৎ

● **এশিয়ান গেমসে ভারত অষ্টম :**

দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিওনে সপ্তদশ এশিয়ান গেমসে ১১টি সোনা, ১০টি রুপো ও ৩৬টি ব্রোঞ্জ, মোট ৫৭টি পদক পেয়ে ভারত অষ্টম স্থান পেল। ১৫১টি সোনা-সহ ৩৪২টি পদক জিতে চীন প্রথম। দ্বিতীয় আয়োজক দক্ষিণ কোরিয়া। ৭৯টি সোনা-সহ মোট পদক ২৩৪। ৪৭ সোনা-সহ ২০০ পদক জিতে জাপান তৃতীয়।

২০১০ সালে চীনের গুয়াঝৌ এশিয়াডের তুলনায় ভারত এবার ৩টি সোনা-সহ ৮টি পদক কম পেয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্তও তৈরি করেছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা। যেমন দীর্ঘ ১৬ বছর পরে পুরুষদের হকিতে সোনা, মেয়েদের বক্সিংয়ে মেরি কম, কুস্তিতে যোগেশ্বর দত্ত, স্কোয়াশে সৌরভ ঘোষাল, ডিসকাস থ্রো-তে সীমা পুনিয়া-র সোনা জয়।

● **সবচেয়ে দামি মেরি কম :**

সদ্য সমাপ্ত ইনচিওন এশিয়ান গেমসে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে দামি ক্রীড়াবিদ হলেন মুষ্টিযোদ্ধা মেরি কম। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার স্পনসর স্যামসাং সংবর্ধিত করল এশিয়াডের পদকজয়ীদের। সেই অনুষ্ঠানে এশিয়াডে সোনাজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা মেরি কম ছিলেন মধ্যমণি।

● **সরে দাঁড়ালেন কোভারম্যান্স :**

টানা হারে বিধ্বস্ত ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন উইম কোভারম্যান্স। তাঁর কোচিংয়ে শেষ ম্যাচেও ভারত প্যালেস্তাইনের কাছে ৩-২ গোলে হেরে যাওয়ার পর আর ঝুঁকি নেননি তিনি। উল্লেখ্য, কোভারম্যান্সের কোচিংয়ে ইনচিওন এশিয়াডে ভারত সব কটি খেলায় হেরে যায়। তার আগে প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপ-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও ভারত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

● **মাইকেল ফেল্‌প্স সাসপেন্ড :**

মদ্যপ অবস্থায় বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালানোর অপরাধে বিশ্ববন্দিত মার্কিন সাঁতারু মাইকেল ফেল্‌প্স-কে ৬ মাস সাসপেন্ড করল সাঁতার সংস্থা। এর ফলে রাশিয়ার কাজামে পরের বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না ফেল্‌প্স। উল্লেখ্য, গত দুটি অলিম্পিক আসরে ১৮টি সোনার পদক জয় করে মাইকেল ফেল্‌প্স বিশ্ব সাঁতারে অনন্যসাধারণ নজির গড়েছেন। এমন একজন 'জাতীয় নায়ক'-এর ব্যক্তিগত জীবন সুশৃঙ্খল হওয়া জরুরি বলে মার্কিন সাঁতার সংস্থার পরিচালন কমিটি মনে করে।

● **ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সূচনা :**

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১২ অক্টোবর শুরু হল এ দেশের প্রথম পেশাদার ফুটবল টুর্নামেন্ট 'ইন্ডিয়ান সুপার লিগ' (আইএসএল)। ১৫ কোটি টাকা পুরস্কার মূল্যের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে মোট ৮টি ফ্র্যানচাইজি দল। এগুলি হল—(১) অ্যাতলেতিকো দে কলকাতা, (২) মুম্বই সিটি এফসি, (৩) কেরাল ব্লাস্টার্স, (৪) নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড, (৫) এফসি গোয়া, (৬) এফসি পুনে সিটি, (৭) দিল্লি ডায়নামোস, (৮) চেন্নাইয়িন এফসি। প্রতিটি দল একে অন্যের বিরুদ্ধে দুটি করে ম্যাচ খেলবে। প্রতিযোগিতা চলবে ২ মাস।

● **শাংহাই ওপেন খেতাব ফেডেরারের :**

সুইজারল্যান্ডের তারকা রজার ফেডেরার শাংহাই-তে শাংহাই ওপেন টেনিসের ফাইনালে স্ট্রেট সেটে (৭-৬, ৭-৬) হারিয়ে দিলেন ফ্রান্সের তরুণ তারকা জিল সিমোঁ-কে। চলতি মরশুমে এটি তাঁর চতুর্থ খেতাব। এই জয়ের পর স্পেনের রাফায়েল নাদাল-কে টপকে ফের বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ দুই নম্বরে উঠে এলেন ফেডেরার।

● **অসমাপ্ত ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ :**

ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচ না খেলে দেশে ফিরে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০ অক্টোবর কলকাতার ইডেন উদ্যানে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার (বোর্ড) সঙ্গে খেলোয়াড়দের আর্থিক চুক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়। সিরিজের চারটি ম্যাচের মধ্যে কোচিতে প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ী হয়। আর দিল্লিতে দ্বিতীয় এবং ধর্মশালায় চতুর্থ ম্যাচ ভারত জিতে যায়। বিশাখাপত্তনমে তৃতীয় ম্যাচ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাতিল হয়। সিরিজ বাতিলের ফলে ভারতের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা (BCCI) বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে।

● **জুনিয়র সুলতান জোহর কাপ হকি খেতাব ভারতের :**

মালয়েশিয়ায় জুনিয়র সুলতান জোহর কাপ হকিতে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ফাইনালে ব্রিটেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে পরপর দুবার এই আন্তর্জাতিক হকি খেতাব জিতে নিল ভারতের অনূর্ধ্ব ২১ হকি দল। প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জিতে সাড়া ফেলে দেয় ভারতীয় দল।

বিবিধ সংবাদ

● **পাহাড়বাসীদের নিজস্ব রেডিও স্টেশন উত্তরাখণ্ডে :**

২০০১ সাল থেকেই উত্তরাখণ্ডের মানুষ তাঁদের নিজস্ব রেডিও স্টেশনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এতদিন পরে সেই দাবি পূরণ হল। গত ২১ সেপ্টেম্বর উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার পাহাড়ি মানুষদের নিজস্ব কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের সূচনা হল। নাম দেওয়া হয়েছে 'মন্দাকিনী কি আওয়াজ'। প্রায় দুশোটি প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামকে একসূত্রে বাঁধবে এই রেডিও স্টেশন। কর্তৃপক্ষের ঘোষণা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, অভিবাসন এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থানীয় সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন উপযোগী তথ্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে 'মন্দাকিনী কি আওয়াজ'।

● **জনসংখ্যা-কে ছাপিয়ে মোবাইল সংযোগ :**

ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, চলতি বছরের শেষে বিশ্ব জুড়ে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে বিশ্ব জনসংখ্যা-কে। এই মুহূর্তে পৃথিবী জুড়ে ৬০০ কোটি মোবাইল ফোনের সংযোগ রয়েছে। সমীক্ষায় দাবি, বছরের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৭৩০ কোটি। আর বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা ৭০০ কোটি।

● **গাউন বানিয়ে গিনেস বুকে নাম :**

দীর্ঘতম গাউন (বিয়ের পোশাক) তৈরি করে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুললেন চীনের কয়েকজন কারিগর। তাঁদের তৈরি গাউনটির দৈর্ঘ্য ৪,১০০ মিটার এবং এটিই বিশ্বের দীর্ঘতম গাউন বলে দাবি করেন ওই চীনা কারিগরেরা। খরচ পড়েছে ৪ হাজার পাউন্ড। সংবাদে প্রকাশ, এক মডেল ওই গাউন পরার পর চেংদু প্রদেশের একটি ফুলের খেতে গাউনটির বিরাট অংশ ছড়িয়ে রাখা হয়।

● **একনজরে এবারের নোবেল পুরস্কার জয়ীরা :**

□ **চিকিৎসা বিজ্ঞান :** মানুষের মস্তিষ্কে 'গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম' (GPS) কীভাবে নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়, এমনই এক বিষয়ে সফল গবেষণার জন্য নোবেল পান নরওয়ের দম্পতি মে-ব্রিট ও এডভার্ড মোসের এবং ব্রিটেনের জন ও'কিফ।

□ **পদার্থবিদ্যা :** পরিবেশবান্ধব 'লাইট এমিটিং ডায়োড' (এলইডি) নির্মাণে সাফল্যের স্বীকৃতিতে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন জাপানের ইসামু আকাসাকি ও হিরোশ আমানো এবং জাপানি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী শুজি মাকামুরা।

□ **রসায়নশাস্ত্র :** 'অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপিতে যুগান্তকারী গবেষণা চালিয়ে রসায়নে নোবেল জিতে নেন জার্মানির স্টেফান হেল এবং দুই মার্কিন বিজ্ঞানী এরিক রেটজিগ ও উইলিয়াম মোর্নার।

□ **সাহিত্য :** সাহিত্যে নোবেল পেলেন ফরাসি ঔপন্যাসিক প্যাট্রিক মোদিয়ানো। ইহুদিদের যন্ত্রণা, হারানো সত্তা ও সেই সত্তার খোঁজ বারবার ফিরে আসে তাঁর লেখায়।

□ **শান্তি :** একজন রক্তাক্ত হয়েও নারী শিক্ষার প্রসারে অদম্য, অন্যজন 'বচপন (শৈশব) বাঁচাও' আন্দোলনে অক্লান্ত। প্রথম জন পাকিস্তানের সপ্তদশী মালালা ইউসুফজাই, অন্যজন ভারতের কৈলাস সত্যার্থী।

□ **অর্থনীতি :** বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তত্ত্ব পেশ করে এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান ফরাসি অর্থনীতিবিদ জাঁ তিরোল।

● **নিলামে তায়েব মেহতার ছবি :**

লন্ডনে সথ্‌বির (নিলাম সংস্থা) নিলামে ১১ কোটি টাকায় বিক্রি হল চিত্রশিল্পী তায়েব মেহতা-র ছবি 'ব্লু পেইন্টিং'। ভারতীয় রাজা-রাজড়াদের আমলের শিল্পকলা সমসাময়িক দক্ষিণ এশীয় শিল্পকলা এবং ইসলামীয় শিল্পকলার প্রদর্শনী ও নিলামের কর্মসূচিতে মোট ৪৬.৪ কোটি টাকা তুলেছে সথ্‌বি। এই মরশুমে শিল্পকলার ক্ষেত্রে এটাই সর্বোচ্চ বিক্রির রেকর্ড। ৩ থেকে ৮ অক্টোবর প্রদর্শনী চলে। ৯ অক্টোবর নিলাম হয়।

● **ভাষা আন্দোলনের নেতা প্রয়াত :**

বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আব্দুল মতিন (৮৮) ৮ অক্টোবর প্রয়াত হলেন। সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালিতে এক কৃষক পরিবারে জন্ম। ছাত্রজীবন কাটে ঢাকায়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে আন্দোলন শুরু করে, ক্রমে তা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আব্দুল মতিন ছিলেন ওই সংগঠনের আহ্বায়ক। পরে জেলে গিয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

● **রাষ্ট্রসংঘের পুরস্কার শক্তি দেবী-কে :**

যুদ্ধদীর্ণ আফগানিস্তানে হিংসা ও নির্যাতনের শিকার মেয়েদের শক্তি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আর সেই কাজে অসামান্য কীর্তির জন্য রাষ্ট্রসংঘের 'ইন্টারন্যাশনাল ফিমেল পিস-কিপার' পুরস্কার পেলেন জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ ইন্সপেক্টর শক্তি দেবী। বর্তমানে আফগানিস্তানে রাষ্ট্রসংঘ 'অ্যাসিস্ট্যান্স মিশন'-এ যুক্ত আছেন শক্তি দেবী।

● **ফ্ল্যানাগানের 'বুকার' প্রাপ্তি :**

তৃতীয় অস্ট্রেলীয় হিসাবে 'ম্যান বুকার' পুরস্কার পেলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক রিচার্ড ফ্ল্যানাগান। তাঁর উপন্যাস 'দ্য ন্যারো রোড টু দ্য ডিপ নর্থ'-এর জন্য লন্ডনের গিল্ড হলে ডাচেস অফ কর্নওয়ালের হাত থেকে এই পুরস্কার নেন তিনি। পুরস্কারের দৌড়ে এগিয়েও শেষপর্যন্ত পারলেন না ভারতের নীল মুখোপাধ্যায়।

● **মহাকবি তুলসীদাসের স্মৃতি সুরক্ষা :**

মহাকবি তুলসীদাস-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র-সহ তাঁর বারাণসীর বাসভূমি পুরো 'বুলেট প্রুফ' আচ্ছাদনে ঢেকে ফেলা হল। উল্লেখ্য, সপ্তদশ শতাব্দীতে তুলসীদাসের লেখা 'শ্রীরামচরিতমানস'-এর মূল পাণ্ডুলিপি ২০১১ সালের ২২ ডিসেম্বর বারাণসীর তুলসী ঘাটে গোস্বামী তুলসীদাসের আখরা হনুমান মন্দির থেকে চুরি যায়। আজও তার হদিশ মেলেনি। ব্যাপক তল্লাশি অবশ্য জারি আছে। তার পর থেকে বারাণসী শহর পুলিশ তুলসীদাসের লেখা আরও অনেক পুঁথি, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী রক্ষার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়। পুরো বাড়িটিকেই নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলার কাজ শুরু হয়। অবশেষে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কাজ শেষ হয়।

● **আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা ছবি :**

এ বছরের ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া) প্রতিযোগিতা বিভাগে পাঁচটি বাংলা ছবি মনোনীত হল। ছবিগুলি হল : 'পুনশ্চ' (পরিচালনা : শৌভিক মিত্র), 'ছোটদের ছবি' (পরিচালনা : কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়), 'তিনকাহন' (পরিচালনা : বৌদ্ধায়ন মুখোপাধ্যায়), 'বোধন' (পরিচালনা : অয়নাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়) ও 'যদি লাভ দিলে না প্রাণে' (পরিচালনা : অভিজিৎ গুহ ও সুদেষ্ণা রায়)।□

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

তথ্য-প্রযুক্তি

মহুয়া গিরি

যে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল দুনিয়ার বিশাল তথ্যভাণ্ডার রক্ষা ও পরিচালনা করা হয় তাকেই ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) বা তথ্য-প্রযুক্তি বলি আমরা।

আজকের দুনিয়ায় আইটি আর নতুন কিছু নয়। যখন থেকে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, টেলি-যোগাযোগ মানুষের রোজের জীবনে জায়গা করে নিয়েছে তখন থেকেই এই প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের নিত্য ওঠা-বসা। যদিও আইটি বললে সাধারণভাবে কম্পিউটার ও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক-এর সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তির কথাই আমাদের মাথায় আসে, আসলে কিন্তু তা নয়। টেলিভিশন বা টেলিফোনের মতো তথ্য-নির্ভর পরিষেবার কাজেও এই প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। আর এই প্রযুক্তিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইলেকট্রনিক, সেমিকনডাক্টর, ইন্টারনেট, টেলিকম যন্ত্রপাতি, ই-কমার্স ও কম্পিউটার পরিষেবার মতো আলাদা আলাদা শিল্প আর উদ্যোগ। কাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সুযোগ প্রচুর এবং দিনে দিনে তা বাড়ছে।

তথ্য-প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে যে কতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বাড়িতে বসে ইন্টারনেটে শপিং কিংবা সিনেমার টিকিট কাটা, মেলিং পরিষেবার মাধ্যমে চিঠিপত্র পাঠানো, ভিডিও কনফারেন্স পরিষেবা, স্কুল-কলেজের রিপোর্ট কার্ড বানানো, অফিস-কারখানা, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কম্পিউটার চালিত কাজকর্ম ও বেতনব্যবস্থা, শপিং মল বা বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে জিনিসের হিসাব রাখা— কোন কাজে লাগে না এই প্রযুক্তি? শুধু তাই নয়, এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে লেনদেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, জ্বালানি গ্যাসের বণ্টন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, দেশের যাবতীয় প্রশাসনিক তথ্য সংরক্ষণের মতো যাবতীয় কাজই তথ্য-প্রযুক্তি ছাড়া অচল। অর্থাৎ আজকের দিনে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগই হোক বা বিনোদন—আইটি ছাড়া এক পাও চলা দায়। এই সব কারণেই আইটি নিয়ে পড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এখন এত আগ্রহ। সাবেক কোর্সগুলিতে এখন প্রযুক্তির ব্যবহার চলছে পুরোমাত্রায়। ব্ল্যাকবোর্ডের যুগ পেরিয়ে আমরা এসে পড়েছি ই-বোর্ডের যুগে। তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রও রোজ বদলে যাচ্ছে। যুগের চাহিদা মেনে চালাতে হয়, আধুনিক রূপ দিতে হয়। কেননা প্রযুক্তিকে সব সময় আধুনিকিকরণ করতে হয়। না করলে সেই প্রযুক্তির সময়ের নিরিখে বাতিল হয়ে যায় বা পুরোনো বলে অচল হয়ে যায়। আর এই জন্যই চাই পেশাদার। এর জন্যই চাই গবেষণা। তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এখন রমরমা চলছে। এটা আইটি-র যুগ। কী বাণিজ্যিক ভাবে, কী তার প্রয়োগে ও পেশাদার নির্মাণে। বিশ্বে এখন আইটিতেই বিনিয়োগ সর্বাধিক। তাহলে এখন প্রশ্ন কীভাবে তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষায় ও পরবর্তীকালে এই পেশায় একজন আসবেন?

কী পড়বেন

তথ্য-প্রযুক্তির এই বিশাল জগতে পেশাগতভাবে যুক্ত হতে চাইলে দ্বাদশের পর স্নাতক স্তরে বি.টেক. (ব্যাচেলর অব টেকনোলজি) বা বি.ই. (ব্যাচেলর অব ইঞ্জিনিয়ারিং) নিয়ে পড়ে আইটি ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়। স্নাতকোত্তর এম.টেক. (মাস্টার অব টেকনোলজি) বা এম.ই. (মাস্টার অব ইঞ্জিনিয়ারিং) পড়তে পারেন। রয়েছে পিএইচ.ডি. স্তরে গবেষণার সুযোগও। যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন। তবে এর বাইরে তথ্য-প্রযুক্তির ওপর ডিপ্লোমা কোর্সও করা যায়। আমাদের দেশে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রথম সারির কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে পড়তে চাইলে দ্বাদশের পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার যোগ্যতা

দ্বাদশের পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে চাইলে কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি। দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখায় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেলেই এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাওয়া যায়। আর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং অঙ্ক কিন্তু আবশ্যিক বিষয় হওয়া চাই। এরপর বিভিন্ন কলেজের চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থী কলেজগুলিতে ভর্তির সুযোগ পায়। তবে ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে এই সব পরীক্ষায় বসার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে দশম শ্রেণিতে গড়ে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেই আইটি নিয়ে পড়া যায়।

সিলেবাস

বি.ই. কিংবা বি.টেক. চার বছরের স্নাতক কোর্স। মোট আটটি যাণ্মাসিক ভাগ বা সেমেস্টারে সিলেবাস ভাগ করা হয়। ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে সময়টা কম লাগে। তিন বছরে মোট ছ'টা সেমেস্টার। এরপর এম.টেক. বা এম.ই. পড়তে চাইলে সময় লাগবে আরও দু'বছর। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়ারা তথ্য-প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি থেকে নিজেদের পছন্দমতো বিষয় নির্বাচন করতে পারে। পড়ুয়ার পছন্দের বিষয় হতে পারে— কম্পিউটার সায়েন্স, ডেটাবেস অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, এমবেডেড সিস্টেমস, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সায়েন্স (জিআইএস) বা তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিবেশ-এর মতো কোর্সগুলি। তবে প্রযুক্তি তো দিন দিন বদলে যাচ্ছে। আরও উন্নত হচ্ছে। নতুন নতুন পদ্ধতি, যন্ত্র আর প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে। তাই কলেজে শেখা সিলেবাসের পড়াশোনা মিলিয়েই যে কাজের ক্ষেত্রে কাজ পাওয়া যাবে তার কোনও মানে নেই। বরং কাজ করতে করতেই শিখে নিতে হবে নতুন

নতুন প্রযুক্তি। আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে ফেলতে হবে নিজেদেরকেও। তবেই তো বাজারের বদলে যাওয়া চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবেন। আর একটি বিষয় খুব জরুরি—টাইম ম্যানেজমেন্ট। একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ নির্ভুলভাবে করাটাই তো আসলে টাইম ম্যানেজমেন্ট। তাই শুধু দ্রুত কাজ করাটাই জরুরি নয়, খেয়াল রাখতে হবে তাড়াহুড়োয় কাজের গুণগত মান যেন কমে না যায়।

কাজের সুযোগ

চাকরির বাজারে মন্দা যতই আসুক তথ্য-প্রযুক্তির দুনিয়ার দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা সব সময়েই ছিল, থাকবে। বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দার সময় সব ক্ষেত্রের মতো আইটি সেক্টরের গতিও খানিকটা শ্লথ হয়েছিল। তবে খুব দ্রুত সেই জায়গা থেকে তথ্য-প্রযুক্তির দুনিয়ার আবার নতুন কাজের জোয়ার এসেছে। আইটি স্নাতকদের কাজের সুযোগ বাড়ছে। বিশেষ করে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার কোম্পানিগুলি প্রচুর নতুন ছেলে-মেয়েকে কাজে নিয়োগ করছে। এখন সরকারও জোর দিচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের ওপর। বিদেশি লগ্নি আসছে। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন আইটি হাব, আইটি পার্ক। এগুলো ঘিরে গড়ে উঠছে রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক সেক্টর ফাইভের মতো নতুন নতুন শহর। শুধু দেশে নয় বিদেশেও কাজের সুযোগ প্রচুর। আবার বিষয়টা তথ্য-প্রযুক্তি বলেই তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র। সেটা কীরকম? বিশ্বায়নের ফলে রাশিয়া, আমেরিকা বা ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে পরিষেবার চাহিদা মেটাতে ভারত, ব্রাজিল, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তৈরি হয়েছে বিপিও, কলসেন্টার। এর ফলে একদিকে উন্নত দেশগুলি কম খরচে পাচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিষেবা আর আমাদের দেশে কাজের সুযোগ বাড়ছে। তথ্য-প্রযুক্তির এই রমরমায় আজ ভৌগোলিক সীমানা ভেঙে গোটা বিশ্ব একটিমাত্র বাজারে পরিণত হয়েছে। ফলে এই বিশাল দুনিয়ায় পেশাদারদের সামনে সুযোগ রয়েছে পছন্দমতো নানা পেশা বেছে নেওয়ারও। শুধু সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নয়, ই-কমার্স প্রোগ্র্যামার, ওয়েব ডেভেলপার, টেলিকমিউনিকেশন, এরোস্পেস, অটোমোটিভ পেশাদার হিসেবেও রয়েছে প্রচুর কাজের সুযোগ। অ্যাপল, গুগল, ইনফোসিস, অ্যাডোব, মাইক্রোসফট, টিসিএস, মাহিন্দ্রা-সত্যম, টাটা এলিক্সি, বিএইচইএল, ইউনিসিস, বিএসএনএল, ভিএসএনএল, সিসকো সিস্টেম, এয়ারটেল, অ্যালকাটেল, সিমেনস, অ্যাকসেঞ্চার, সাসকান কমিউনিকেশন-এর মতো বিশ্বের প্রথম সারির আইটি কোম্পানিগুলি প্রতি বছরেই প্রচুর তরুণ পেশাদারদের কাজে নিয়োগ করে। এখানেই শেষ নয়। কাজের সুযোগ রয়েছে অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রেও—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে। সরকারি দফতর, নানান শিল্পোদ্যোগ, বাণিজ্যিক সংস্থা, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলিতেও গবেষক হিসেবে কাজ করা যায়। আগামী বছরগুলিতে এই ক্ষেত্রে আরও প্রচুর পেশাদারদের প্রয়োজন হবে। কাজের সুযোগ বাড়বে অনেক।

আয়

কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই একজন তথ্য-প্রযুক্তি স্নাতক অন্তত ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার চাকরি দিয়ে আজকাল পেশাজীবন শুরু করতে পারে। পরে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বাড়তে থাকে। যোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই পেশায় আয়ের সুযোগ প্রচুর। ম্যানেজমেন্ট স্তরে একজন পেশাদার প্রতিমাসে অন্তত ১ লক্ষ টাকা বেতন পেতে পারেন। তাছাড়াও থাকে অনেক সুযোগ সুবিধাও।

তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সুরাথকল, কর্ণাটক
- বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, পাটনা, বিহার
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ
- মোতিলাল নেহরু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ
- বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, শিবপুর, হাওড়া
- মনিপাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ঈশ্বরনগর, কর্ণাটক
- আরভি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক
- বিআইটি সিন্ধ্রি, ঝাড়খণ্ড
- কোয়েম্বাটুর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, তামিলনাড়ু
- ভেলোর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, তামিলনাড়ু
- মহারাষ্ট্র ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, মহারাষ্ট্র
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইশোর, কর্ণাটক
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ
- স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক
- আচার্য ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক

কোথায় পড়ব

আমাদের দেশে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। প্রথম দিকে কেবলমাত্র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি), কিংবা শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু) মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেই তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ ছিল। পরে অনেক সরকারি ও সরকারি-অনুমোদন প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই বিষয় পঠনপাঠন চালু হয়। সময়ের সঙ্গে চাহিদা বাড়ায়, এখন হাজার হাজার বেসরকারি কলেজেও এই বিষয়টি নিয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে কোন কলেজে পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের ওপরেই। আইআইটি-গুলি আলাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা নেয়। এই পরীক্ষার মান ও প্রশ্নপত্রের ধরন আইআইটি কলেজগুলিই নির্ধারণ করে। এগুলি ছাড়া এখন তথ্য-প্রযুক্তি পড়ার জন্য এনআইটিএস, আইআইআইটিএস, ধীরুভাই আম্বানি ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, নির্মা ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ভেলোর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-এর মতো কলেজগুলিও পড়ুয়াদের পছন্দের তালিকায় প্রথম সারিতে। এই সমস্ত কলেজে পড়া শেষ হতে না হতেই ক্যাম্পাসিং-এর মাধ্যমে ভালো চাকরির সুযোগ রয়েছে।❑

জা নে ন কি?

উইল

মলয় ঘোষ

'If there is a will there is a way'—ছোটবেলায় পড়া, এই নীতিকথা শিখিয়েছিল ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আপনার ইচ্ছে আছে, আপনার কোনও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কাউকে দিয়ে যাবেন, সেই ব্যবস্থাও আইনে করা আছে। আপনার ইচ্ছের কথা যে পত্রে আপনি লিখে যাবেন, সেটাই হল 'ইচ্ছাপত্র' বা 'উইল' (Will)।

উইলের প্রয়োজনীয়তা

কারওর হয়তো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, হঠাৎ করেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রী বা স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা কে কতখানি ওই সম্পত্তির অংশ পাবেন তা তিনি মৃত্যুর আগেই উইল করে রেখে যেতে পারেন। আর যদি তিনি তা না করে যান, তাহলে উত্তরাধিকারসূত্রে যাঁরা ওই সম্পত্তি পাবেন তাঁদের উকিলের সাহায্য নিয়ে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় সম্পত্তি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে একজন আরেকজনকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। সমস্ত ক্ষেত্রে আদালতই হল শেষ আশ্রয়স্থল। এমন হতেই পারে যে কেউ মারা গেছেন, তাঁর প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা জানেন কার কতটা প্রাপ্য, সেক্ষেত্রে সব পক্ষই আমিন দিয়ে যদি একটি ম্যাপ করে নেয় এবং এর পর বণ্টননামা দলিলটি রেজিস্ট্রি করে নেয়, তাহলে তাঁদেরকে আর আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে না।

টেস্টেটর/টেস্টারিক্স ও বেনিফিশিয়ারি

সম্পত্তি সব ধরনেরই হতে পারে (স্থাবর-অস্থাবর)। আপনাকে তা সঠিকভাবে রক্ষা করতে হবে। জমি-বাড়ি রক্ষা করা যেমন খুব কঠিন কাজ, তেমনি সম্পত্তির সঠিক বিলি ব্যবস্থা করাও একটা সমস্যা। 'ইচ্ছাপত্র' বা 'উইল' করে কোনও ব্যক্তি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত রকম সম্পত্তি যাকে খুশি দিয়ে যেতে পারেন। কোনও পুরুষ উইল করলে, তাঁকে বলা হয় টেস্টেটর। আর উইলকারী যদি মহিলা হন, তিনি হলেন টেস্টারিক্স। এই উইলের ফলে সম্পত্তির অধিকার যিনি পাবেন তাঁকে বেনিফিশিয়ারি বলা হয়।

'উইল' এবং 'দানপত্র'

উইল কার্যকর হয় উইলকারীর মৃত্যুর পর। তিনি বেঁচে থাকতে কখনওই নয়। উইল করা থাকলে উইলকারীর মৃত্যুর পর সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন নির্ঝঞ্ঝাটে করা যায়। একাধিক সন্তান থাকলে উইলকারী তাঁর ইচ্ছামতো সম্পত্তি বণ্টনের কথা উল্লেখ করে যেতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে অন্যকে বঞ্চিত করা বা কম দেওয়ার কারণও উইলে লিখে যাওয়া জরুরি। এমনকী উইলকারী তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কোনও একজনকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে তাও করতে পারেন। সেই কারণও উইলে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে।

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বিলি-বণ্টনের জন্য, মালিকানা বদলের জন্য 'দানপত্র' করা যেতে পারে। কেউ যদি জীবিতকালেই দেখে যেতে চান তাঁর সম্পত্তি যাঁকে বা যাঁদেরকে তিনি দিয়ে যেতে চান, সেই সম্পত্তি তিনি বা তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করছেন তাহলে সেইভাবে 'দানপত্র' করা যায়, যার পোশাকি নাম 'ডিড অব গিফ্‌ট' । 'দানপত্র' করার পরমুহূর্ত থেকেই ওই সম্পত্তি আর নিজের নামে থাকে না। দানপত্রে যাঁর বা যাঁদের নামের উল্লেখ থাকে সেই মুহূর্ত থেকে তিনি বা তাঁরাই মালিক। স্থাবর এবং অস্থাবর দু'ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে 'দানপত্র' করা যায়। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক। তবে এখানে মনে রাখতে হবে উইল রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়।

শুধুমাত্র নিজের সম্পত্তি দান করা যায়। এই দান এক ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তর। কোনও কিছু না নিয়ে সম্পত্তির যাবতীয় মালিকানা বা স্বত্ব অন্যকে দেওয়ার অর্থই হল দান। যেহেতু উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল কার্যকর হয়, তাই উইল তৈরি হওয়ার পর তা যতবার খুশি বদল করা যায় কিন্তু একবার দানপত্র হয়ে গেলে সম্পত্তি হাতবদল হয়ে যায়। তবে প্রয়োজনে কখনও দানপত্র বদলাতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যেতেই পারে।

'দানপত্র' এবং 'পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল'

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের। এর পোশাকি নাম 'ডিড অব সেট্‌লমেন্ট'। পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের মাধ্যমে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া যায়। আর দানপত্রের মাধ্যমে পরিবারের বাইরেও কোনও সদস্যকে সম্পত্তি দেওয়া যায়। পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকতেই সম্পত্তির বিলি-বণ্টন করা সম্ভব। পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের রেজিস্ট্রি করা প্রয়োজন।

কীভাবে হবে উইল

প্রথমে যিনি উইল করছেন তিনি একটি সাদা কাগজে পরিষ্কার করে তাঁর পূর্ণ পরিচিতি (ঠিকানা সমেত) লিখবেন। সেই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের পরিচয় দেবেন। এরপর স্থাবর সম্পত্তি কোথায় কোথায় আছে এবং কী পরিমাণে আছে তার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। এর সঙ্গে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যাংক ব্যালেন্স, ফিক্সড ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ এবং অলংকারাদির পূর্ণ বিবরণ দেবেন। এরপর

উল্লেখিত সম্পত্তি কাকে কীভাবে দেওয়া হচ্ছে সেটা লিখতে হবে। এর মধ্যে যদি কোনও শর্ত থাকে তাও পরিষ্কার করে উইলে উল্লেখ করতে হবে। এই উইলে আপনার সম্পত্তি যাঁকে বা যাঁদেরকে দিচ্ছেন অথবা যাঁকে বা যাঁদেরকে দিচ্ছেন না তার কারণও উল্লেখ করলে ভালো হয়। এরপর এক বা একাধিক 'এক্সিকিউটার'-এর নাম উল্লেখ করবেন যিনি বা যাঁরা আপনার এই উইলের প্রোবেট ন্যায়ালয় থেকে উপযুক্ত কোর্ট ফি দিয়ে আইন মোতাবেক নেবেন। এর জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে, তা কোথা থেকে নেওয়া হবে তার নির্দেশও আপনি উইলে দিয়ে যেতে পারেন। এরপর আপনি কোথায় বসে, কোন তারিখে আপনার উইলের স্বাক্ষর করছেন তা উল্লেখ করবেন। উইলে এই স্বাক্ষর পরিষ্কার করে করতে হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল আপনি দু'জন সাক্ষীর সামনে নিজের হাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করবেন এবং ওই সাক্ষী দু'জন তাঁদের স্বাক্ষরের মাধ্যমে আপনার স্বাক্ষরকে 'অ্যাটেস্ট' করবেন। এই দু'জন সাক্ষীর মধ্যে একজন পেশায় ডাক্তার হলে ভালো হয়, কারণ আপনি আপনার এই উইলে যেহেতু পরিষ্কারভাবে লিখছেন যে, আপনি সুস্থ শরীরে এবং নীরোগ অবস্থায় উইলে স্বাক্ষর করছেন।

উইল রেজিস্ট্রির সুবিধা-অসুবিধা

উইল রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে রেজিস্ট্রি করা থাকলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। ওই উইল হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে আবেদন করলে রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে সার্টিফায়েড কপি পাওয়া যায়। যেহেতু উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল কার্যকর হয়, তাই উইল তৈরি হওয়ার পর তা যতবার খুশি বদল করা যায়। কিন্তু তা রেজিস্ট্রি করা থাকলে বাতিল করার সময় বাড়তি অসুবিধা ভোগ করতে হয়। উইল করার জন্য সাদা কাগজই যথেষ্ট। স্ট্যাম্প পেপারে উইল করা বাধ্যতামূলক নয়। উকিলের পরামর্শ অনুসারে উইল করলে বাড়তি ঝামেলা অনেকাংশেই কমিয়ে ফেলা যায়।

প্রোবেট

উইলের ফলে সম্পত্তির অধিকার যিনি পান তাঁকে বেনিফিশিয়ারি বলা হয়। উইলকারীর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই কিন্তু বেনিফিশিয়ারি সম্পত্তির অধিকার পান না। অধিকার পেতে হলে বেনিফিশিয়ারিকে বা তার 'এক্সিকিউটার'-কে প্রোবেট নিতে হবে ন্যায়ালয়ের কাছ থেকে। এই প্রোবেট হল ন্যায়ালয়ের সার্টিফিকেট। এর মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায় উইলটির গ্রহণযোগ্যতা। প্রোবেট নেওয়ার জন্য সম্পত্তির সকল উত্তরাধিকারীদের নোটিস দিয়ে জানাতে হবে। এর মাধ্যমে সকল উত্তরাধিকারীদের দাবি-দাওয়া-অভিযোগ-মতামত বা পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকে ন্যায়ালয়ের কাছে। প্রোবেট থাকার ফলে ভয় দেখিয়ে, জুলুম করে কেউ উইল করিয়ে থাকলে আইনি পথে গিয়ে তার মীমাংসার একটা সুযোগ থেকেই যায়।

উত্তরাধিকারের প্রামাণ্য নথি

যিনি বা যাঁরা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের দাবি করবেন, সেক্ষেত্রে যোগ্য উত্তরাধিকারী প্রামাণ্য নথি পেশ করতে হবে। একে বলে সাকসেশন সার্টিফিকেট। শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির জন্য অর্থাৎ ব্যাংকে বা পোস্ট অফিসে গচ্ছিত টাকা, ফিক্সড ডিপোজিট, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়ালয়ের কাছে সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হয়। যদি কেউ উইল না করে যান সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নিরিখে যোগ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। সাকসেশন সার্টিফিকেট পেতে ওই এলাকার জেলা আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।❑

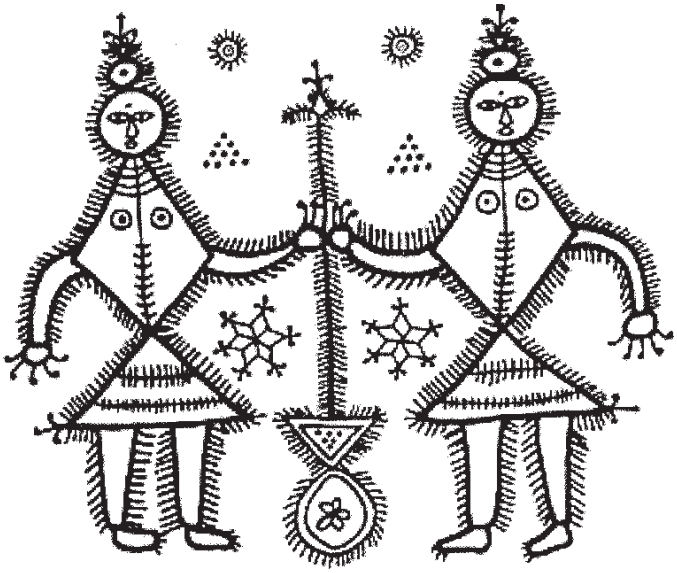

যোজনা ? কুইজ

১. কোন ভারতীয় চলচ্চিত্র ৮৭তম অস্কার পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বিদেশি ছবির বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত হয়েছে?

২. কোন বঙ্গসন্তান সম্প্রতি ইউরোপে আল্পসের মঁ ব্লাঁ জয় করেছেন?

৩. সার্ক-দেশগুলির সংস্কৃতি মন্ত্রীদের সম্মেলন সম্প্রতি কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?

৪. ২০১৮ সালে ১৮তম এশিয়ান গেমসের আসর কোন দেশে বসবে?

৫. 'গ্রে বুকস্' কোন দেশের সরকারি গ্রন্থের নাম?

৬. 'খারচি' পুজো কোন রাজ্যের আঞ্চলিক উৎসবের নাম?

৭. 'স্যান্ডফ্লাই' নামক কীট যে ভাইরাসের বাহক তার নাম কী?

৮. কোন বিজ্ঞানী প্রথম 'জিন' শব্দটি ব্যবহার করেন?

৯. ইউরোপের কোন দেশগুলিকে 'স্ক্যান্ডিনেভিয়া' বলা হয়?

১০. বৌদ্ধদের বিখ্যাত ধর্মস্থল তক্ষশিলা কোন দেশে অবস্থিত?

১১. 'শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস' কোন দিনটিতে পালন করা হয়?

১২. 'এভরিওয়ান ইজ বর্ন টু ব্লোজম' গ্রন্থটি কার লেখা?

১৩. কোন বিখ্যাত বিদেশি চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন?

১৪. এশিয়ার একমাত্র নদীবিহীন দেশ কোনটি?

১৫. এ বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কারের বিজয়ী কে?

উত্তর :

১. গীতু মোহনদাস পরিচালিত হিন্দি ছবি 'লায়ার্স ডাইস'। মালায়লম ছবির অভিনেত্রী গীতু মোহনদাসের এটি ছিল প্রথম পরিচালিত ছবি। মোট ২৯টি চলচ্চিত্রকে হারিয়ে 'লায়ার্স ডাইস' এই স্বীকৃতি পেয়েছে। ২. সত্যরূপ সিদ্ধান্ত। বয়স ৩১ বছর। বাড়ি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। এর আগে তিনি চার মহাদেশের চারটি শৃঙ্গে পা রেখেছেন। ৩. ভারতে। নয়াদিল্লিতে ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর এবারের তৃতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানের বামিয়াম শহর সার্ক-দেশগুলির সাংস্কৃতিক রাজধানী হবে। ৪. ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। ভিয়েতনাম নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ইন্দোনেশিয়া এই সুযোগ পেল। ৫. জার্মানি। ৬. ত্রিপুরা। ৭. 'চণ্ডীপুরা ভাইরাস'। ৮. ডেনমার্কের বিজ্ঞানী উইলহেম এল. জোহানসেন। ১৯০৯ সালে। ৯. সুইডেন, ডেনমার্ক এবং নরওয়ে। ১০. পাকিস্তান। ১১. ১০ নভেম্বর। ১২. ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম। ১৩. রিচার্ড অ্যাটেনবরো ('গান্ধী'-খ্যাত)। ১৪. সৌদি আরব। ১৫. ফরাসি সাহিত্যিক প্যাট্রিক মোদিয়ানো।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের বিকাশ

ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা, এরোস্পেসের মতো শিল্পে ভারতের দক্ষতা আজ সর্বজনবিদিত। দেশে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পের ক্রমবিকাশ, এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা, পারস্পরিক সম্পর্ক, এ সম্পর্কিত পেটেন্ট প্রাপ্তির খতিয়ান, রপ্তানির নিরিখে এই ক্ষেত্রের অবস্থান, সরকারি নীতি—সব কিছুর এক সামগ্রিক চালচিত্র উঠে এসেছে **সুনীল মানি**-*র এই নিবন্ধে।*

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদনশিল্পে প্রযুক্তি উদ্ভাবন

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির কার্যকর উপায়

কোনও পণ্য বা পরিষেবায় 'নতুনত্ব'-এর চমক না থাকলে, বাজার ধরা সম্ভব নয়। আবার যে সব বাণিজ্যিক সংস্থা বাজারের শীর্ষে, তাদেরও আধিপত্য বজায় রাখতে লড়াই করতে হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলি উদ্ভাবনী প্রযুক্তির 'নতুনত্ব'-এর ছোঁয়ায় কীভাবে লাভান্বিত হতে পারে জানাচ্ছেন অধ্যাপক **এম এইচ বালা সুব্রমানিয়া।**

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

উদ্ভাবন ও বিশ্বায়ন

সনাতন ধ্যানধারণাকে ধূলিসাৎ করে বিশ্বায়নের প্রভাবে গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের দুনিয়া কেমন আমূল পালটে গেছে। বিবর্তনের এই ক্রমপর্যায়ে ভারত-চীনসহ এশিয়ার বিকাশশীল দেশগুলির প্রথম সারিতে উঠে আসা এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের যুগের সূচনা বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরেছেন **ড. ভি. ভি. কৃষ্ণ**।

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীবাণু

বৈদ্যুতিন পণ্যের ব্যবহার যে দ্রুত হারে বাড়ছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বেড়ে চলেছে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ। ব্যবহার বাড়লে, বর্জ্যও বাড়বে—এটাই স্বাভাবিক এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের মতই তা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারকও বটে। কিন্তু এই ই-ওয়েস্ট নিষ্কাশনের কোনও চট্‌জলদি উপায় পাওয়া মুশকিল। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হলেও নতুন সমাধানসূত্রের খোজ মিলেছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় জীবাণু কীভাবে মুশকিল আসান করতে পারে, সে কথাই তুলে ধরেছেন **ড. এম.এইচ. ফুলেকার** ও **ড. ভাবনা পাঠক**।

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

মঙ্গলযাত্রায় মঙ্গলযান

আমরা মাঝে মধ্যেই খবরের কাগজে "স্যাটেলাইট লঞ্চ" করার খবর পড়ি, মাঝে মাঝে উৎক্ষেপণের সাফল্য কিংবা অসাফল্যের কথা একনজরে দেখে নিই; এইভাবেই শ্রীহরিকোটার নামটাও আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে— কিন্তু ব্যাস, ওই পর্যন্তই। গড়পড়তা পাঠক এর বেশি জানেন না, জানার চেষ্টা করেন না কিংবা হয়তো বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করেন না কারণ বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের অনেকেরই অনীহা। কিন্তু ওই বিজ্ঞানকেই উপাদেয় করে উপস্থাপন করতে পারলে কি আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব? এই তো সেদিন মঙ্গলযানকে নিয়ে পাতা জোড়া ছবি, প্রধানমন্ত্রীর কত প্রশংসা, কত শুভেচ্ছা ইস্‌রো-র বিজ্ঞানীদের জন্য; তারও কিছুদিন আগে মঙ্গলযানকে ঘিরে খবর হয়েছিল.....কেন? আমাদের মধ্যে ক'জন জানেন সবটা? এই নিবন্ধে আমাদের জন্য আমাদের মতো করে জানাবার চেষ্টা করেছেন **ড. দীপঙ্কর ঘোষ।**

মানুষকে দিয়ে মলবহন

রাজনৈতিক সদিচ্ছা দু' বছরে এই প্রথার বিলোপ ঘটাতে পারে

মলবহন ও নোংরা অপসারণের কাজে কর্মী নিয়োগ মানবিকতার লজ্জা। সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই প্রথা ভারতের উন্নয়নের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছে। কেন এই প্রথা এখনও সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং তার সুষ্ঠু রূপায়ণ ও সাফাইকর্মীদের পুনর্বাসনে একগুচ্ছ সুপারিশ **ড. অমৃত প্যাটেল***-এর লেখা এই নিবন্ধে।*

নতুন সরকার স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রার্থনা করেছে। পাঁচ বছর মেয়াদের এই অভিযান শুরু হয়েছে এ বছরের ২ অক্টোবর। কিন্তু সব থেকে আগে প্রয়োজন মানুষকে দিয়ে মলবহন করানোর শতাব্দীপ্রাচীন অমানবিক প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন। বর্তমান আইনের কঠোর প্রয়োগ, এমনকী প্রয়োজনে আইনের সংশোধন করে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দু' বছরের মধ্যেই এই প্রথা রদ করা সম্ভব। স্বচ্ছ ভারত অভিযানেরও উচিত কেবল সাফাই ও নিকাশি ব্যবস্থার মধ্যে আটকে না থেকে এই বিষয়টিতে মনোযোগ দেওয়া। কেননা, এর সঙ্গে মানুষের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। মানুষকে দিয়ে মলবহন, ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর এক কালো দাগ। একবিংশ শতাব্দীতে, স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও যে হাজার হাজার পরিবারকে সমাজের নীচুতলায় এমন অমানবিক জীবন কাটাতে হয়, তা ভারতের জাতীয় লজ্জা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন ধরে এঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অসম্মানের অবসানের চেষ্টা করে গেছেন।

মানুষকে দিয়ে মলবহন

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত এই শতকের প্রথম দশকে অসাধারণ অর্থনৈতিক বিকাশ হার অর্জন করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ভারত হয়ে উঠেছে সম্ভাবনার এক দেশ, বিদেশি বিনিয়োগের গন্তব্যস্থল। তবুও এখনও সেখানে বহু মানুষ সমাজের সর্বস্তরে বহু গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের শিকার। বহু শতাব্দীর অসম্মানের ভার এঁদের শিরে। মলবহনের মতো অমানবিক কাজ করানো হয় এঁদের দিয়ে। আবার মলবহনের কাজ করেন বলে অন্য কোনও সম্মানজনক কাজও তাঁদের করতে দেওয়া হয় না। হাজার হাজার বছর ধরে তাই তাঁরা বংশানুক্রমে একই কাজ করে চলেছেন। আইন রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির নির্বিকার ঔদাসীন্য এবং বর্তমান আইনের ফাঁক এর জন্য দায়ী। বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন, এই প্রথা অমানবিক এবং অস্পৃশ্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন। ভারতের সংবিধানে সব নাগরিককে সমমর্যাদা দানের কথা বলা হয়েছে। তবুও এই জঘন্য প্রথা এখানে এখনও চলে আসছে। সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি মলবাহকদের তাঁদের পেশার কারণে নানা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। শ্রী নারায়ণন সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে যে জনস্বার্থমূলক আবেদন দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে, মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা, কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যা, অস্টিও আর্থারাইটিসের মতো মাংসপেশি ও মেরুদণ্ডের রোগ, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক হারনিয়েশন এবং হেপাটাইটিস, লেপটোস্পাইরোসিস ও হেলিকোব্যাকটরের মতো সংক্রমণ, ত্বকের সমস্যা, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা প্রভৃতি এই পেশার সঙ্গে জড়িত।

১৯৯৩ সালের আইন

মানুষকে দিয়ে মলবহন করানো দীর্ঘদিন ধরেই সভ্যসমাজে অমানবিক এক অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সবরমতী আশ্রমের বাসিন্দারা নিজেরাই নিজেদের শৌচালয় পরিষ্কার করতে শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে মহারাষ্ট্র হরিজীবন সেবক সংঘ মলবহন প্রথার বিরোধিতা করে অবিলম্বে এটি রদ করার দাবি জানায়। ১৯৪৯ সালে বারভে কমিটি সাফাইকর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নত করার সুপারিশ করে। ১৯৫৭ সালে এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি মাথায় করে মলবহনের কুপ্রথা বিলোপের সুপারিশ করে। ১৯৬৮ সালে জাতীয় শ্রম কমিশন 'ঝাড়ুদার ও মলবাহকদের' কাজের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি নিয়োগ করে। সবকটি কমিটিই মলবহন প্রথা লোপ করে নিকাশি বা সাফাই কর্মচারীদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের সুপারিশ করেছিল। এই সুপারিশ আংশিক গ্রহণ করে ১৯৯৩ সালে 'মলবাহকদের নিয়োগ এবং জলবিহীন শৌচালয় নির্মাণ (নিষিদ্ধকরণ) আইন' প্রণয়ন করা হয়। এতে (i) মলবাহক নিয়োগ এবং যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা ছাড়াই জলবিহীন শৌচালয় নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। (ii) এই আইন ভাঙলে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং/অথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান থাকে। তবে ২০০৩ সালের সিএজি রিপোর্টে প্রকাশ, মাত্র ১৬টি রাজ্য এই আইন গ্রহণ করেছে এবং কোথাওই তা কার্যকর হয়নি। শ্রম-মন্ত্রকের কর্মী ক্ষতিপূরণ আইনের রূপায়ণ করেছে মাত্র ৬টি রাজ্য। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০২-০৭) মলবহন প্রথার বিলোপসাধনকে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা একটি আবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় রেলে এখনও নোংরা পরিষ্কারের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হয়। ২,৪০,০০০ কোটি টাকার সংযুক্ত রেল আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হলেও এর বিলোপসাধনের লক্ষ্যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব